শাস্ত্রপৃষ্ঠা
কৃষ্ণচরিত্র
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস: বিদ্যুৎ বিশ্বাস (শাস্ত্রপৃষ্ঠা)

ডিজিটাল মুদ্রণ: শাস্ত্রপৃষ্ঠা প্রকাশন বিভাগ

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আনুপূর্ব্বিক সাধারণকে বুঝাইতে পারি, এমন সম্ভাবনা অল্পই। কেন না, কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। ঐ প্রবন্ধ তিনটি দুইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে।

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্মবিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব বিষয়ক; তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ "নবজীবনে" প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় "প্রচার" নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই। সমাপ্তি দূরে থাকুক, কোনটিও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। একে বিষয়গুলি অতি মহৎ, অতি বিস্তারিত সমালোচনা ভিন্ন তন্মধ্যে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের সময়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান থাকে না।

এই সকল কারণের প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং মনুষ্যের পরমায়ুর সাধারণ পরিমাণ ও আপনার বয়স বিবেচনা করিয়া, আমি আমার বক্তব্য কথা সকলগুলি বলিবার সময় পাইব, এমন আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে মনে স্থান দিয়া, দুই একখানি করিয়া ইষ্টক সংগ্রহ করিতেছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারিব, এমন আশা আর রাখি না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাও সমাপ্ত করিতে পারিব কি না, জগদীশ্বর জানেন। সকলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহা পুনর্ম্মুদ্রিত করিব, এ আশায় বসিয়া থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনর্ম্মুদ্রিত হইবে

না। কেন না, সকল কাজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বোধ করি এইরূপ পাঁচ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সকলই সময় ও শক্তি এবং ঈশ্বরানুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

আগে অনুশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, "অনুশীলন ধর্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ; কিন্তু অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্পাংশ মাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তা ছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া উপক্রমণিকাভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবর্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্পাংশ মাত্র। অধিকাংশই নূতন।

এত দূরও যে কৃতকার্য হইতে পারিব, পূর্বে ইহা আশা করি নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশ করিয়াও আমি সুখী হইলাম না। তাহার কারণ, আমার ক্রটিতেই হউক, আর দূরদৃষ্ট বশত:ই হউক, মুদ্রাঙ্কনকার্যে এত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে যে, অনেক ভাগ পুনর্মুদ্রিত করাই আমার কর্তব্য ছিল। নানা কারণবশত: তাহা পারিলাম না। আপাতত: একটা শুদ্ধিপত্র দিলাম। যেখানে অর্থবোধে কষ্ট উপস্থিত হইবে, অনুগ্রহপূর্বক পাঠক সেইখানে শুদ্ধপত্রখানি দেখিয়া লইবেন। শুদ্ধিপত্রেও বোধ হয়, সব ভুল ধরা হয় নাই। যাহা চক্ষে পড়িয়াছে, তাহাই ধরা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় যথাস্থানে লিখিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। তাহা তিনটি ক্রোড়পত্রে সন্নিবিষ্ট করা গেল। পাঠক ৭ পৃষ্ঠার [৮ পংক্তির] পর ক্রোড়পত্র (ক), দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদের [১০৯ পৃষ্ঠা, ১২ পংক্তির] পর (খ) এবং ১৩৬ পৃষ্ঠার [১৭ পংক্তির] পর (গ) ও [২২২ পৃষ্ঠার ফুট নোটে] ক্রোড়পত্র (ঘ) পাঠ করিবেন।

আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মতপরিবর্তনের স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মতপরিবর্তন করিয়াছি-কে না করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মতপরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দূর প্রভেদ। মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।

এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের নিকট সন্ধান ও সাহায্য না পাইয়াছি এমত নহে। Wilson, Goldstucker, Weber, Muir-ইঁহাদিগের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতে বাধ্য। দেশী লেখকদিগের মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, C.I.E. শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী, এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমি বাধ্য। অক্ষয় বাবু উত্তম সংগ্রহকার। সর্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রয়োজনমতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়াছি। যে দুই এক স্থানে মারাত্মক ভ্রম আছে বুঝিয়াছি, সেখানে নোট করিয়া দিয়াছি। প্রয়োজনানুসারে, স্থানবিশেষে ভিন্ন, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে মহাভারতের মূল সংস্কৃত করি নাই। হরিবংশ ও পুরাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত

করিয়াছি, মূল উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং তাহার অনুবাদের দায় দোষ আমার নিজের।

পরিশেষে বক্তব্য কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি;-সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য কোন যত্ন পাই নাই।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সূচী

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম খণ্ড

উপক্রমণিকা

কৃষ্ণচরিত্র

উপক্রমণিকা

মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ।।
মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়।

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ—গ্রন্থের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ব্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না; ভিখারী "জয় রাধে কৃষ্ণ" না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধে কৃষ্ণ!" বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাখী পুষিলে তাহাকে "রাধে কৃষ্ণ" নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্ব্বব্যাপক।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্ব্বসময়ে কৃষ্ণরাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্ম্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু ইঁহারা ভগবান্‌কে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ-বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত?

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতনধর্ম্মদ্বেষিগণ বলিয়া থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতেও কখনও কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি।

জানিয়াছি—ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।

কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব। তবে এখন হিন্দুধর্মের আলোচনা কিছু প্রবলতা লাভ করিয়াছে। ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়। যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই; কেন না, কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না।

ইহা ভিন্ন আমার এক গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। ইতিপূর্বে* "ধর্মতত্ত্ব" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে যে কয়টি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এইঃ—

"১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।"

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ। এ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থেই যাহা বলিয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"শিষ্য।...জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই।

*　　*　　*

এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।”

পুনশ্চঃ—

“অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগকে গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগের মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট খ্রীষ্টীয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবর্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, “অর্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত, ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা” প্রাপ্ত আদর্শ। খ্রীষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মল ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্বগুণবিশিষ্ট – ইঁহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি, সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্মুকহস্তেও ধর্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়— যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্তিত হয় নাই।”

এই তত্ত্বটা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যেও শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

* ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি?

আদৌ এখানে দুইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। যাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আমার সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। যাঁহারা সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাহারা বলিবেন, কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকতা কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি ছিলেন, তবে তাঁহার চরিত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি?

আমরা প্রথমে এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়ঃ—

(১) মহাভারত।
(২) হরিবংশ।
(৩) পুরাণ।

ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃত্তান্ত নাই। নিম্নলিখিতগুলিতে আছেঃ—

(১) ব্রহ্মপুরাণ।
(২) পদ্মপুরাণ।
(৩) বিষ্ণুপুরাণ।
(৪) বায়ুপুরাণ।
(৫) শ্রীমদ্ভাগবত।
(১০) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।
(১৩) স্কন্দপুরাণ।
(১৪) বামনপুরাণ।
(১৫) কূর্মপুরাণ।

মহাভারত, আর উপরিলিখিত অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা হরিবংশ ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস; কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখা ও সহায়; তিনি পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও থাকিবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে অন্য দুই

একটা কথা আছে মাত্র। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও ঐরূপ কথা আছে। ব্যাস নারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণতা জানাইলেন। নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহা আছে, এই ভাগবতে বা হরিবংশে বা অন্য পুরাণে তাহা নাই; মহাভারতে, যাহা নাই—পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আছে।

অতএব মহাভারত সর্বপূর্ববর্তী। হরিবংশাদি ইহার অভাব পূরণার্থ মাত্র। যাহা সর্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক, ইহাই সম্ভব। কথিত আছে যে, মহাভারত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যক্তি রচিত। সকলই মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত। এ কথা সত্য কি না, তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা যাউক, মহাভারতের কোন ঐতিহাসিকতা আছে কি না। যদি তাহা না থাকে, তবে হরিবংশে ও পুরাণে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান বৃথা।

এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে দুই দিকে দুই ঘোর বিপদ্। এক দিকে, এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অনুস্বার আছে, সকলই অভ্রান্ত ঋষি প্রণীত; সকলই প্রতিবাদ বা সন্দেহের অতীত যে সত্য, তাহাই আমাদিগের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে। বেদবিভাগ, লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ সকল একজনে করিয়াছেন; সকলই কলিযুগের আরম্ভে হইয়াছে; সেও পাঁচহাজার বৎসর হইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই আছে। অনেক লোকে, এ সংস্কারের প্রতিবাদ শুনা দূরে যাউক, যে প্রতিবাদ করিবে, তাহাকে মহাপাতকী, নারকী এবং দেশের সর্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন। এই এক দিকের বিপদ্। আর দিকে গুরুতর বিপদ্, বিলাতী পাণ্ডিত্য। ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ভূত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাহাদের এ কথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্বল হিন্দুজাতি, কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুই চারি জন ভিন্ন তাহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে নিযুক্ত। তাঁহারা যত্নপূর্বক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ সকলে যাহা কিছু আছে—হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধগ্রন্থ ছাড়া—সকলই আধুনিক, আর হিন্দুগ্রন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুরি করা। কোন মহাত্মা বলেন,

রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ; কেহ বা বলেন, ভগবদ্গীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্‌ডিয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর গণিতও পরের কাছে পাওয়া; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিচারপ্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য। পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরচরিত্র ভারতবর্ষীয় পুরুষের কথা মিথ্যা, পাণ্ডব কবিকল্পনা মাত্র, কিন্তু পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি সত্য, কেন না, তদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়েরা চূয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফর্গুসন্ সাহেব অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলা বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না; এদিকে মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব ভাস্কর্য দেখিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক্ মিস্ত্রীর। বেবর (Weber) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও Whitney সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন না, হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহার নিজবুদ্ধিতে এত করে।

এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, আমি স্বদেশীয় পাঠকের জন্য লিখি, হিন্দুদ্বেষীদিগের জন্য লিখি না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মতের অনুবর্তী। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না করিয়াই, কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত বলিয়াই, সেই সকল মতের অনুবর্তী। আমার দুরাকাঙ্ক্ষা যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই, আমি ইউরোপীয় মতেরও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত। যাঁহাদের কাছে বিলাতী সবাই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাঁহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবৎসল। তাঁহাদের জন্য লিখিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্বপূর্ববর্তী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি History ই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুক্কুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না—

"ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ||"

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশ্‌তা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy, Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে, ইঁহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইঁহারা পরিত্যাজ্য।

তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইঁহারা নিজেও বর্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা হেরোডোটাস অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীক্ লিপি বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যে Giffon বা Froude অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্‌কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না।

পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্নানুসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক্ লেখক Megasthenes এবং Ktesias এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,—সে জন্য ইঁহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য!! কি অপরাধে?

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, ঐ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের

রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে—মহাভারতেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই—মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিতে হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না—লিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন একখানা কাপির দ্বারা অন্য কাপির শুদ্ধাশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপিবিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্বপ্রথানুসারে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ, মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদিগের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজি পর্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন।

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

কৃষ্ণচরিত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা
ইউরোপীয়দিগের মত

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা তাঁহাদিগের শিষ্য। তাঁহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব।

বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, এজন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে "Moor" বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে Epic কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থ Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, তবে আর উহার ঐতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দেশী শিষ্যেরা ছাড়েন নাই।

কেন, মহাভারতকে সাহেবরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সর্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত;—বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর;—ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে Epic বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল্ ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীন্ ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্যহেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই—মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে।

মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য? বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্মনির অরণ্যনিবাসী বর্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, Chrysostom নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ী-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাণিনিও তাঁহার মতে "কালকের ছেলে"। তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (Megasthenes) যিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না।* এখানে জর্মান পণ্ডিতটি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপূর্বক ডাক্তার শ্বান্বেক (Dr. Schwanbeck) নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাই এখন মেগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত; সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আদ্যোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস্ মহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাঁহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক

হিন্দু জর্মানি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না?

অন্যান্য পণ্ডিতেরা, বেবর সাহেবের মত, সব উঠাইয়া দিতে চাহেন না। তাঁহারা যে আপত্তি করেন, তাহা দুই প্রকারঃ—

(১) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার পূর্বে এরূপ গ্রন্থ ছিল না।

(২) আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না। পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি কবিকল্পনা মাত্র।

দেশী মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে। দেশীয়েরা বলেন, কলির আরম্ভের ঠিক পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময় বেদব্যাস বর্তমান ছিলেন। কলির প্রবৃত্তিমাত্রে পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির আরম্ভেই অর্থাৎ অদ্য হইতে ৪,৯৯২ বৎসর পূর্বে, মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল।

দুটি মতই ঘোরতর ভ্রমপরিপূর্ণ। দুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নির্ণয়। তাহা নির্ণীত হইলেই কতক বুঝিতে পারিব, মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাণ্ডবাদি কবিকল্পনা মাত্র কি না? তাহা হইলেই জানিতে পারিব, মহাভারতের উপর নির্ভর করা যায় কি না?

* Since Megasthenes says nothing of this epic, it is not an improbable hypothesis that its origin is to be placed in the interval between his times and that of Chrysostom; for what ignorant sailors took note of would hardly have escaped his observation.

History of Sanskrit Literature, English Translation, p. 186. Trubner & Co., 1882.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল

প্রথমে দেশী মতেরই সমালোচনা আবশ্যক। ৪,৯৯২ বৎসর পূর্বে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে, ইহা আমি দেশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। রাজতরঙ্গিণীকার বলেন, কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গোর্নদ্দ কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। আরও বলেন, গোর্নদ্দ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী রাজা। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব প্রায় সাত শত বৎসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ২৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পাওয়া যায়।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে—

সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমৎ নিশি ||
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম।
তে তু পারিক্ষিত কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম ||
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।

—৪ অংশঃ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪

অর্থ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্বদিকে উদিত দেখা যায়, ইঁহাদের সমসূত্রে যে মঘানক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন।* সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরীক্ষিতের সময়; তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।

কিন্তু ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। ঐ ৩৩ শ্লোকের তাৎপর্য অতি দুর্গম—সবিস্তারে বুঝাইতে হইল। সপ্তর্ষিমণ্ডল কতকগুলি স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাম Great Bear বা Ursa Major. মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থিরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গতি নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে—ইংরেজ জ্যোতির্বিদেরা তাহাকে বলেন "Precession of the Equinoxes." এই গতি হিন্দুমতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা। এক এক নক্ষত্রে ১৩১/৩ অংশ। এ হিসাবে কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্র—পরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে—শত বৎসর নয়। তাহা ছাড়া, সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে

পারে না। কারণ মঘা নক্ষত্র সিংহরাশিতে। দ্বাদশ রাশি রাশিচক্রের ভিতর। সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে। যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।

* নক্ষত্র এখানে অশ্বিন্যাদি।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার ঋষি কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন? এমন কথা আমরা বলিতেছি না, আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেণ্ট্লি সাহেব তাহা এইরূপ বুঝিয়াছেনঃ—

"The notion originated in a contrivance of the astronomers to show the quantity of the precession of the equinoxes: This was by assuming an imaginary line, or great circle, passing through the poles of the ecliptic and the beginning of the fixed Magha, which circle was supposed to cut some of the stars in Great Bear.*** The seven stars in the Great Bear being called the Rishis, the circle so assumed was called the line of the Rishis; and being invariably fixed to the beginning of lunar asterism Magha, the precession would be noted by stating the degree &c. of any moveable lunar mansion cut by that fixed line or circle as an index."

Historical View of the Hindu Astronomy, p. 65.

এইরূপ গণনা করিয়া বেণ্ট্লি যুধিষ্ঠিরকে ৫৭৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে যুধিষ্ঠির শাক্যসিংহের অল্প পূর্ববর্তী। আমেরিকার পণ্ডিত Whitney সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন কালাবধারণ-চেষ্টা বৃথা। কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ হইতে পারে, দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ পুরাণকার ঋষির অভিপ্রায় অনুসারেই গণনা করা যাউক। তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সময়ে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপদ্মের সময় পূর্বাষাঢ়ায়।

প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৪।২৪। ৩৯

তার পরে, শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐ কথা আছে—

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ১২।২। ৩২

মঘা হইতে পূর্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র; যথা—মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া। অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ ১০ x ১০০ = সহস্র বৎসর অন্তর।

এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বুঝিতে পারে, তাহা দেখা যাউক। বিষ্ণু পুরাণের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার পূর্বশ্লোক এইঃ—

যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্‌বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৪।২৪। ৩২

নন্দের পুরা নাম নন্দ মহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণে ঐ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে—

"মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কোটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেহভিষেক্ষ্যতি।"

ইহার অর্থ—মহাপদ্ম এবং তাঁহার পুত্রগণ একশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কৌটিল্য* নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্যগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন।

তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর। চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত সম্রাট্—ইনিই মাকিদনীয় যবন আলেক্‌জন্দর ও সিলিউকস্ নৈকটরের সমসাময়িক। ইনি বাহুবলে মাকিদনীয় যবনদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ সিলিউকস্‌কে পরাভূত করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ তখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে তিনি অকুতোভয়ে আলেক্‌জন্দরের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আলেক্‌জন্দর ৩২৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব ঐ ৩১৫ অঙ্কের সহিত উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। ৩১৫ + ১১১৫ = ১৪৩০ খ্রীঃ পূঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়।

অন্যান্য পুরাণেও ঐরূপ কথা আছে। তবে মৎস্য ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে ইহার বড় বেশি পূর্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, তাহার এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়—গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না— "চন্দার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।"

সকলেই জানে যে, বৎসরের দুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটি দিন একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য থাকেন, সেইস্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial point) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ (90 degrees) পরে অয়ন পরিবর্তন হয় (Solstice) । ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান।

মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব না, (তাহা হইলে সদ্গতির হানি হয়); অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—

"মাঘোহয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।"

* বিখ্যাত চাণক্য।

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না, ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্বদিনকে মকর-সংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল; তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত, এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং ১লা মাঘে পূর্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা মাঘে পূর্বের মত

উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তিপাত—বিন্দুর একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত, সুতরাং আয়নপরিবর্তনস্থানও, বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পূর্বকথিত Precession of the Equinoxes—হিন্দুনাম "অয়নচলন"। কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ খ্রীঃ-পূর্বাব্দে হিপার্কস্‌নামা গ্রীক জ্যোতির্বিদ্ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাক্সেলাইন্ ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাশী জ্যোতির্বিদ্ Leverrier ঐ গতি অন্য কারণ হইতে ৫০.২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে Stockwell গণিয়া ৫০.৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক।

ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের* কোন্ দিনে, তাহা লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলে "মাঘেহয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ" কথাটি বলা হইত না। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না, কেন না, রবির শীঘ্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা হইলে খ্রীঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পূরা লইলে খ্রীঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না।

* সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় ঋতুর কথা মহাভারতেই আছে। বার মাস নহিলে ছয় ঋতু হয় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা

ইউরোপীয় মত

মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন মারাত্মক মতভেদ হইতেছে না। কোলব্রুক্ সাহেব গণনা করিয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইলস্‌ন সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলফিন্‌ষ্টোন্ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খ্রীঃ পূঃ ১৩৭০ বৎসরে ঐ যুদ্ধ হয়। বুকাননের মত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রাট সাহেব গণনা করিয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না—ও সব পশ্চাদ্বর্তী কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।

যদি এই দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয়, তবে মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, সে কথা মীমাংসার কিছু প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে, যবেই মহাভারত প্রণীত হউক না কেন—কৃষ্ণঘটিত কথা যাহা কিছু এখন মহাভারতে পাওয়া যায়, সবই মিথ্যা। কেন না, কৃষ্ণঘটিত মহাভাতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির কোন প্রকার ন্যায্যতা আছে কি না।

প্রথমতঃই লাসেন্ সাহেবকে ধরিতে হয়—কেন না, তিনি বড় লব্ধপ্রতিষ্ঠ জর্মাণ পণ্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি যেটুকু স্বীকার করেন সেটুকু এই মাত্র যে, মহাভারতে যে যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহা কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ—পাণ্ডবগণকে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনাপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেন। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র ইউলিয়ম্‌স্ বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সেই মতের অবলম্বী। মতটা কি তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতেছি।

কুরু নামে একজন রাজা ছিলেন। আমরা পুরাণেতিহাসে শুনি, তদ্বংশীয় রাজগণকে কুরু বা কৌরব বলা যায়। তাঁহাদিগের অধিকৃত দেশবাসিগণকেও ঐ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কুরু শব্দে কৌরবাধিকৃত জনপদবাসীদিগকে বুঝাইল। পাঞ্চালেরা দ্বিতীয় জনপদবাসী। এই অর্থেই পাঞ্চাল

শব্দ মহাভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই জনপদ পরস্পর সন্নিহিত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভারতীয় যুদ্ধের পূর্বে এই দুই জনপদ তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বোধ হয়, এককালে এই দুই জনপদবাসিগণ মিলিতই ছিল। কেন না, কুরু-পাঞ্চাল পদ বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ পাঞ্চালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।

এতদূর পর্যন্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাঞ্চালগণই বটে। মহাভারতে কৌরবদিগের প্রতিযুদ্ধকারী সেনা পাঞ্চাল সেনা, অথবা পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ* বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নই সেই সেনার সেনাপতি। পাঞ্চালরাজপুত্র শিখণ্ডীই কৌরবপ্রধান ভীষ্মকে নিপাতিত করেন। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবাচার্য দ্রোণকে নিপাতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রদিগের যুদ্ধ হইত, তাহা হইলে ইহাকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না, পাণ্ডবেরাও কুরু; তাহা হইলে ইহাকে ধার্তরাষ্ট্রপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীষ্ম, এবং কৌরবাচার্য দ্রোণ ও কৃপের সঙ্গে ধার্তরাষ্ট্রদিগের যে সম্বন্ধ, পাণ্ডবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, স্নেহও তুল্য। যদি এ যুদ্ধ ধার্তরাষ্ট্র-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইত, তবে তাঁহারা কখনই দুর্যোধনপক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন না—কেন না, তাঁহারা ধর্মাত্মা ও ন্যায়পর। কুরুপাঞ্চালের বিরোধ পাণ্ডবগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা মহাভারতেই আছে। মহাভারতেই আছে যে, পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ প্রভৃতি সকল কৌরব মিলিত এবং দ্রোণাচার্য কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করেন। এবং পাঞ্চালরাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অতিশয় লাঞ্ছনা করেন।

অতএব এই যুদ্ধ যে প্রধানতঃ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। স্বীকার করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহারা বলেন যে, যুদ্ধটা কুরুপাঞ্চালের, পাণ্ডবেরা কেহ নহেন, পাণ্ডু বা পাণ্ডব কেহ ছিলেন না। এ সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তাঁহারা নির্দেশ করেন। সে সকল হেতুর সমালোচনা আমি পশ্চাৎ করিব। এখন ইহা বুঝাইতে চাই যে, কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ বলিয়া যে, পাণ্ডবদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। পাণ্ডবের শ্বশুর পাঞ্চালাধিপতি ধার্তরাষ্ট্রদিগের উপর আক্রমণ করিলে,

পাণ্ডবেরা তাঁহার সহায় হইয়া, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই;—কৌরবাধিপতি বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। #ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। অন্ধ বলিয়া রাজ্যশাসনে অনধিকারী বা অক্ষম। রাজ্য পাণ্ডুর হস্তগত হইল। পরিশেষে পাণ্ডুকেও রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দেখি—ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধৃতরাষ্ট্রের হাতে গেল। তাহার পর পাণ্ডুপুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল, কাজেই ধৃতরাষ্ট্র ও ধার্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন। তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে পাঞ্চালরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া পাঞ্চালদিগের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপন করিলেন। পাঞ্চালরাজের সাহায্যে এবং তাঁহাদিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলপ্রতাপ যাদবদিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। পরিশেষে সে রাজ্যও ধার্তরাষ্ট্রদিগের করকবলিত হইল।

পাণ্ডবেরা পুনর্বার বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। পরে পাঞ্চালেরা কৌরবদিগকে আক্রমণ করিল। পূর্ববৈর প্রতিশোধজন্য এ আক্রমণ, এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ মাত্র কি না, স্থির করিয়া বলা যায় না। যাই হৌক, পাঞ্চালেরা যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে পাণ্ডবেরা তাঁহাদের পক্ষ থাকিয়া ধার্তরাষ্ট্রগণের সহিত যুদ্ধ করাই সম্ভব।

* সৃঞ্জয়েরা পাঞ্চালভুক্ত—তাহাদিগের জ্ঞাতি।

বিদুর বৈশ্যাজাত।

বলিয়াছি যে, পাণ্ডব ছিল না, এ সব কথা বলিবার উপরিলিখিত পণ্ডিতেরা অন্য কারণ নির্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কোন গ্রন্থে পাণ্ডব নাম পাওয়া যায় না। উত্তরে হিন্দু বলিতে পারেন, এই মহাভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থ—আবার চাই কি? সে কালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগুলা গ্রন্থে তাঁহাদের নাম পাওয়া যাইবে। তবে ইউরোপীয়েরা বলিতে পারেন যে, শতপথব্রাহ্মণ একখানি অনল্পপরবর্তী গ্রন্থ। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র, পরিক্ষিৎ এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের নামগন্ধ নাই—কাজেই পাণ্ডবেরাও ছিল না।

এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে মাকিদনের আলেক্‌জন্দরের নামগন্ধ নাই—অথচ তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যে কাণ্ডটা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি, আলেক্‌জন্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং গ্রীক

ইতিহাসবেত্তা তদ্বৃত্তান্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনামাত্র? কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে গজনবী মহম্মদের নামগন্ধ নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইনি মুসলমান লেখকদিগের কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তি মাত্র? বাঙ্গালার সাহিত্যে বখ্তিয়ার খিলিজির নামমাত্র নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, ইনি মিন্হাজদ্দিনের কল্পনাপ্রসূত মাত্র? যদি তাহা না হয়, তবে একা মিন্হাজদ্দিনের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হইল কিসে, আর মহাভারতের কথা অবিশ্বাসযোগ্য কিসে?

বেবর সাহেব বলেন, শতপথব্রাহ্মণে অর্জুন শব্দ আছে, কিন্তু ইহা ইন্দ্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে-কোন পাণ্ডবকে বুঝায়, এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য তিনি বুঝিয়াছেন যে, পাণ্ডব অর্জুন মিথ্যাকল্পনা, ইন্দ্রস্থানে ইনি আদিষ্ট হইয়াছেন মাত্র। এ বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে আমরা অক্ষম। ইন্দ্রার্থে অর্জুন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য অর্জুন নামে কোন মনুষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমরা অক্ষম।

কথাটা হাসিয়া উড়িয়া দিলে চলিত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বেদ ছাপাইয়াছেন; আর আমরা একে বাঙ্গালী, তাতে গণ্ডমূর্খ, তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় ধৃষ্টতার কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বুঝাই। শতপথব্রাহ্মণে, অর্জুন নাম আছে, ফাল্গুন নামও আছে। যেমন অর্জুন ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম, ফাল্গুনও তেমনই ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন না, ইন্দ্র ফাল্গুনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা;[1] অর্জুনের নাম ফাল্গুন, কেন না, তিনি ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন। হয়ত ইন্দ্রাধিষ্ঠিত নক্ষত্রে জন্ম বলিয়াই তিনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত; ইন্দ্রের ঔরসে তাঁহার জন্ম, এ কথা কোন শিক্ষিত পাঠক বিশ্বাস করিবেন না। আবার অর্জুন শব্দে শুক্ল। মেঘদেবতা ইন্দ্রও শুক্ল নহে, মেঘবর্ণ অর্জুনও শুক্লবর্ণ নহে। উভয়ে নির্মলকর্মকারী শুদ্ধ, পবিত্র; এজন্য উভয়েই অর্জুন। ইন্দ্রের নাম যে অর্জুন, শতপথব্রাহ্মণে সে কথাটা এইরূপে আছে—"অর্জুনো বৈ ইন্দ্রো যদস্য গুহ্যনাম"; অর্জুন ইন্দ্র; সেটি ইঁহার গুহ্য নাম। ইহাতে কি বুঝায় না যে, অর্জুন নামে অন্য ব্যক্তি ছিল, তাঁহার মহিমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার ঐক্যস্থাপনজন্য, অর্জুনের নাম, ইন্দ্রের একটা লুকানো নাম বলিয়া প্রচারিত করিতেছেন? বেবর সাহেব "গুহ্য" অর্থে "mystic" বুঝিয়া, লোককে বোকা বুঝাইয়াছেন।

আর একটি রহস্যের কথা বলি। কুরচি গাছের নামও অর্জুন। আবার কুরচি গাছের নামও ফাল্গুন। এ গাছের নাম অর্জুন, কেন না, ফুল শাদা; ইহার নাম ফাল্গুন,

কেন না, ইহা ফাল্গুন মাসে ফুটে। এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও অর্জুন ও ফাল্গুন বলিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও কখনও ছিল না? পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় Weber সাহেবের জয় গাই।

! এখনকার দৈবজ্ঞেরা এ কথা বলেন না, কিন্তু শতপথব্রাহ্মণেই এ কথা আছে। ২ কাণ্ড, ১ অধ্যায়, ২ ব্রাহ্মণ, ১১, দেখ।

এই সকল পণ্ডিতেরা বলেন যে, কেবল ললিতবিস্তরে, পাণ্ডবদিগের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে পাণ্ডবেরা পার্বত্য দস্যু মাত্র। আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন বুঝা যায় না যে, পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব পাঁচজন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যে, "ফিরিঙ্গী" শব্দ যে দুই একখানা গ্রন্থে পাওয়া যায়, যে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ হয় "Eurasian", নয় "European"—"Frank" শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না, বা এ অর্থে "ফিরিঙ্গী" শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে যদি আমরা সিদ্ধ করি যে, "Frank" জাতি কখন ছিল না, তাহা হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাঁহাদের শিষ্যগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও সেই ভ্রমে পতিত হইব।*

এখনও লাসেন সাহেবের মতের সমালোচনা বাকি আছে। তিনি বলেন, কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার; মহাভারতের ততটুকু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি পাণ্ডব প্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের প্রতি অবিশ্বাসযুক্ত। তিনি বলেন, কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার; মহাভারতের ততটুকু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি পাণ্ডব প্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের প্রতি অবিশ্বাসযুক্ত। তিনি বলেন, অর্জুনাদি সব রূপকমাত্র। যথা—অর্জুন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এজন্য যাহা আলোকময়, তাহাই অর্জুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণাও তদ্রূপ। পাণ্ডবদিগের অবস্থানকালে যিনি রাজ্যধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র। পঞ্চ পাণ্ডব পাঞ্চালের পাঁচটি জাতি, এবং পাঞ্চালীর সহিত তাঁহাদিগের বিবাহ ঐ পঞ্চ জাতির একীকরণ—সূচক মাত্র। যিনি ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সুভদ্রা। অর্জুনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহার্দ্যই এই সুভদ্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

* "বৌদ্ধ-গ্রন্থকারেরা পাণ্ডব নামে পর্বতবাসী একটি জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তাহারা উজ্জয়িনী ও কোশলবাসীদের শত্রু ছিল। (Weber's H. I. Literature, 1878, p. 185.) মহাভারতে পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুরবাসী বলিয়া

বর্ণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরও স্থলবিশেষে লিখিত আছে, প্রথমে তাঁহারা হিমালয় পর্বতে থাকিয়া পরিবর্ধিত হন।

এবং পাণ্ডোঃ সুতাঃ পঞ্চ দেবদত্তা মহাবলাঃ।* *
* * বিবর্ধমানাস্তে তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ ||
আদিপর্ব। ১২৪। ২৭-২৯।

এইরূপে পাণ্ডুর দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পুত্র * * * সেই পবিত্র হিমালয় পর্বতে পরিবর্ধিত হইতে থাকেন।

প্লিনি ও সলিনস্ নামে গ্রীক গ্রন্থকারেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহ্লীক দেশে উত্তরাংশে সোগ্ডিয়েনা দেশের একটি নগরের নাম পাণ্ড্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিন্ধু নদীর মুখ সমীপস্থ জাতিবিশেষকেও পাণ্ড্য বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ভূগোলবিৎ টলেমি পাণ্ড্য-নাম লোকবিশেষকে বিতস্তা নদীর সমীপস্থ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। কাত্যায়ন একটি পাণিনিসূত্রের বার্তিকে পাণ্ডু হইতে পাণ্ড্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।[#] লক্ষ্মীধর স্বকৃত ষড়্ভাষাচন্দ্রিকার মধ্যে কেকয় বাহ্লীকাদি উত্তরদিক্স্থ কতকগুলি জনপদের সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সে সমুদয়কে পিশাচ অর্থাৎ অসভ্য দেশবিশেষ বলিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন।

"পাণ্ড্যকেকয়বাহ্লীক * * * এতে পৈশাচদেশাঃ স্যু।"

হরিবংশে দক্ষিণদিক্স্থ চোল কেরলাদির সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে। (হরিবংশ, ৩২ অ, ১২৪ শ্লো) অতএব উহা দক্ষিণাপথের অন্তর্গত পাণ্ড্য দেশ। শ্রীমান্ উইলসন্ বিবেচনা করেন; ঐ জাতীয় লোক প্রথমে সোগ্ডিয়েনা দেশের অধিবাসী ছিল; তথা হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে এবং উত্তরোত্তর ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবাস করিয়া পশ্চাৎ হস্তিনাপুর-বাসী হয়, ও অবশেষে দক্ষিণাপথে গিয়া পাণ্ড্যরাজ্য সংস্থাপন করে। Asiatic Researches, Vol. XV., pp. 95 and 96.

রাজতরঙ্গিণীর মতে, কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরুবংশীয়। অতএব তৎপ্রদেশ হইতে পাণ্ডবদের হস্তিনায় আসিয়া উপনিবেশ করা সম্ভব। তাঁহারা মধ্যদেশবাসী অথচ কিরূপে পাণ্ডব বলিয়া পরিচিত হইলেন, এই সমস্যা পূরাণার্থেই কি পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? তাঁহাদের

জন্মবৃত্তান্তঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধই আছে। লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

যদা চিরমৃতঃ পাণ্ডু কথং তস্যেতি চাপরে।

আদিপর্ব। ১। ১১৭।

অন্য অন্য লোকে বলিল, "বহুকাল অতীত হইল, পাণ্ডু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অতএব ইঁহারা কিরূপে তদীয় পুত্র হইতে পারেন?"

ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১০৫ পৃঃ। অক্ষয় বাবু সচরাচর ইউরোপীয়-দিগের মতের অবলম্বী।
পাণ্ডোর্ড্যণ্ বক্তব্যঃ—বার্তিক।

আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ সকলে—বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যেও রূপকের অতিশয় প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমাদিগকেও অনেকগুলি রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বীকার করিতে পারি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, সবই রূপক—যে রূপক ছাড়া শাস্ত্রগ্রন্থে আর কিছুই নাই।

আমরা ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা রূপক হউক বা না হউক, রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের ভিতর 'রম্' ধাতু পাওয়া, এবং সীতার নামের ভিতর 'সি' ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য রামায়ণ কৃষিকার্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্মন্ পণ্ডিতেরা এমনই দুই চারিটা ধাতু আশ্রয় করিয়া ঋগ্বেদের সকল সূক্তগুলিকে সূর্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায়। আমাদিগের মনে পড়ে, এক সময় রহস্যচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। তোমরা বলিবে, তিনি সে দিনের মানুষ—তাঁহার রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ, সকলই আজিও বিদ্যমান আছে, তিনিও ইতিহাসে কীর্তিত হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরূপী। কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ স্থানে তাঁহার রাজধানী। তাঁহার ছয় পুত্র, অর্থাৎ তমোগুণ হইতে ছয় রিপুর উৎপত্তি। একজন বালক পলাসির যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি তাহা ক্লীবগুণযুক্ত ক্লৈব (Clive) কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন।

অতএব রূপকের অভাব নাই। আর এই বালকরচিত রূপকের সঙ্গে লাসেন্‌রচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে 'লস্' ধাতু খোদ লাসেন্ সাহেবের নামের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়া, তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা ক্রীড়াকৌতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক (Talboys Wheeler), সাহেবেরও একটা মত আছে। যখন হস্তী অশ্ব তলগামী, তখন মেষের জলপরিমাপেচ্ছার প্রতি বেশী শ্রদ্ধা করা যায় না। তিনি বলেন,—হাঁ ইহার কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা সামান্য মাত্র—

"The adventures of the Pandavas in the jungle, and their encounters with Asuras and Rakshasas are all palpable fictions, still they are valuable as traces which have been left in the minds of the people of the primitive wars of the Aryans against the Aborigines."

টল্‌বয়স্ হুইলর সাহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাঁহার অবলম্বন বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি। তিনি অবিনাশ বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, মূল মহাভারত অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে দেন। অবিনাশ বাবু রহস্যপ্রিয় লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাসের মহাভারত হইতে কত দূর অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু হুইলর সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রী মূল মহাভারতের অংশ বলিয়া পাচার করিয়াছেন। যে বর্ষীয়সী মাণিকপীরের গান শুনিয়া রামায়ণভ্রমে অশ্রুমোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পণ্ডিতবরের অপেক্ষা উপহাসাস্পদ নহে। ঈদৃশ লেখকের মতের প্রতিবাদ করা পাঠকের সময় বৃথা নষ্ট করা বিবেচনা করি। ফলে মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহার লিখিত বৃত্তান্ত ও পাণ্ডবাদি নায়ক সকল কল্পনাপ্রসূত, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সকলই এইরূপ অকিঞ্চিৎকর। সকলগুলির প্রতিবাদ করিবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিপ্ত, ইহা আমি স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডবাদির সকল কথা প্রক্ষিপ্ত নহে। ইহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা ঐতিহাসিক, ইহা বিবেচনা করিবার কারণ যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পরপরিচ্ছেদে আরও কিছু বলিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা

পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,—

মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্নগৃষ্টীষ্বাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরৌররবপ্রবৃদ্ধেষু। ৬। ২। ৩৮

অর্থাৎ ব্রীহি ইত্যাদি শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব্দ 'ভারত'। অতএব পাণিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ ভিন্ন আর কোন বস্তু "মহাভারত" নামে কখনও অভিহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। Weber সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভরতবংশ। এটি কেবল তাঁহার গায়ের জোর। এমন প্রয়োগ কোথাও নাই।

পুনশ্চ, পাণিনিসূত্র—

"গবিযুধিভ্যাং স্থির।""গবিযুধিভ্যাং স্থির।" ৮। ৩। ৯৫

গবি ও যুধি শব্দের পর স্থির শব্দের স স্থানে ষ হয়। যথা—গবিষ্ঠিরঃ, যুধিষ্ঠিরঃ।

পুনশ্চ,—

"বহ্বচ ইজঃ প্রাচ্যভরতেষু।" ২। ৪। ৬৬

ভরতগোত্রের উদাহরণ "যুধিষ্ঠিরাঃ।"*

পুনশ্চ,—

"স্ত্রিয়ামবন্তিকুন্তিকুরুভ্যশ্চ।" ৪। ১। ১৭৬

পাওয়া গেল "কুন্তি"।

পুনশ্চ,—

পুনশ্চ,— "বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্।" ৪। ৩। ৯৮

অর্থাৎ বাসুদেব ও অর্জুন শব্দের পর ষষ্ঠ্যর্থে বুন্ হয়।

পুনশ্চ,—

"নভ্রাণ্নপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেষু।" ৬। ৩। ৭৫

ইহাতে "নকুল" পাওয়া গেল।

দ্রোণপর্বতজীবন্তাদন্যতরতরস্যাম্। ৪। ১। ১০৩

"দ্রোণায়ন" শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বত্থামা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। এইরূপ পাঁচটি পাণ্ডবের নামেই এবং কুন্তী, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতির নাম পাণিনিসূত্রে পাওয়া যায়।

যদি মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গ্রন্থের নায়কদিগের নাম পাওয়া গেল, তবে পাণিনির সময়েও মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস। এখন দেখিতে হইবে, পাণিনি কবেকার লোক।

* উদাহরণটি সিদ্ধান্তকৌমুদীর, ইহা বলা কর্তব্য।

ভারতদ্বেষী Weber সাহেব তাঁহাকেও আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার মত চলে নাই,—স্বয়ং গোল্ড্‌ষ্টুকর পাণিনির অভ্যুদয়কাল নির্ণীত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এ স্থান নহে; কিন্তু বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গালায় সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব না বলিলেও চলিবে। যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ্ পড়িতে ঘৃণা করেন, তাঁহারা গোল্ড্‌ষ্টুকরের গ্রন্থই ইংরাজিতে পড়িতে পারেন। তাঁহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন, এজন্য Weber সাহেব অতিশয় দুঃখিত। তিনি গোল্ড্‌ষ্টুকরের প্রতিবাদও করিয়াছেন, এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, জয়পতাকা আমিই উড়াইয়াছি। কিন্তু আর কেহ তাহা বলে না।

গোল্ড্‌ষ্টুকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সূত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবের* আবির্ভাব হয় নাই। তবেই পাণিনি অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, তখন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। ঋক্, যজুঃ, সামসংহিতা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন প্রভৃতি অভ্যুদিত হন নাই। মক্ষমূলর বলেন, ব্রাহ্মণ-প্রণয়ন-কাল খ্রীঃ পূঃ সহস্র বৎসর হইতে আরম্ভ। ডাক্তার মার্টিন হৌগ বলেন, ঐ শেষ; খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আরম্ভ। অতএব পাণিনির সময় খ্রীঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী বলিলে বেশী বলা হয় না।

Max, Muller, Weber, প্রভৃতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্তু কাহারও কথায় গোল্ড্‌ষ্টুকরের মত খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচার্যের এ মত গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে ইহা স্থির যে, খ্রীষ্টের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরাদির বৃত্তান্তসংযুক্ত মহাভারত গ্রন্থ্ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে, পাণিনিকে মহাভারত ও যুধিষ্ঠিরাদির ব্যুৎপত্তি লিখিতে হইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার অনেক

পূর্বেই মহাভারত প্রচলিত হইয়াছিল। কেন না, “বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্” এই সূত্রে ‘বাসুদেবক’ ও ‘অর্জুনক’ শব্দ এই অর্থে পাওয়া যায়, বাসুদেবের উপাসক, অর্জুনের উপাসক। অতএব পাণিনিসূত্রপ্রণয়নের পূর্বেই কৃষ্ণার্জুন দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের অনল্প পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উচ্ছেদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রেও মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার কাহারও অধিকার নাই।

* মহাভারতে ‘বৌদ্ধ’ শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা

কৃষ্ণের নাম পাণিনির কোন সূত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়া যায় না। কেন না, ঋগ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ* শব্দ অনেকবার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে এবং ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বাসুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই ঋগ্বেদসংহিতার অনেকগুলি সূক্তের ঋষি একজন কৃষ্ণ। তাঁহার কথা পরে বলিতেছি। অথর্বসংহিতায় অসুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বাসুদেবনন্দন সন্দেহ নাই। কেশিনিধনের কথা আমি পশ্চাৎ বলিব।

পাণিনির সূত্রে 'বাসুদেব' নাম আছে-সে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ মহাভারতে বাসুদেব নামে সচরাচর অভিহিত হইয়াছেন। বসুদেবের পুত্র বলিয়াই বাসুদেব নাম নহে, সে কথা স্থানান্তরে বলিব। বসুদেবের পুত্র না হইলেও বাসুদেব নাম হয়। এই মহাভারতেই পাওয়া যায়-পুণ্ড্রাধিপতিরও নাম ছিল বাসুদেব। বসুদেবকে কবিকল্পনা বলিতে হয়, বল-কিন্তু বাসুদেব কবিকল্পনা নহেন।

ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ বিবেচনা করিবার যে সকল কারণ তাঁহারা নির্দেশ করেন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কেহ বলেন, কৃষ্ণকে মহাভারত হইতে উঠাইয়া দিলে মহাভারতের কোন ক্ষতি হয় না। এক হিসাবে নয় বটে। গত ফরাসীপ্রুসের যুদ্ধ হইতে মোল্‌টকেকে উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না। Gravelotte, Woerth, Metz, Sedan, Paris প্রভৃতি রণজয় সবই বজায় থাকে; কেন না, Moltke হাতে হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। তাঁহার সেনাপতিত্ব তারে তারে বা পত্রে পত্রে নির্বাহিত হইয়াছিল। মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে উঠাইয়া দিলে সেরূপ ক্ষতি হয় না। তাহার বেশী ক্ষতি হয় কি না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন।

হুইলর সাহেবেরও এ বিষয়ে একটা মত আছে। তাঁহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার মতে প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি মতটা কিয়ৎপরিমাণে চলিয়াছে বলিয়া, তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম। তিনি বলেন, দ্বারকা হস্তিনাপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান। কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মহাভারতে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, আমরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কাজেই উত্তর করিতে পারিলাম

না। বাঙ্গালার মুসলমান রাজপুরুষদিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যিনিই স্মরণ করিবেন, তিনিই বোধ হয়, হুইলর সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাত করিবেন না।

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Bournouf বলেন যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, ঐ শাস্ত্র প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্তিত হয়, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মধ্যে সূত্রপিটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসূর বলা হইয়াছে। কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণকে যে অসূর বিবেচনা করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অসূর বলা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ধর্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন "মার"। কৃষ্ণপ্রচারিত অপূর্ব নিষ্কামধর্ম, তৎকৃত সনাতন ধর্মের অপূর্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্মপ্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহারা কৃষ্ণকেই অনেক সময় মার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

* কৃষ্ণ শব্দ আমি পাণিনির অষ্টাধ্যায় খুঁজিয়া পাই নাই।—আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ শব্দ যে পাণিনির পূর্বে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, ঋগ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ শব্দ পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনামা বৈদিক ঋষির কথা পশ্চাৎ বলিতেছি। তদ্ভিন্ন অষ্টম মণ্ডলে ৯৬ সূক্তে কৃষ্ণনামা একজন অনার্য রাজার কথা পাওয়া যায়। এই অনার্য কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরবাসী; সুতরাং ইনি যে বাসুদেব কৃষ্ণ নহেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, পাণিনির কোন সূত্রে "কৃষ্ণ" শব্দ থাকিলে তাহা বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু পাণিনিসূত্রে "বাসুদেব" নাম যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য ঠিক। তাহাই আছে।

এ সকল কথা থাক। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে; সেইটি উদ্ধৃত করিতেছি। কথাটি এই–

"তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা, উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোহন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।"

ইহার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে ঋষি) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন, (শুনিয়া তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি কথা অবলম্বন করিবে, "তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।"

এই ঘোর ঋষির পুত্র কণ্ব*। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তের ঋষি। যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ সূক্ত হইতে ৪৩ সূক্ত পর্যন্ত; এবং কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঐ মণ্ডলের ১২শ হইতে ২৩শ পর্যন্ত সূক্তের ঋষি। এবং কণ্বের অন্য পুত্র প্রস্কণ্ব ঐ মণ্ডলের ৪৪ হইতে ৫০ পর্যন্ত সূক্তের ঋষি। এখন নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, "যস্য বাক্যংস ঋষিঃ।" অতএব ঋষিগণ সূক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্তা বটে। অতএব ঘোরের পুত্র এবং পৌত্রগণ ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তের বক্তা। তাহা যদি হয়, তবে ঘোরশিষ্য কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সূক্তগুলি উক্ত হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ করা যায় না। অতএব কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক লোক, উপন্যাসের বিষয়মাত্র নহেন, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় করা যায় না।

ঋগ্বেদসংহিতায় অষ্টম মণ্ডলে ৮৫। ৮৬। ৮৭ সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২।৪৩।৪৪ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বলা যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সূক্তের ঋষি নহেন; কেন না, ত্রসদস্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রতর্দন, কক্ষীবান্ প্রভৃতি রাজর্ষি যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও ঋগ্বেদ-সূক্তের ঋষি, ইহা দেখা যায়। দুই এক স্থানে শূদ্র ঋষির উল্লেখও পাওয়া যায়। কবষ নামে দশম মণ্ডলে একজন শূদ্র ঋষি আছেন; অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের ঋষিত্বে আপত্তি হইতে পারে না। তবে ঋগ্বেদসংহিতার অনুক্রমণিকায় শৌনক কৃষ্ণ আঙ্গিরস ঋষি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

উপনিষদ্ সকল বেদের শেষভাগ, এই জন্য উপনিষদ্‌কে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল অংশকে ব্রাহ্মণ বলে, তাহা উপনিষদ্ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। অতএব ছান্দোগ্যোপণিষদ্ হইতে কৌষীতকিব্রাহ্মণ আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও এই আঙ্গিরস ঘোরের নাম আছে, এবং কৃষ্ণেরও নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় দেবকীপুত্র বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই; আঙ্গিরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

কিন্তু কতকগুলি ক্ষত্রিয়ও আঙ্গিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে একটি প্রাচীন শ্লোক ধৃত হইয়াছে।

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষাত্রোপেতো দ্বিজাতয়ঃ|| —৪ অংশ, ২।২

কিন্তু এই রথীতর রাজা সূর্যবংশীয়। কৃষ্ণের পূর্বপুরুষ যদু, যযাতির পুত্র, কাজেই চন্দ্রবংশীয়। এই কথাই সকল পুরাণেতিহাসে লেখে, কিন্তু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে পাওয়া যায় যে, মথুরার যাদবেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়।

এবং ইক্ষ্বাকুবংশাদ্ধি যদুবংশো বিনিঃসৃতঃ।—৯৫ অধ্যায়ে, ৫২৯ শ্লোকঃ।

কথাটা খুব সম্ভব, কেন না, রামায়ণে পাওয়া যায় যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রঘ্ন মথুরাজয় করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, "বাসুদেবর্জুনাভ্যাং বুন্" এই সূত্র আমরা পাণিনি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বলিয়া আর্যসমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্ট।

* এই কণ্ব শকুন্তলার পালকপিতা কণ্ব নহেন। সে কণ্ব কাশ্যপ; ঘোরপুত্র কণ্ব আঙ্গিরস।

নবম পরিচ্ছেদ—মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত

আমরা এতক্ষণ যা বলিলাম, তাহার স্থূলমর্ম এই যে, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা আছে, এবং মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, মহাভারতের কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব?

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা, বা মহাভারত কথিত কৃষ্ণপাণ্ডবসম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, প্রাচীন কালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্তু সে এ মহাভারত নহে। ইহার অর্থ যদি এমন বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার করি না বলিয়াই, তাঁহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি। আর তাঁহাদের কথার মর্ম্মার্থ যদি এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিপ্ত উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, তবে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নাই।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে সে আদিম মহাভারতের। অতএব বর্তমান মহাভারতের কোন্ অংশ আদিমমহাভারতভুক্ত, তাহাই প্রথমে আমাদের বিচার্য বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহারই কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলে থাকিতে পারে। তাহাতে যাহা নাই, অন্য গ্রন্থে থাকিলেও, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কেন না, মহাভারতই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, তাহারই বা প্রমাণ কি? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব।

আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্বসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত বা বিবৃত আছে, ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা এখনকার গ্রন্থের সূচিপত্র বা Table of Contents সদৃশ। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাভুক্ত হইয়াছে। এখন যদি দেখা যায় যে, কোন একটা গুরুতর বিষয় ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা প্রক্ষিপ্ত। একটা উদাহরণ দিতেছি। আশ্বমেধিক পর্বে অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা

পর্বাধ্যায় পাওয়া যায়। এই দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্তু পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে উহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা সমস্তই প্রক্ষিপ্ত।

২য়-অনুক্রমণিকাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লোক, এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন্ পর্বে কত শ্লোক, তাহা লিখিত হইয়াছে। যথা—

আদি	...	...	...	৮৮৮৪
সভা	...	...	...	২৫১১
বন	...	...	...	১১৬৬৪
বিরাট	...	...	...	২০৫০
উদ্যোগ	...	...	...	৬৬৯৮
ভীষ্ম	...	...	...	৫৮৮৪
দ্রোণ	...	...	...	৮৯০৯
কর্ণ	...	...	...	৪৯৬৪
শল্য	...	...	...	৩২২০
সৌপ্তিক	...	...	...	৮৭০
স্ত্রী	...	...	...	৭৭৫
শান্তি	...	...	...	১৪৭৩২
অনুশাসন	...	...	...	৮০০০
আশ্বমেধিক	...	...	...	৩৩২০
আশ্রমবাসিক	...	...	...	১৫০৬
মৌসল	...	...	...	৩২০
মহাপ্রস্থানিক	...	...	...	৩২০
স্বর্গারোহণ	...	...	...	২০৯

ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না; মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লোক পূরাইবার জন্য পর্বাধ্যায়সংগ্রকার লিখিলেনঃ—

"অষ্টাদশৈবমুক্তানি পর্বাণ্যেতান্যশেষতঃ।
খিলেষু হরিবংশঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ প্রকীর্তিতম্ ||

দশশ্লোকসহস্রাণি বিংশশ্লোকশতানি চ।
খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহর্ষিণা ||”

অর্থাৎ “এইরূপে অষ্টাদশপর্ব সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে। ইহার পর হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব কথিত হইয়াছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যা করিয়াছেন।” পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬,৯৩৬ শ্লোক হইল। এক্ষণে প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক গণনা করিয়া নিম্নলিখিত সংখ্যা সকল পাওয়া যায়ঃ—

আদি	...	...	...	৮৪৭৯
সভা	...	...	...	২৭০৯
বন	...	...	...	১৭,৪৭৮
বিরাট	...	...	...	২৩৭৬
উদ্যোগ	...	...	...	৭৬৫৬
ভীষ্ম	...	...	...	৫৮৫৬
দ্রোণ	...	...	...	৯৬৪৯
কর্ণ	...	...	...	৫০৪৬
শল্য	...	...	...	৩৬৭১
সৌপ্তিক	...	...	...	৮১১
স্ত্রী	...	...	...	৮২৭

শান্তি	...	...	...	১৩,৯৪৩
অনুশাসন	...	...	...	৭৭৯৬
আশ্বমেধিক	...	...	...	২৯০০
আশ্রমবাসিক	...	...	...	১১০৫
মৌসল	...	...	...	২৯২
মহাপ্রস্থানিক	...	...	...	১০৯
স্বর্গারোহণ	...	...	...	৩১২
খিল হরিবংশ	...	...	...	১৬,৩৪৭

মোট ১০৭৩৯০। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই ছিল না। পর্বসংগ্রহের পর হরিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার শ্লোক বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

৩য়—এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ অনুক্রমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সার্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকা লিখিয়াছিলেন।

"ততোহধ্যর্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্বণাম্ ||"

এক্ষণে বর্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব পর্বসংগ্রহাধ্যায় লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশী পাওয়া যায়।

৪র্থ—পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪, ৮৩৬ শ্লোকে পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, পর্বসংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার কর্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং

আদিম মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সঙ্কলিত হয় নাই। মহাভারতেই আছে যে, মহাভারত বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট কহিতেছেন। পর্বাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার উক্তি বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি নহে, কাজেই ইহা আদিম বা বৈশম্পায়নের মহাভারতের অংশ নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ বা আস্তীকপর্বাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন। সুতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাঃ ঋষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, তখনই পর্বসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ ছিল। এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলনপূর্বক অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইবার পূর্বেও যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয়।

৫ম,—ঐ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ||
ততোহধ্যর্ধশতং ভূয় সংক্ষেপং কৃতবানৃষি।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্বণাম্ ||
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্বং পুত্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্।
ততোহন্যেভ্যোহনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ || —
আদিপর্ব, ১০১-১০৩।

শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারতশিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব এই চতুর্বিংশতি-সহস্রশ্লোকাত্মক মহাভারতই জনমেজয়ের নিকট পঠিত হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে চতুর্বিংশতি সহস্র মাত্র শ্লোক ছিল। পরে ক্রমে নানা ব্যক্তির রচনা উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াছে। সত্য বটে, ঐ অনুক্রমণিকাতেই লিখিত আছে যে, তাহার পর বেদব্যাস ষষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ

পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ধগর্বলোকে ও এক লক্ষ মাত্র মনুষ্যলোকে পঠিত হইয়া থাকে। এই অনৈসর্গিক ব্যাপারঘটিত কথাটা যে আদিম অনুক্রমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। দেবলোকে বা পিতৃলোকে বা গন্ধর্বলোকে মহাভারতপাঠ, অথবা বেদব্যাসই হউন বা যেই হউন, ব্যক্তিবিশেষের ষষ্টি লক্ষ শ্লোক রচনা করা আমরা সহজেই অবিশ্বাস করিতে পারি। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ২৭২ শ্লোকাত্মক উপক্রমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। এই ষষ্টি লক্ষ শ্লোক এবং লক্ষ শ্লোকের কথা প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ—প্রক্ষিপ্তনির্বাচনপ্রণালী

আমাদিগের বিচার্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইহা পূর্বপরিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করিবার কোন উপায় আছে কি না। অর্থাৎ কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহা স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় কি না?

মনুষ্যজীবনে যে সকল কার্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নির্বাহ করা যায়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্তা প্রয়োজনীয় হয়। যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সচরাচর জীবনযাত্রার কার্য নির্বাহ করি, তাহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয় না, এবং আদালতে যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক একটা নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। এই জন্য বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। যথা—আদালতের জন্য প্রমাণসম্বন্ধীয় আইন (Law of Evidence), বিজ্ঞানের জন্য অনুমানতত্ত্ব (Logic বা Inductive Philosophy) এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ জন্য এইরূপ একটি প্রমাণশাস্ত্রও আছে। উপস্থিত তত্ত্ব নিরূপণ জন্য সেইরূপ কতকগুলি প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে; যথা—

১ম,—আমরা পূর্বে পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা বলিয়াছি। যাহার প্রসঙ্গ সেই পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা যে নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত, ইহাও বুঝাইয়াছি। এইটিই আমাদিগের প্রথম সূত্র।

২য়,—অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর যিনিই হউন, তিনি মহাভারত রচনা করিয়া সার্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন। ঐ অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৫১ শ্লোক পর্যন্ত এইরূপ একটি সারসঙ্কলন আছে। যদিও ইহাতে সার্ধশতের অপেক্ষা ৯টি শ্লোক বেশী হইল, তাহা না ধরিলেও চলে। এমনও হইতে পারে যে, ৯টি শ্লোক ইহারই মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য।

৩য়,—যাহা পরস্পর বিরোধী, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষিপ্ত। যদি দেখি যে, কোন ঘটনা দুই বার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণ

ভিন্নপ্রকার বা পরস্পর বিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তি দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানতা বা অক্ষমতাবশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাও অনায়াসে নির্বাচন করা যায়।

৪র্থ,—সুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে, তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না—কেন না, তাহার অভাবে মহাভারতে মহাভারতত্ব থাকে না, দেখা যায় যে, সেগুলির রচনাপ্রণালী সর্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, তাহা পূর্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

৫ম,—মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। মনে কর, যদি কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব যে, ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।

৬ষ্ঠ,—যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্বোক্ত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৭ম,—যদি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত বোধ হয়, যেটি অন্য কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, সেইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এখন এই পর্যন্ত বুঝান গেল। নির্বাচনপ্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে।

কৃষ্ণচরিত্র

একাদশ পরিচ্ছেদ—নির্বাচনের ফল

মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবর্তী হইয়া বিচারপূর্বক আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল; তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মিকা ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত; অথচ তাহার অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের রচনা অতি উদার, বিকৃতিশূন্য, অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিন্তু পরমার্থিক দার্শনিকতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত; কবিত্বশূন্য নহে, কিন্তু যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্বিষয়ে সৃষ্টিচাতুর্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহাই তাহাই দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক, বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেন না, প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা কঙ্কালবিচ্যুতমাংসপিণ্ডের ন্যায় বন্ধনশূন্য এবং প্রয়োজনশূন্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, কেবল কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় অলঙ্কার বাদ যায়; পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে। অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি। প্রথম স্তরে ও দ্বিতীয় স্তরে, আর একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে, প্রথমস্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, তিনি স্পষ্টত্ বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চিত; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন; কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্নশীল।

ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি। তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া "বেশ রচিয়াছি" মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পূরিয়া দিয়াছে। মহাভারত পঞ্চম বেদ। এ কথার একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে। চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার নাই কিন্তু Mass Education লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রতিভাশালী পূর্বপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন না। তাঁহারা "অতীতের সহিত বর্তমানের বিচ্ছেদকে" বড় ভয় করিতেন। পূর্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই।—ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক। তাঁহারা ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার, তাহা স্ত্রীলোকে ও শূদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্থানে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়। বরং যাহা সর্বজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্বলোকের নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, তাহা ব্রাহ্মণদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীর্তি;* কিন্তু এই কারণে ভালমন্দ অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তিপর্ব ও অনুশাসনিক পর্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপর্বের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায়, বনপর্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্বাধ্যায়, উদ্যোগপর্বের প্রজাগর পর্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সঞ্চয় কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে আদিপর্বের শকুন্তলোপাখ্যানের পূর্বের যে অংশ এবং বনপর্বের তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তর-গত।

এই তিন স্তরের, নিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, তাহা কবিকল্পিত অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদিগের পরিত্যাগ করা উচিত।

* স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং—শ্রীমদ্ভাগবত। ১ স্ক। ৪অ। ২৫।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—অনৈসর্গিক বা অতিপ্রকৃত

এতদূরে আমরা যে কথা পাইলাম, তাহা স্থূলতঃ এইঃ— যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথা আছে, তাহার মধ্যে মহাভারত সর্বপূর্ববর্তী। তবে, আমাদিগের মধ্যে যে মহাভারত প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক ভাগ মাত্র মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু, সেই ঐতিহাসিকতা কতটুকু?

এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন যে, সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেন না মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত; ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকালিক ব্যক্তি; মহাভারত সমসাময়িক আখ্যান,—Contemporary History, ইহার মৌলিক অংশ অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য।

এখন যে মহাভারত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসাময়িক গ্রন্থ বলিতে পারি না। আদিম মহাভারত ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহা পাইয়াছি? প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা কি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচলিত, তাহা উগ্রশ্রবাঃ সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদিগের নিকট বলিতেছেন। তিনি বলেন যে, জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের নিকট যে মহাভারত শুনিয়াছিলেন, তাহাই তিনি ঋষিদিগের শুনাইবেন। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবাঃ সৌতি তাঁহার পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের জন্মবৃত্তান্তের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন কর্তৃকই কথিত হইয়াছে যে—

বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্ ||
প্রভুর্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ।
সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্‌ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ || —আদিপর্ব। ৬৩অ। / ৯৫-৯৬

অর্থাৎ ব্যাসদেব, বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্র শুক, এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভারতসংহিতা প্রকাশিতা করিলেন।*

তাহা হইলে, প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারতসংহিতা। ইহা জনমেজয়ের সভায় প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাণ্ডবদিগের প্রপৌত্র।

সে যাহা হউক, উপস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। উগ্রশ্রবাঃ বলিতেছেন যে, আমি ইহা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছি। অথবা

তাঁহার পিতা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ যাহা বলিতেছেন, তাহা আমরা আর এক ব্যক্তির নিকট পাইতেছি। সেই ব্যক্তিই বর্তমান মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের প্রণেতা, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে তিনিই বক্তা।

তিনি বলিতেছেন, নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষি উপস্থিত; সেখানে উগ্রশ্রবাঃ আসিলেন, এবং ঋষিগণের সঙ্গে উগ্রশ্রবাঃর এই ভারত সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছেন।

তবে ইহা স্থির যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়সিকী সংহিতা নহে। (২) ইহা বৈশম্পায়ন-সংহিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন-সংহিতা পাইয়াছি কি না, তাহা সন্দেহ। তার পর প্রমাণ করিয়াছি যে, (৩) ইহার প্রায় তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত। অতএব আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক যে, মহাভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে।

* জৈমিনিভারতের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার অশ্বমেধ-পর্ব বেবর সাহেব দেখিয়াছেন। আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে আছে— "সুমন্তুজৈমিনিবৈশম্পায়নপৈল-সূত্র-ভারতমহাভারত-ধর্মচার্যাঃ। তাহা হইলে সুমন্তুসূত্রকার, জৈমিনি ভারতকার, বৈশম্পায়ন মহাভারতকার, এবং পৈল ধর্মশাস্ত্রকার।

সেই সাবধানতার জন্য আবশ্যক যে, যাহা অতিপ্রকৃত বা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিব না।

আমি এমন বলি না যে, আমরা যাহাকে অনৈসর্গিক বলি, তাহা কাজে কাজেই মিথ্যা। আমি জানি যে, এমন অনেক নৈসর্গিক নিয়ম আছে, যাহা আমরা অবগত নহি। যেমন একজন বন্যজাতীয় মনুষ্য, একটা ঘড়ি, কি বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রীকে অনৈসর্গিক ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি। আপনাদিগের এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, কোন অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন না, আপনার জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন ঐশিক নিয়ম প্রমাণ ব্যতীত কাহারও স্বীকার করা কর্তব্য নহে। যদি তোমাকে কেহ বলে, আমগাছে তাল ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহা বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। তোমাকে বলিতে হইবে, হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় বুঝাইয়া

দাও কি প্রকারে ইহা হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি বলে, 'আমি দেখি নাই—শুনিয়াছি,' তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেল না। মহাভারতও তাই। অতিপ্রকৃতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইতেছি না।

বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও অতিপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। নিজে চক্ষে দেখিলে হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, বরং আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন সম্ভব নহে। বুঝাইয়া দাও যে, যাহাকে অতিপ্রকৃত বলিতেছি, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝিব। বন্যজাতীয়কে ঘড়ি বা বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রী বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

আর ইহাও বক্তব্য যে, যদি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় (আমি তাহা করিয়া থাকি), তাহা হইলে, তাঁহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে না ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া ঐশী শক্তি দ্বারা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতেন, ততক্ষণ আমি অনৈসর্গিক ঘটনা তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি না বা বিশ্বাস করিতে পারি না।

কেবল তাহাই নহে। যদি স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে অতিপ্রকৃত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু যাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ নহে, এমন সকল অনৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সাল্ব অসুর অন্তরীক্ষে সৌভনগর স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল; বাণের সহস্র বাহু; অশ্বত্থামা ব্রহ্মশিরা অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হইতে লাগিল; এবং পরিশেষে অশ্বত্থামার আদেশানুসারে, উত্তরার গর্ভস্থ বালককে গর্ভমধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করিব কেন?

তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসর্গিক কর্মেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তিনি মানবশরীর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসর্গিক কর্ম করেন, তবে তাহা তাঁহার দৈবী বা ঐশী শক্তির দ্বারা! কিন্তু দৈবী বা ঐশী শক্তি দ্বারা যদি কর্ম

সম্পাদন করিবেন, তবে তাঁহার মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সর্বকর্তা সর্বশক্তিমান্, ইচ্ছাময়—যাঁহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তিনি মনুষ্যশরীর ধারণ না করিয়াও কেবল তাঁহার ঐশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অসুরের বা মানুষের সংহার বা অন্য যে কোন অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈবী শক্তি বা ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য নির্বাহ করিবেন, তবে তাঁহার মনুষ্যশরীরধারণের প্রয়োজন নাই। যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্বক মনুষ্যের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা ঐশী শক্তির প্রয়োগ তাঁহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে শরীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কর্ম আছে কি যে, জগদীশ্বর শরীরধারণ না করিলে সিদ্ধ হয় না?

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের মানবশরীরধারণ কি সম্ভব?

প্রথমে ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব?

বস্তুতঃ কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদিগের খ্রীষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয়।

এখানে একটা নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে—(১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার কি না। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছা করি।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের খ্রীষ্টীয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্থূল কথা লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়া মানিতে হয়, নহিলে যিশু টিকেন না। আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে।

ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা তাঁহাদিগের সঙ্গে কোন বিচার করি না। তাঁহাদের ঘৃণা করিয়া বিচার করি না, এমত নহে। তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাঁহারা আমাদের ঘৃণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই।

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর নির্গুণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নির্গুণ, সুতরাং তাঁহার অবতার অসম্ভব।

এ আপত্তিরও আমাকে বড় সোজা উত্তর দিতে হয়। নির্গুণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত, নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না, কেন না, মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, কেন না, আমাদের সে শক্তি নাই।* মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নির্গুণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে

পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। "চতুষ্কোণ গোলক" বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু "চতুষ্কোণ গোলক" মানে ত কিছুই বুঝিলাম না। তাই হর্বর্ট স্পেন্‌সর এত কাল পরে নির্গুণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর ("Something higher than personality") তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও নির্গুণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে স্রষ্টা বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না। এমন ঝক্‌মারিতে কাজ কি?

যাঁহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে ঈশ্বর সগুণ হউন, কিন্তু নিরাকার। যিনি নিরাকার, তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে?

* "Our concption of the Deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge and therefore we cannot represent the Deity as he is, but as he appears to us."-Mansel, Metaphysics, p. 384

উত্তরে, জিজ্ঞাসা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার এ সীমানির্দেশ কর কেন? তবে কি তাঁহাকে সর্বশক্তিমান্ বলিতে চাও না? যিনি এই জড় জগৎকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে আকার গ্রহণ করিতে পারেন না কেন?

যাঁহারা এ আপত্তি না করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি সর্বশক্তিমান্, তাঁহার জগৎ-শাসনের জন্য, জগতের হিত জন্য, মনুষ্যকলেবর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ কুম্ভকর্ণ কি কংস শিশুপাল-বধের জন্য তাঁহাকে নিজে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, বালক হইয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার পর দীর্ঘ মনুষ্য-জীবনের অপার দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া, আহত বা কখন পরাজিত হইয়া, বহ্বায়াসে দুরাত্মাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

যাঁহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা আছে যে, এই মনুষ্য-জন্মের যে সকল দুঃখ-গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইরূপ। তাহাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি সুখদুঃখের অতীত,—তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয়, যেমন তাঁহার লীলা (Manifestation), এ সকল তেমনি তাঁহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্তমধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, যাঁহার কাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, তাঁহার কাছে মুহূর্তে ও মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি?

তবে এই যে অসুরবধ কথাটা আমরা বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের অবতার সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে বটে। কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্তশক্তিমান্, তাঁহার কাছে কংস শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুরাত্মাবিশেষের নিধন। আসল কথাটা, ভগবদ্গীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে :—

“পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ||”

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। “ধর্মসংরক্ষণ” কি কেবল দুই একটা দুরাত্মা বধ করিলেই হয়? ধর্ম কি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে?

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ধর্ম। এই ধর্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কর্মসাপেক্ষ।* অতএব কর্মই ধর্মের প্রধান উপায়। এই কর্মকে স্বধর্মপালন (Duty) বলা যায়।

* “মৃৎকৃত এই ধর্মের ব্যাখ্যা ধর্মতত্ত্বে দেখ।

মনুষ্য কতকটা নিজ রক্ষা ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য

ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তিশূন্য; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্মের প্রধান বিঘ্ন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম জানে না; কর্ম কিরূপে করিলে ধর্মে পরিণত হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?

এ কথা আমি গড়িয়া বলিতেছি না। ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তির তাৎপর্যও এই প্রকার।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতিপুরুষঃ || ১৯
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি || ২০।
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে || ২১।
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি || ২২।
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশ্ || ২৩।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ || ২৪। গীতা, ৩ অ।

"পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহা করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা মান্য করেন, তাহারা তাহারই অনুষ্ঠান অনুবর্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্মরক্ষার্থ কর্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনে আমার

কিছুই অপ্রাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্তব্যও নাই, তথাপি আমি কর্মানুষ্ঠান করিতেছি।* যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কর্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে, সমুদায় লোকে আমার অনুবর্তী হইবে, অতএব আমি কর্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব।”

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

* কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন।

সেশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সত্য, এবং তিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাও সত্য। কিন্তু তিনি গাড়ীর কোচমানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধরিয়া এই বিশ্বসংসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী হইয়া চলিতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে যথেষ্টও বটে। অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থান নাই প্রয়োজনও নাই। সুতরাং ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা।

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্তী হইয়া চলে, এ কথা মানি। সেইগুলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে যথেষ্ট, এ কথাও মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজন নাই, এ কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, যিনি সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। জাগতিক ব্যাপার আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে। ইহাই জগতের গতি এবং এই গতি জগৎকর্তার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের বর্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহা হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখনও জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি আছে। যদি তাই বাকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপণের বা কার্যের স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? সৃজন, রক্ষা, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসর্গিক কার্য আছে,—উন্নতি। মনুষ্যের উন্নতির মূল, ধর্মের উন্নতি। ধর্মের উন্নতিও ঐশিক নিয়মে সাধিত হইতে

পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়মফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব?

আপত্তিকারকেরা বলেন যে, নৈসর্গিক যে সকল নিয়ম, তাহা ঈশ্বরকৃত হইলেও তাহা অতিক্রমপূর্বক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য এ সকল অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (Miracle) মানিতে পারি না। ইহার ন্যায্যতা স্বীকার করি; তাহার কারণও পূর্বপরিচ্ছেদে নির্দিষ্ট করিয়াছি। আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক ঈশ্বরবতারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার অতিপ্রকৃতের সাহায্যেই স্বকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। খ্রীষ্ট অবতারের এরূপ অনেক কথা আছে। কিন্তু খ্রীষ্টের পক্ষসমর্থনের ভার খ্রীষ্টানদিগের উপরই থাকুক। আরও, বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কার্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন, বুদ্ধিমান্ পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য যে, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের, ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। গ্রন্থান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাস-মূলক। সেই উপান্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে, এই সকল অবতার পুরাণে কীর্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কৃষ্ণের যে বৃত্তান্তটুকু-মৌলিক, তাহার ভিতর অতিপ্রকৃতের কোন সহায়তা নাই। মহাভারত ও পুরাণসকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিষ্কর্মা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতিপ্রকৃতের সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলি মূল গ্রন্থের কোন অংশ নহে। আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং যাহা বলিতেছি, তাহা সপ্রমাণ করিব। দেখাইব যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কার্যের দ্বারা, বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা, কোন কার্য সম্পন্ন করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না।

আমরা যাহা বলিলাম, কেবল তাহা আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকার ঋষিদিগেরও সেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিম্বদন্তীর সত্যমিথ্যানির্বাচন-পদ্ধতি সে কালে ছিল না বলিয়া অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা পুরাণেতিহাসভুক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

মনুষ্যধর্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি ||
মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোহয়মুদ্যমবিস্তরঃ ||
তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্মস্তমনুবর্ততে।
কুর্বন্ বলবতা সন্ধিং হীনৈর্যুদ্ধং করোত্যসৌ ||
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচ্চিদেব পলায়নম্ ||
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ততঃ।
লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সৎপ্রবর্ততে|| —৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪-১৮

"জগৎপতি হইয়াও যে তিনি শত্রুদিগের প্রতি অনেক অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন, ইহা তিনি মনুষ্যধর্মশীল বলিয়া তাঁহার লীলা। নহিলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন, অরিক্ষয় জন্য তাঁহার বিস্তর উদ্যম কেন? তিনি মনুষ্যদিগের ধর্মের অনুবর্তী, এজন্য তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি এবং হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন সাম, দান, ভেদ প্রদর্শনপূর্বক দণ্ডপাত করেন কখনও পলায়নও করেন। মনুষ্যদেহীদিগের ক্রিয়ার অনুবর্তী সেই জগৎপতির এইরূপ লীলা তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছিল।"

আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস করিবেন না যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষশক্তির দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।* > অতএব বিচারের তৃতীয় নিয়ম সংস্থাপিত হইল।

বিচারের নিয়ম তিনটি পুনর্বার স্মরণ করাই :—

১। যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব।

২। যাহা অতিপ্রাকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব।

৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয়, বা অতিপ্রাকৃত নয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার

লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব।

* ‘It is true that in the Epic poems Rama and Krishna appear as incarnations of Vishnu, but they at the same time come before us as human heroes, and these two characters (the divine and the human) are so far from being inseparably blended together, that both of these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men-acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority. It is only in certain sections which have been added for the purpose of enforcing their divine character that they take the character of Vishnu. It is impossible to read either of these two poems with attention, without being reminded of the later interpolation of such sections as ascribe a divine character to the heroes, and of the unskillful manner in which these passages are often introduced and without observing how loosely they are connected with the rest of the narrative, and how unnecessary they are for its progress.” Lassen’s Indian Antiquities quoted by Muir.

“In other places (অর্থাৎ ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায় ভিন্ন) the divine nature of Krishna is less decidedly affirmed, in some it is disputed or denied; and in most of the situations he is exhibited in action, as a prince and warrior not as a divinity. He exercises no superhuman faculties in defence of himself, or his friends, or in the defeat and destruction of his foes. The Mahabharata, however, is the work of various periods, and requires to be read through carefully and critically, before its weight as an authority can be accurately appreciated.” Wilson, Preface to the Vishnu Purana.

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—পুরাণ

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তার পর পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

পুরাণ সম্বন্ধেও দুই রকম ভ্রম আছে,—দেশী ও বিলাতী। দেশী ভ্রম এই যে, সমস্ত পুরাণগুলিই এক ব্যক্তির রচনা। বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখানি পুরাণ এক ব্যক্তির রচনা। আগে দেশী কথাটার সমালোচনা করা যাউক।

অষ্টাদশ পুরাণ যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি;—

১ম,—এই ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই করিয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তির হাতের লেখা পাঁচ রকম হয় না, তেমনই এক ব্যক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় না। কিন্তু এই অষ্টাদশ পুরাণের রচনা আঠার রকম। কখনও তাহা এক ব্যক্তির রচনা নহে। যিনি বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ পাঠ করিয়া বলিবেন, দুইই এক ব্যক্তির রচনা হইতে পারে, তাঁহার নিকট কোন প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ বিড়ম্বনা মাত্র।

২য়,—এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে না। যে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে, সে এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে বর্ণিত বা বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থ লেখে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণচরিত্রই ইহার উদারহণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্রহ্মপুরাণের পূর্বভাগে আছে, আবার বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ুপুরাণে আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম ও ১১শ স্কন্ধে আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে, এবং পদ্ম ও বামনপুরাণে ও কূর্মপুরাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও বর্ণনা পুনঃ পুনঃ কথন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে আছে। এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরূপ ঘটনা অসম্ভব।

৩য়,—আর যদি এক ব্যক্তি এই অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা কিছু থাকে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মধ্যে, মধ্যে মধ্যে, এইরূপ গুরুতর বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণচরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল বর্ণনা পরস্পর সঙ্গত নহে।

৪র্থ—বিষ্ণুপুরাণে আছে;—

আখ্যা নৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ||
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ||
সুমতিশ্চাগ্নির্বচ্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোহথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্ ||
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
লোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা ||

বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ শ্লোক।

পুরাণার্থবিৎ (বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি দ্বারা পুরাণসংহিতা করিয়াছিলেন। লোমহর্ষণ নামে সূত বিখ্যাত ব্যাসশিষ্য ছিলেন। ব্যাস মহামুনি তাঁহাকে পুরাণসংহিতা দান করিলেন। সুমতি, অগ্নির্বচ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপয়ান, আকৃতব্রণ, সাবর্ণি—তাঁহার এই ছয় শিষ্য ছিল। (তাহার মধ্যে) কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন সেই লোমহর্ষণিকা মূল সংহিতা হইতে তিনখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন।

পুনশ্চ ভাগবতে আছে;—

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
শিংশপায়নহারীতৌ ষড়্বৈপৌরাণিকা ইমে ||
অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ।*
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্বাঃ সমধ্যগাম্ ||
কশ্যপোহহঞ্চ সাবর্ণী রামশিষ্যোহকৃতব্রণঃ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ ||

শ্রীমদ্ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ শ্লোক।

ত্রয্যারুণি, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত, এই ছয় পৌরাণিক। বায়ুপুরাণে নামগুলি কিছু ভিন্ন,—

আত্রেয়ঃ সুমতির্ধীমান্ কাশ্যপোহং কৃতব্রণঃ।

পুনশ্চ অগ্নিপুরাণে;—

প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
সুমতিশ্চাগ্নির্বচ্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংসপায়নঃ ||

কৃতব্রতোহথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্।
শাংসপায়নাদয়শ্চক্রুঃ পুরাণানাস্তু সংহিতাঃ ||

এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত নহে। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহা প্রচলিত আছে, তাহা কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বলা যাউক। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা মনে করেন যে, একও খানি পুরাণ একও ব্যক্তির লিখিত এই ভ্রমের বশীভূত হইয়া তাঁহারা বর্তমান পুরাণ সকলের প্রণয়নকাল নিরূপণ করিতে বসেন। বস্তুতঃ কোনও পুরাণান্তর্গত সকল বৃত্তান্তগুলি এক ব্যক্তির প্রণীত নহে। বর্তমান পুরাণ সকল সংগ্রহ মাত্র। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা। কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে।

* ভাগবতের বক্তা ব্যাসপুত্র শুকদেব। "বৈশম্পায়নহারীতৌ" ইতি পাঠান্তরও আছে।

"পুরাণ" অর্থে আদৌ পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই পুরাতন ঘটনা ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথব্রাহ্মণে, গোপথব্রাহ্মণে, আশ্বালায়ন সূত্রে, অথর্বসংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, মহাভারতে, রামায়ণে, মানবধর্মশাস্ত্রে সর্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্তু ঐ সকল কোনও গ্রন্থেই বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই। পাঠকের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যা অর্থাৎ লেখা পড়া প্রচলিত থাকিলেও গ্রন্থ সকল লিখিত হইত না; মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত। প্রাচীন পৌরাণিক কথা সকল ঐরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল কিম্বদন্তী মাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। পরে সময়বিশেষে ঐ সকল কিম্বদন্তী এবং প্রাচীন রচনা একত্রে সংগৃহীত হইয়া এক একখানি পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। বৈদিক সূক্ত সকল ঐরূপে সঙ্কলিত হইয়া ঋক্ যজুঃ সাম সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগজন্য 'ব্যাস' এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ব্যাস' তাঁহার উপাধিমাত্র—নাম নহে। তাঁহার নাম কৃষ্ণ এবং দ্বীপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিত। এ স্থানে পুরাণসঙ্কলনকর্তার বিষয়ে দুইটি মত

হইতে পারে। একটি মত এই যে, যিনি বেদবিভাগকর্তা, তিনিই যে পুরাণসঙ্কলনকর্তা ইহা না হইতে পারে, কিন্তু যিনি পুরাণসঙ্কলনকর্তা, তাঁহারও উপাধি ব্যাস হওয়া সম্ভব। বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যক্তি কর্তৃক অথবা এক সময়ে যে বিভক্ত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হওয়ার প্রমাণ ঐ সকল পুরাণের মধ্যেই আছে। তবে যিনিই কতকগুলি পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিভক্ত করিয়া একখানি সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামের অধিকারী। হইতে পারে যে, এই জন্যই কিম্বদন্তী আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসপ্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক ব্যক্তি নহেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, বেদান্তসূত্রকার ব্যাস, এমন কি—পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার একজন ব্যাস। এ সকলই এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারত মহামণ্ডলের অধিবেশন হইয়াছিল, সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে দুই জন ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এক জনের নাম হরেকৃষ্ণ ব্যাস, আর এক জনের নাম শ্রীযুক্ত অম্বিকা দত্ত ব্যাস। অনেক ব্যক্তি যে ব্যাস উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বেদবিভাগকর্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, এবং অষ্টাদশ পুরাণের সংগ্রহকর্তা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব বোধ হয়।

দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নই প্রাথমিক পুরাণসঙ্কলনকর্তা। তিনি যেমন বৈদিক সূক্তগুলি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু, ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপই বুঝায়। অতএব আমরা সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতেও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে বেদব্যাস একখানি পুরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে। সেখানি নাই। তাঁহার শিষ্যেরা তাহা ভাঙ্গিয়া তিনখানি পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নাই। কালক্রমে, নানা ব্যক্তির হাতে পড়িয়া তাহা আঠারখানি হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাউক, পুরাণবিশেষের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়া যাইতে পারে যে, কবে কোন্ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহারই ঠিকানা হয়। কিন্তু তাও হয় বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। কেন না, সকল গ্রন্থের রচনা বা সঙ্কলনের পর নূতন রচনা প্রক্ষিপ্ত হইতে

পারে ও পুরাণ সকলে তাহা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অতএব কোন্ অংশ ধরিয়া সঙ্কলনসময় নিরূপণ করিব? একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

মৎস্যপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক আছে;—

"রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্ ||
যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্তমুচ্যতে ||"

অর্থাৎ যে পুরাণে রথন্তর কল্পবৃত্তান্তাধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্ত কথা নারদকে সাবর্ণি বলিতেছেন এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মবরাহচরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসংযুক্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।

এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সাবর্ণি নারদকে বলিতেছেন না। নারায়ণ নামে অন্য ঋষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে রথন্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, এবং ব্রাহ্মবরাহচরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ড ও গণেশখণ্ড আছে। যাহার কোন প্রসঙ্গ দুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত নামে চলিত আছে, তাহা নূতন গ্রন্থ। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-সঙ্কলন-সময় নিরূপণ করা অপূর্ব রহস্য বলিয়াই বোধ হয়।

উইল্‌সন সাহেব পুরাণ সকলের এইরূপ প্রণয়নকাল নিরূপিত করিয়াছেন:—

ব্রহ্মপুরাণ	খ্রীষ্টীয়	ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দী।
পদ্মপুরাণ	,,	ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে।*
বিষ্ণুপুরাণ	,,	দশম শতাব্দী।
বায়ুপুরাণ		সময় নিরূপিত হয় নাই, প্রাচীন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।
ভাগবত পুরাণ	খ্রীষ্টীয়	ত্রয়োদশ শতাব্দী।
নারদপুরাণ	,,	ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ দুই শত বৎসরের গ্রন্থ।
মার্কণ্ডেয় পুরাণ	,,	নবম কি দশম শতাব্দী।
অগ্নিপুরাণ	,,	অনিশ্চিত; অতি অভিনব।
ভবিষ্যপুরাণ		ঠিক হয় নাই।

লিঙ্গপুরাণ	খ্রীষ্টীয়	অষ্টম কি নবম শতাব্দীর এদিক্ ওদিক্।
বরাহপুরাণ	,,	দ্বাদশ শতাব্দী।
স্কন্দপুরাণ		ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাঁচখানি পুরাণের সংগ্রহ।
বামনপুরাণ		৩।৪ শত বৎসরের গ্রন্থ্।
কূর্ম্মপুরাণ		প্রাচীন নহে।
মৎস্যপুরাণ		পদ্মপুরাণেরও পর।
গারুড় পুরাণ		
ব্রহ্মবৈববর্ত পুরাণ		প্রাচীন পুরাণ নাই। বর্তমান গ্রন্থ্ পুরাণ নয়।
ব্রাহ্মাণ্ড পুরাণ		

* তাহা হইলে, এই পুরাণ দুই তিন, কি চারি শত বৎসরের গ্রন্থ্।

পাঠক দেখিবেন, ইঁহার মতে (এই মতই প্রচলিত) কোনও পুরাণই সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়, বোধ হয়, ইংরাজি পড়িয়া যাঁহার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্যয় না ঘটিয়াছে, তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি এই সময়নির্ধারণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। দুই একটা কথার দ্বারাই ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং বিক্রমাদিত্য খ্রীঃ পূঃ ৫৬ বৎসরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভাও দাজি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোপীয়দিগের দেশী শিষ্যগণ সকলে উচ্চৈঃস্বরে সেই ডাক ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহ্য করি না। অতএব কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হউন। সকল পুরাণই তাঁহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই উইল্সন্ সাহেবের উপরিলিখিত বিচারে স্থির হইয়াছে। কিন্তু কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন—

"যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমালপ্স্যতে তে বর্হণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।" —১৫ nbsp; শ্লোক।

যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হইবে। ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা উজ্জ্বল বিষ্ণুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের উপমা হইতেছে। এখন, বিষ্ণুর গোপবেশ নাই, বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের গোপবেশ ছিল।

ইন্দ্রধনুর সঙ্গে উপমেয় কৃষ্ণচূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছ। আমি বিনীতভাবে ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায়দিগের নিকট নিবেদন করিতেছি, যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছচূড়ার কথা আসিল কোথা হইতে? এ কথা কি বেদে আছে, না মহাভারতে আছে, না রামায়ণে আছে?—কোথাও না। পুরাণ বা তদনুবর্তী গীতগোবিন্দাদি কাব্য ভিন্ন আর কোথাও নাই। আছে, হরিবংশে বটে; কিন্তু হরিবংশও ত উইল্‌সন্ সাহেবের মতে বিষ্ণুপুরাণেরও পরবর্তী। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, কালিদাসের পূর্বে অর্থাৎ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্বে হরিবংশ অথবা কোন বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল।

আর একটা কথা বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত, তাহা প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত না হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থ। কেন না, গীতগোবিন্দকার জয়দেব-গোস্বামী গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত। লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। ইহা বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত। আমরা পরে দেখাইব যে, এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ তখন চলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ লিখিত হইত না, এবং বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন প্রচলিত না থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" ইত্যাদি কখনও রচিত হইত না। অতএব এই ভ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্তও একাদশ শতাব্দীর পূর্বগামী। আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত না জানি আরও কত কালের। অথচ উইল্‌সন্ সাহেবের বিবেচনায় ইহা দুই শত মাত্র বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—পুরাণ

আঠারখানি পুরাণ মিলাইলে অনেক সময়ই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকগুলি শ্লোক কতকগুলি পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে। কোনখানে তাহাও নাই। এই গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বা হইবে। নন্দ মহাপদ্মের সময়-নিরূপণ জন্য যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এ কথার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর একটা গুরুতর উদাহরণ দিতেছি। ব্রহ্মপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ও বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রভেদ নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক। এই পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণের এই আটাশ অধ্যায়ে যতগুলি শ্লোক আছে, ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে, এবং ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে যে শ্লোকগুলি আছে, বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে। এই দুই পুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভেদ বা তারতম্য নাই। নিম্নলিখিত তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘটা সম্ভব।

১ম,—ব্রহ্মপুরাণ হইতে বিষ্ণুপুরাণ চুরি করিয়াছেন।

২য়,—বিষ্ণুপুরাণ হইতে ব্রহ্মপুরাণ চুরি করিয়াছেন।

৩য়,—কেহ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই; এই কৃষ্ণচরিতবর্ণনা সেই আদিম বৈয়াসিকী পুরাণসংহিতার অংশ। ব্রহ্ম ও বিষ্ণু উভয় পুরাণেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথম দুইটি কারণ যথার্থ কারণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এরূপ প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আটাশ অধ্যায় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্য কোনও স্থলেও এরূপ দেখাও যায় না। যে এরূপ চুরি করিবে, সে অন্ততঃ কিছু পরিবর্তন করিয়া লইতে পারে এবং রচনাও এমন কিছু নয় যে, তাহার কিছু পরিবর্তন হয় না। আর কেবল এই আটাশ অধ্যায় দুইখানি পুরাণে একরূপ দেখিলেও, না হয়, চুরির কথা মনে করা যাইত, কিন্তু বলিয়াছি যে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের অনেক শ্লোক পরস্পরের সহিত ঐক্যবিশিষ্ট। এবং অনেক ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আবার পুরাণে পুরাণে বিশেষ ঐক্য আছে। এ স্থলে, পূর্বকথিত একখানি আদিম পুরাণসংহিতার অস্তিত্বই প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

সেই আদিম সংহিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসরচিত না হইলেও হইতে পারে। তবে সে সংহিতা যে অতি প্রাচীন কালে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, আমরা পরে দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার অখণ্ডনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে সকল ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, পুরাণকার তাহা মহাভারত হইতে লইয়াছেন।

যদি আমরা বিলাতী ধরনে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নিরূপণ করিতে বসি, তাহ হইলে কিরূপ ফল পাই দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্বিংশাধ্যায়ে মগধ রাজাদিগের বংশাবলী কীর্তিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে যে সকল বংশাবলী কীর্তিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ বেদব্যাসের পিতা পরাশরের দ্বারা কলিকালের আরম্ভসময়ে কথিত হইয়াছিল বলিয়া পুরাণকার ভূমিকা করিতেছেন। সে সময়ে নন্দবংশীয়াদি আধুনিক রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত রাজগণের সমকাল বা পরকালবর্তী প্রক্ষেপকারকের ইচ্ছা যে, উক্ত রাজগণের নাম ইহাতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের নামের উল্লেখ করিতে গেলে, ভবিষ্যদ্বাণীর আবরণ রচনার উপর প্রক্ষিপ্ত না করিলে, পরাশরকথিত বলিয়া পাচার করা যায় না। অতএব সংগ্রহকার বা প্রক্ষেপকারক এই সকল রাজার কথা লিখিবার সময় বলিয়াছেন, অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তিনি যে সকল রাজদিগের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাঁহাদিগের রাজত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ, যবনগ্রন্থ, সংস্কৃতগ্রন্থ, প্রস্তরলিপি ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

যথা;— নন্দ, মহাপদ্ম, মৌর্য, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুষ্পমিত্র, পুলিমান্, শকরাজগণ, অন্ধ্ররাজগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে লেখা আছে,—"নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপুর্য্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।"* এই গুপ্তবংশীয়দিগের সময় Fleet সাহেবের কল্যাণে নিরূপিত হইয়াছে। এই বংশের প্রথম রাজাকে মহারাজগুপ্ত বলে। তার পর ঘটোৎকচ ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তার পর সমুদ্রগুপ্ত। ইঁহারা খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, বুদ্ধগুপ্ত—ইঁহারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। এই সকল গুপ্তগণ রাজা হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করিতেছেন, ইহা না জানিলে,

পুরাণসংগ্রহকার কখনই এরূপ লিখিতে পারিতেন না। অতএব ইনি গুপ্তদিগের সমকাল বা পরকালবর্তী। তাহা হইলে, এই পুরাণ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, এই গুপ্তরাজাদিগের নাম বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যান্য অংশ অন্যান্য সময়ে রচনা; সকলগুলিই কোনও অনির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়া বিষ্ণুপুরাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আজিকার দিনেও কি ইউরোপে, কি এদেশে, সচরাচর ঘটিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা একত্রিত হইয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং ঐ সংগ্রহের একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়। যথা, "Percy Reliques," অথবা রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ফলিত জ্যোতিষ।" আমার বিবেচনায় সকল পুরাণই এইরূপ সংগ্রহ। উপরি-উক্ত দুইখানি পুস্তকই আধুনিক সংগ্রহ; কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন। সংগ্রহ আধুনিক বলিয়া সেগুলি আধুনিক হইল না।

তবে এমন অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকিতে পারে যে সংগ্রহকার নিজে অনেক নূতন রচনা করিয়া সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন অথবা প্রাচীন বৃত্তান্ত নূতন কল্পনাসংযুক্ত এবং অত্যুক্তি অলঙ্কারে রঞ্জিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না, কিন্তু ভাগবত সম্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রকারে বক্তব্য।

প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোপদেব দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাসদ্। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অনেক হিন্দুই উহা বোপদেবের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবেরা বলেন, ভাগবতদ্বেষী শাক্তেরা এইরূপ প্রবাদ রটাইয়াছে।

বাস্তবিক ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা ঘটিয়াছে। শাক্তেরা বলেন, ইহা পুরাণই নহে,—বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত পুরাণ। তাঁহারা বলেন, "ভগবত ইদং ভাগবতং" এইরূপ অর্থ না করিয়া "ভাগবত্যা ইদং ভাগবতং" এই অর্থ করিবে।

কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা করে বলিয়া শ্রীধর স্বামী ইহার প্রথম শ্লোকের টীকাতে লিখিয়াছেন—"ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্"। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ইহা পুরাণ নহে—দেবীভাগবতই প্রকৃত পুরাণ, এরূপ আশঙ্কা শ্রীধর স্বামীর পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল; এবং তাহা লইয়া বিবাদও হইত। বিবাদকালে উভয় পক্ষে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নামগুলি বড় মার্জিত

রুচির পরিচায়ক। একখানির নাম "দুর্জনমুখচপেটিকা," তাহার উত্তরের নাম "দুর্জনমুখমহাচপেটিকা" এবং অন্য উত্তরের নাম "দুর্জনমুখপদ্মপাদুকা"। তার পর "ভাগবত-স্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশঃ" ইত্যাদি অন্যান্য পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আমি এই সকল পুস্তক দেখি নাই, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন এবং Bournouf সাহেব "চপেটিকা," "মহাচপেটিকা" এবং "পাদুকা"—র অনুবাদও করিয়াছেন। Wilson সাহেব তাঁহার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে ভূমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ লিখিয়াছেন। আমাদের সে সকল কথায় কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহার কৌতূহল থাকে, তিনি Wilson সাহেবের গ্রন্থ দেখিবেন। আমার মতের স্থূল মর্ম এই যে, ভাগবত পুরাণেও অনেক প্রাচীন কথা আছে। কিন্তু অনেক নূতন উপন্যাসও তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এবং প্রাচীন কথা যাহা আছে, তাহাও নানাপ্রকার অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অত্যুক্তি দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। এই পুরাণখানি অন্য অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা না হইলে ইহার পুরাণত্ব লইয়া এত বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন?

পুরাণের মধ্যে যে সকল পুরাণে কৃষ্ণচরিত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় আমাদিগের কোনও প্রয়োজন নাই। যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের কোনও প্রসঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত, এই চারিখানিতেই বিস্তারিত বৃত্তান্ত আছে। তাহার মধ্যে আবার ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণে একই কথা আছে। অতএব এই গ্রন্থে বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে না। এই তিন পুরাণ সম্বন্ধে যাহা আমাদিগের বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ সম্বন্ধে আরও কিছু সময়ান্তরে বলিব। এক্ষণে কেবল আমাদের হরিবংশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বাকি আছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—হরিবংশ

হরিবংশেই আছে যে, মহাভারত কথিত হইলে পর উগ্রশ্রবাঃ সৌতি শৌনকাদি ঋষির প্রার্থনানুসারে হরিবংশ কীর্তন করিতেছেন। অতএব উহা মহাভারতের পরবর্তী গ্রন্থ। কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহা নিরূপণ আবশ্যক। মহাভারতের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ শ্লোকে আছে, তাহা ২৯।৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্তর্গত বিষয় সকল ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যয়ে সংক্ষেপে যেরূপ কথিত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সেখানে সেরূপ কিছু কথিত হয় নাই। ঐ শ্লোক পাঠ করিয়া এমনই বোধ হয় যে, যখন প্রথম ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন হরিবংশের কোন প্রসঙ্গই ছিল না। পরিশেষে লক্ষ শ্লোক মিলাইবার জন্য কেহ ঐ শ্লোকটি যোজনা করিয়া দিয়াছেন। হরিবংশে এক্ষণে তিন পর্ব পাওয়া যায়;—হরিবংশপর্ব, বিষ্ণুপর্ব ও ভবিষ্যর্ব। কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত মহাভারতের শ্লোকে কেবল হরিবংশপর্ব ও ভবিষ্যপর্বের নাম আছে, বিষ্ণুপর্বের নাম মাত্র নাই, হরিবংশপর্বে ও ভবিষ্যপর্বে ১২,০০০ শ্লোক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে তিন পর্বে ১৬,০০০ শ্লোকের উপর পাওয়া যায়। অতএব নিশ্চিতই মহাভারতে ঐ শ্লোক প্রবিষ্ট হইবার পরে বিষ্ণুপর্ব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অষ্টাদশপর্ব মহাভারত অনুবাদ করিয়া হরিবংশের অনুবাদ সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাহার কারণ তিনি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—

"অষ্টাদশপর্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভূত একটী পর্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য পর্ব বা ঊনবিংশ পর্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটী পর্ব নহে। উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্বে হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ ফলশ্রুতিবর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অনুবাদিত করিলে

লোকের মনে পূর্বোক্ত ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইবে। আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।"

হরেস্ হেমন্ উইলসন্ সাহেবও হরিবংশের সম্বন্ধে ঐ কথা বলেন। তিনি বলেন;— "The internal evidence is strongly indicative of a date considerably subesquent to that of the major portion of the Mahabharata."*

আমারও সেইরূপ বিবেচনা হয়। আর হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অল্পকাল-পরবর্তী হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষ্ণুপর্ব তাহাতে অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ সকল কথার নিশ্চয়তা সম্পাদন অতি দুঃসাধ্য।

সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তায় হরিবংশের পুষ্করপ্রাদুর্ভাব নামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় বিচারে স্থির হইয়াছে, সুবন্ধু খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। অতএব তখনও হরিবংশ প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু কবে ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের পরবর্তী, এবং ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তের পূর্ববর্তী।

কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে সাহসী হই, সেটি অতি গুরুতর কথা, এবং এই কৃষ্ণচরিত্রবিচারের মূলসূত্র বলিলেও হয়। আমরা পরিপরিচ্ছেদে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

* Horace Hayman Wilson's Essays Analytical, Critical and Philosophical on subjects connected with Sanskrit Literature, Vol. I. Dr. Rcinhold Rost's Edition.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—ইতিহাসাদির পৌর্বাপর্য

উপনিষদে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন।* ইহা প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের স্থূলকথা। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা অনেক সন্ধানের পর, সেই অদ্বৈতবাদের নিকটে আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, জগতের সমস্তই আদৌ এক, ক্রমশঃ বহু হইয়াছে। ইহাই প্রসিদ্ধ Evolution বাদের স্থূলকথা। এক হইতে বহু বলিলে, কেবল সংখ্যায় বহু বুঝায় না—একাঙ্গিত্ব এবং বহ্বঙ্গিত্ব বুঝিতে হইবে। যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়। যাহা "Homogeneous" ছিল, তাহা পরিণতিতে "Heterogeneous" হয়। যাহা "Uniform" ছিল, তাহা "Multifarious" হয়। কেবল জড়জগৎ সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে। জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে সর্বত্র ইহা সত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাটে। উপন্যাস বা আখ্যান সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহা সত্য। এমন কি, বাজারের গল্প সম্বন্ধে ইহা সত্য। রাম যদি শ্যামকে বলে, "আমি কাল রাত্রে অন্ধকারে শুইয়াছিলাম, কি একটা শব্দ হইল, আমার বড় ভয় করিতে লাগিল," তবে নিশ্চয়ই শ্যাম যদুর কাছে গিয়া গল্প করিবে, "রামের ঘরে কাল রাত্রে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল।" তারপর ইহাই সম্ভব যে, যদু গিয়া মধুর কাছে গল্প করিবে যে, "কাল রাত্রে রাম ভূত দেখিয়াছিল," এবং মধুও নিধুর কাছে বলিবে যে, "রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে।" এবং পরিশেষে বাজারে রাষ্ট্র হইবে যে, ভূতে দৌরাত্ম্যে রাম সপরিবারে বড় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

এ গেল বাজারে গল্পের কথা। প্রাচীন উপাখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণতির একটা বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামকরণ,—যেমন বিষ্ ধাতু হইতে বিষ্ণু। দ্বিতীয়াবস্থায়, রূপক—যেমন বিষ্ণুর তিন পাদ, কেহ বলেন, সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্নস্থিতি, এবং অস্ত; কেহ বলেন, ঈশ্বরের ত্রিলোকব্যাপিতা, কেহ বলেন, ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তারপর তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাস—যেমন বলিবামনবৃত্তান্ত। চতুর্থাবস্থায় ইতিহাসের অতিরঞ্জন। পুরাণাদিতে তাহা দেখা যায়।

এ কথার উদাহরণান্তর স্বরূপ, আমরা উর্বশী-পুরুরবার উপাখ্যান লইতে পারি। ইহার প্রথমাবস্থা, যজুর্বেদসংহিতায়। তথায় উর্বশী, পুরুরবা, দুইখানি

অরণিকাষ্ঠমাত্র। বৈদিক কালে দিয়াশলাই ছিল না; চকমকি ছিল না; অন্ততঃ যজ্ঞাগ্নি জন্য এ সকল ব্যবহৃত হইত না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া যাজ্ঞিক অগ্নির উৎপাদন করিতে হইত। ইহাকে বলিত "অগ্নিচয়ন"। অগ্নিচয়নের মন্ত্র ছিল। যজুর্বেদসংহিতার (মাধ্যনন্দিনী শাখায়) পঞ্চম অধ্যায়ের ২ কণ্ডিকায় সেই মন্ত্র আছে। উহার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরণিকে, পঞ্চমে অপরখানিকে পূজা করিতে হয়। সেই দুই মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ এই:—

"হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম উর্বশী"। ৩।

(উৎপত্তির জন্য, কেবল স্ত্রী নহে, পুরুষও চাই। এজন্য উক্ত স্ত্রীকল্পিত অরণির উপর দ্বিতীয় অরণি স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে)

"হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে পুরুষরূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম পুরুরবা।" ৫। [#]

চতুর্থ মন্ত্রে অরণিস্পৃষ্ট আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আয়ু।

* সোহকাময়ত। বহুঃ স্যাং প্রজায়েষেতি।-তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২ বল্লী, ৬ অনুবাক্।

সত্যব্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ।

এই গেল প্রথমাবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার[&] ১০ মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে। এখানে উর্বশী পুরুরবা আর অরণিকাষ্ঠ নহে; ইহারা নায়ক নাহিকা। পুরুরবা উর্বশীর বিরহশঙ্কিত। এই রূপকাবস্থা। রূপকে উর্বশী (৫ম ঋকে) বলিতেছেন, "হে পুরুরবা, তুমি প্রতিদিন আমাকে তিন বার রমণ করিতে।" যজ্ঞের তিনটি অগ্নি ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে।[!] পুরুরবাকে উর্বশী "ইলাপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। ইলার শব্দের অর্থ পৃথিবী।[$] পৃথিবীরই পুত্র অরণিকাষ্ঠ।

মহাভারতের পুরুরবা ঐতিহাসিক চন্দ্রবংশীয় রাজা। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরুরবা। উর্বশীর গর্ভে ইহার পুত্র হয়; ইহার পুত্র হয়; তাহার নাম আয়ু।[*] যজুর্মন্ত্র যাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আয়ু সেই অরণিস্পৃষ্ট আজ্য। মহাভারতে এই আয়ুর পুত্র বিখ্যাত নহুষ। নুহুষের পুত্র বিখ্যাত যযাতি। যযাতির পুত্রের মধ্যে দুই জনের নাম যদু ও পুরু। যদু, যাদবদিগের আদিপুরুষ; পুরু, কুরুপাণ্ডবের আদিপুরুষ। এই তৃতীয়াবস্থা। তৃতীয়াবস্থায় অরণিকাষ্ঠ ঐতিহাসিক সম্রাট্।

চতুর্থ অবস্থা, বিষ্ণু, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে। পুরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস নূতন উপন্যাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার দুইটি নমুনা দিতেছি। একটি এই,—

উর্বশী ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরুরবাকে দেখিয়া মোহিত হওয়ায় নৃত্যের তালভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্রের অভিশাপের পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া পুরুরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন।

আর একটি এইরূপ:—

পূর্বকালে কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু ধর্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্যায় ভীত তাঁহার বিঘ্নার্থ কতিপয় অপ্সরার সহিত বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ করেন। সেই সকল অপ্সরা যখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গে অশক্তা হইল, তখন কামদেব অপ্সরাগণের উরু হইতে ইঁহাকে সৃজন করিলেন। ইনিই তাঁহার তপোভঙ্গে সমর্থা হন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইঁহার রূপে মোহিত হইয়া ইঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনিও সম্মতা হইলেন। পরে মিত্র ও বরুণ তাঁহাদিগকে ঐরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে তাঁহাদের শাপে ইনি মনুষ্যভোগ্যা (অর্থাৎ পুরুরবার পত্নী) হন।

এই সকল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যজুর্বেদসংহিতার ৫ অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার পর, ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত। তারপর মহাভারত। তারপর পদ্মাদি পুরাণ।

আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব তাহারও পৌর্বাপর্য এই নিয়মের অনুবর্তী হইয়া নির্ধারিত করা যাইতে পারে। দুই একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

& সাহেবেরা বলেন, ঋগ্বেদসংহিতা আর সকল সংহিতা হইতে প্রাচীন। ইহার অর্থ এমন নয় যে, ঋক্‌সংহিতার সকল সূক্তগুলি সাম ও যজুঃসংহিতার সকল মন্ত্র হইতে প্রাচীন। যদি এ অর্থে এ কথা কেহ বলিয়া থাকেন বা বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি অতিশয় ভ্রান্ত। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ঋক্‌সংহিতায় এমন কতকগুলি সূক্ত আছে যে, সেগুলি সকল বেদমন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। নচেৎ যে, ঋক্‌সংহিতায় এমন অনেক পাওয়া যায় যে, তাহা স্পষ্টতঃ আধুনিক বলিয়া

সাহেবেরাই স্বীকার করেন। অনেকগুলি ঋক্ সামবেদসংহিতাতেও আছে ঋগ্বেদসংহিতাতেও আছে। সংহিতা কেহ কাহারও অপেক্ষা প্রাচীন নহে, তবে কোন মন্ত্র অন্য মন্ত্রের অপেক্ষা প্রাচীন। এরূপ প্রাচীন মন্ত্র ঋক্সংহিতায় বেশী আছে কিন্তু ঋক্ সংহিতায় এমন অনেক মন্ত্রও আছে যে, তাহা যজুঃ সামের অনেক মন্ত্রের অপেক্ষা আধুনিক। দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত ইহার একটি উদাহরণ।
! মক্ষমূলর প্রভৃতি এই রূপকের অর্থ করেন, উর্বশী ঊষা, পুরুরবা সূর্য। Solar myth এই পণ্ডিতেরা কোন মতেই ছাড়িতে পারেন না। যজুর্মন্ত্র যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে এবং তিন বার সংসর্গের কথায় পাঠক বুঝিবেন যে, এই রূপকের প্রকৃত অর্থ উপরে লিখিত হইল।
$ সর্পমাংসাৎ পশু ব্যাড়ৌ গোভূবাচস্ত্বিড়া ইলা ইত্যমরঃ।
* কখন কখন এই নাম "আয়ু" লিখিত হইয়াছে।

প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পূতনাবধবৃত্তান্ত দেওয়া যাউক।

ইহার প্রথমাবস্থা কোন গ্রন্থে নাই, কেবল অভিধানেই আছে, যেমন বিষ্ ধাতু হইতে বিষ্ণু। পরে দেখি, পূতনা, যথার্থতঃ সূতিকাগারস্থ শিশুর রোগ। কিন্তু পূতনা শকুনিকেও বলে; অতএব মহাভারতে পূতনা শকুনি। বিষ্ণুপুরাণে আর এক সোপান উঠিল; রূপকে পরিণত হইল। পূতনা "বালঘাতিনী" অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায়; "অতিভীষণা"; তাহার কলেবর "মহৎ"; নন্দ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন। তথাপি এখনও সে মানবী।* হরিবংশে দুইটা কথাই মিলান হইল। পূতনা মানবী বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্তু সে কামরূপিণী পক্ষিণী হইয়া ব্রজে আসিল। রূপকত্ব আর নাই; এখন আখ্যান বা ইতিহাস; তৃতীয়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে ভাগবতে ইহার চূড়ান্ত হইল। পূতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও নহে। যে ঘোররূপা রাক্ষসী। তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পতিত হইয়াছিল, দাঁতগুলা এক একটা লাঙ্গল দণ্ডের মত, নাকের গর্ত গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন দুইটা গণ্ডশৈল অর্থাৎ ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকূপের তুল্য, পেটটা জলশূন্য হ্রদের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা পীড়া ক্রমশঃ এত বড় রাক্ষসীতে পরিণত হইল, দেখিয়া পাঠক আনন্দ লাভ করিবেন আমরা ভরসা করি, কিন্তু মনে রাখেন যে, ইহা চতুর্থ অবস্থা।

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত; তারপর বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ; তারপর হরিবংশ; তারপর ভাগবত।

আর একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। কাল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় করিলে কালিয় শব্দ পাওয়া যায়। কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষ্ণুপুরাণে কালিয়বৃত্তান্ত পাই। পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, ইহার কাল এং কালভয়নিবারণ কৃষ্ণপাদপদ্ম সম্বন্ধীয় একটি রূপক। সাপের একটি মাত্র ফণা থাকে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে "মধ্যম ফণার" কথা আছে। মধ্যম বলিলে তিনটি বুঝায়। বুঝিলাম যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাভিমুখী কালিয়ের তিনটি ফণা। কিন্তু হরিবংশকার রূপকের প্রকৃত তাৎপর্য নাই বুঝিতে পারুন, বা তাহাতে নূতন অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণা বাড়াইয়া দিলেন। ভাগবতকার তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন—একেবারে সহস্র ফণা করিয়া দিলেন।

এখন বলিতে পারি কি না যে, আগে মহাভারত, পরে বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ, পরে হরিবংশ, পরে ভাগবত।

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক উদাহরণ আপনি আসিয়া পড়িবে। স্থূল কথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসর্গিক, উপন্যাসভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক। এই নিয়মানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ সকলের পৌর্বাপর্য এইরূপ অবধারিত হয়।

প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর।

দ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ।

তৃতীয়। হরিবংশ।

চতুর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত।

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অমৌলিক বলিয়া অব্যবহার্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য, ঐ সকল অংশের কোথাও কোথাও সমালোচনা করিব। ব্রহ্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন না, বিষ্ণুপুরাণে যাহা আছে, ব্রহ্মপুরাণেও তাহা আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন না, মৌলিক ব্রহ্মবৈবর্ত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জন্য একবার ব্রহ্মবৈবর্ত ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য সে সকলের ব্যবহার নিষ্ফল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিৎ ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে—যথা স্যমন্তক মণি, সত্যভামা, ও জাম্ববতীবৃত্তান্ত।

পুরাণ সকলের প্রক্ষিপ্তবিচার দুর্ঘট। মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা হরিবংশে ও পুরাণে লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দুইটা[#] নিয়ম করিয়াছি যে, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা অনৈতিহাসিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিব; আর যাহা নৈসর্গিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব; এই দুইটি নিয়ম পুরাণ সম্বন্ধেও খাটিবে।

এক্ষণে আমরা কৃষ্ণচরিত্রকথনে প্রস্তুত।

* কোন অনুবাদকার অনুবাদে “রাক্ষসী” কথাটা বসাইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মূলে এমন কথা নাই।
# ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

দ্বিতীয় খণ্ড

বৃন্দাবন

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ—যদুবংশ

প্রথম খণ্ডে আমরা পুরুবার পুত্র আয়ুর কথা বলিয়াছি। আয়ু যজুর্বেদে যজ্ঞের ঘৃত মাত্র। কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে তিনি ঐতিহাসিক রাজা। ১০ম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তের ঋষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ইন্দ্র বলিতেছেন, "আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়া দিয়াছি।"

আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। এই নহুষ ও যযাতির নামও ঋগ্বেদসংহিতায় আছে। যযাতির পাঁচ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ যদু, কনিষ্ঠ পুরু। আর তিন জনের নাম তুর্বসু দ্রুহ্য, অণু। ইহার মধ্যে পুরু, যদু, এবং তুর্বসুর নাম ঋগ্বেদসংহিতায় আছে (১০ম, ৪৮।৪৯ সূক্ত)। কিন্তু ইঁহারা যে যযাতির পুত্র বা পরস্পরের ভাই, এমন কথা ঋগ্বেদসংহিতায় নাই।

কথিত আছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাঁহার আজ্ঞাপালন না করায় তিনি ঐ চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে দুষ্মন্ত, ভরত, কুরু এবং অজমীঢ় ইত্যাদি ভূপতিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি কৌরবেরা এই পুরুর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যদুর বংশ। অন্ততঃ পুরাণে ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র যদু হইতে মথুরাবাসী যাদবদিগের উৎপত্তি।

কিন্তু হরিবংশে আর এক কথা পাওয়া যায়। হরিবংশের হরিবংশপর্বে যে যদুবংশকথন আছে, তাহাতে যযাতিপুত্র যদুরই বংশকথন। কিন্তু বিষ্ণুপর্বে ভিন্ন প্রকার আছে। তথায় আছে যে, হর্যশ্ব নামে একজন ইক্ষ্বাকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। তিনি মধুবনাধিপতি মধুর কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মথুরা। হর্যশ্ব অযোধ্যা হইতে কোন কারণে বিদূরিত হইলে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া বাস করেন। ইঁহারই পুত্র যদু। হর্যশ্বের লোকান্তরে ইনি রাজা হয়েন। যদুর পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র সত্ত্বত, সত্ত্বতের পুত্র ভীম। মধুর পুত্র লবণকে রামের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন বিজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিয়া মথুরানগর নির্মাণ করেন। হরিবংশে বলে, রাঘবেরা মথুরা ত্যাগ করিয়া গেলে, ভীম তাহা পুনর্বার অধিকার করেন, এবং এই যদুসম্ভূত বংশই মথুরাবাসী যাদবগণ।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে যদু ও তুর্বা (তুর্বসু) এই দুই জনের নাম আছে (১০ ঋক্), কিন্তু তথায় ইঁহাদিগকে দাসজাতীয় রাজা বলা হইয়াছে।

কিন্তু ঐ মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, "তুর্বসু ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান্ বলিয়া খ্যাতাপন্ন করিয়াছি (৮ ঋক্)"। ঐ সূক্তের ৩ ঋকে আছে, "আমি দস্যুজাতিকে 'আর্য' এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি।"* তবে দাসজাতীয় রাজাকে যে তিনি খ্যাতাপন্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায়? এই যদু আর্য, না অনার্য? ইহা ঠিক বুঝা গেল না।

পুনশ্চ, প্রথম ৩৬ সূক্তে ১৮ ঋকের অর্থ এইরূপ—"অগ্নির দ্বারা তুর্বসু, যদু ও উগ্রদেবকে দূর হইতে আমরা আহ্বান করি।" অনার্য রাজ সম্বন্ধে আর্য ঋষির এরূপ উক্তি সম্ভব কি?

যাহা হউক তিন জন যদুর কথা পাই।

(১) যযাতিপুত্র

(২) ইক্ষ্বাকুবংশীয়।

(৩) অনার্য রাজা।

কৃষ্ণ, কোন্ যদুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মীমাংসা করা দুর্ঘট। যখন তাঁহাদের মথুরায় ভিন্ন পাই না, এবং ঐ মথুরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের নির্মিত, তখন এই যাদবেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় নহে, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না।

যে যদুবংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন, তদ্বংশে মধু সত্ত্বত বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃষ্ণি অন্ধক কুকুর ও ভোজবংশীয়েরা, একত্রে মথুরায় বাস করিতেন। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোজবংশীয়। কংস ও দেবকীর এক পিতামহ।

* এই কয়টি ঋকের অনুবাদ রমেশ বাবুর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

কৃষ্ণচরিত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের জন্ম

কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, দেবকীর স্বামী।

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস প্রীতিপূর্বক তাঁহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, ঐ দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে। তখন আপদের শেষ করিবার জন্য কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে শান্ত করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহাদের যতগুলি পুত্র হইবে, তিনি স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু কংস বসুদেব ও দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন। এবং তাঁহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ করিলেন। সপ্তমগর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরাণে কথিত হইয়াছে বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে যোগনিদ্রা সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া বসুদেবের অন্যা পত্নীর গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সেই অন্যা পত্নী রোহিণী। মথুরার অদূরে, ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর বাস। তিনি বসুদেবের আত্মীয়। রোহিণীকে বসুদেব সেই নন্দের গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে রোহিণী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্র, বলরাম।

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। এবং যথাকালে রাত্রে ভূমিষ্ঠ হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে সেই রাত্রেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাত্রে নন্দপত্নী যশোদা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি সেই বৈষ্ণবী শক্তি যোগনিদ্রা। ইনি যশোদাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন, ইত্যবসরে বসুদেব পুত্রটিকে সূতিকাগারে রাখিয়া কন্যাটিকে লইয়া স্বভবনে আসিলেন। সেই কন্যাকে তিনি কংসকে আপন কন্যা বলিয়া সমর্পণ করিলেন। কংস তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। যোগনিদ্রা আকাশপথে চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের নিধনকারী কোন স্থানে জন্মিয়াছেন। কংস তারপর ভগিনীকে কারামুক্ত করিলেন। কৃষ্ণ নন্দালয়ে রহিলেন।

এ সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার; আমরা পূর্বকৃত নিয়মানুসারে ত্যাগ করিতে বাধ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু ঐতিহাসিক তত্ত্বও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মথুরায় যদুবংশে, দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে

তাঁহাকে তাঁহার পিতা নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। নন্দালয়ে* পুত্রকে লুকাইয়া রাখার জন্য তাঁহাকে কংসনাশবিষয়িণী দৈববাণীর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত পুরাণে এবং মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তিতেই আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় দুরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঔরঙ্গজেবের মত আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া, আপনি রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। যাদবদিগের উপর এরূপ পীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল যে, অনেকে যাদব ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন। বসুদেবও আপনার অন্যা পত্নী রোহিণীকে ও তাঁহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়াছিলেন। এখন কৃষ্ণকেও কংসভয়ে সেই নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। ইহা সম্ভব এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

* কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে আমি কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাসের কথা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। এবং তাহার পোষকতায় মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সেই সকল কথা আমি পুনশ্চ উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত করিব। এক্ষণে আমার বক্তব্য যে, এক্ষণে পুনর্বার বিশেষ বিবেচনা করিয়া সে মত কিয়দংশে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে আমার আপত্তি নাই–ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির ভ্রান্তি সচরাচরই ঘটিয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শৈশব

কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসর্গিক কথা পুরাণে কথিত হইয়াছে। একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি।

১। পূতনাবধ। পূতনা কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান করিলেন যে, পূতনার প্রাণ বহির্গত হইল। সে তখন নিজ রূপ ধারণ করিয়া ছয় ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া নিপতিত হইল।

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে পূতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল, পূতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে, গৃধ্র, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায়। বলবান্ শিশুর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ করা বিচিত্র নহে।

কিন্তু পূতনার আর একটা অর্থ আছে। আমরা যাহাকে "পেঁচোয় পাওয়া" বলি, সূতিকাগারস্থ্ শিশুর সেই রোগের নাম পূতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত স্তন্যপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পূতনাবধ।

২। শকটবিপর্যয়। যশোদা, কৃষ্ণকে একখানা শকটের নীচে শুয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে শকট উল্টাইয়া পড়িয়াছিল। ঋগ্বেদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত ঊষার শকটভঞ্জনের একটা কথা আছে। এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন সংস্কারমাত্র হইতে পারে। অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলান্তর্গত হইয়াছে, এমন বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বম্ভরমূর্তিধারণ, এবং স্বীয় ব্যাদিতানন-মধ্যে যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখান। এটা প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেরই রচিত উপন্যাস বোধ হয়।

৪। তৃণাবর্ত। তৃণাবর্ত নামে অসুর কৃষ্ণকে একদা আকাশমার্গে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহার যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চক্রবায়ু মাত্র। চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়াই অসূর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই। সুতরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই। চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে।

৫। কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সে কথা অস্বীকার করায়, যশোদা তাঁহার মুখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হাঁ করিয়া বদনমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস।

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাঁটিয়া বেড়াইতে শিখিলে তিনি গোপীদিগের গৃহে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন। অন্যান্য দৌরাত্ম্যমধ্যে, ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। বিষ্ণুপুরাণেও এ কথা নাই; মহাভারতেও নাই।

হরিবংশে ননী মাখন চুরির কথা প্রসঙ্গক্রমে আছে। ভাগবতেই ইহার বাড়াবাড়ি। যে শিশুর ধর্মাধর্মজ্ঞান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাদ্য চুরি করিলে কোন দোষ হইল না। যদি বল যে, কৃষ্ণকে তোমরা ঈশ্বরাবতার বল; তাঁহার কোন বয়সেই জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে না। তাহার উত্তরে কৃষ্ণোপাসকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের চুরি নাই। জগতই যাঁহার—সব ঘৃত নবনীত মাখন যাঁহার সৃষ্ট—তিনি কার ধন লইয়া চোর হইলেন? সবই ত তাঁহার। আর যদি বল, তিনি মানবধর্মাবলম্বী-মানবধর্মে চুরি অবশ্য পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মানবধর্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই। কিন্তু এ সকল বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই—কেন না, কথাটাই অমূলক। যদি মৌলিক কথা হয়, তবে ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর।

ভাগবতকার বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান্ নিজের জন্য বড় চুরি করিতেন না; বানরদিগকে খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেন। ভাগবতার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্বভূতে সমদর্শী; গোপীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত খায়,—বানরেরা পায় না, এজন্য গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি সর্বভূতের ঈশ্বর, গোপী ও বানর তাঁহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী।

এই শিশু সর্বজনের জন্য সহৃদয়তাপরবশ, সর্বজনের দুঃখমোচনে উদ্যুক্ত। তির্যকজাতি বানরদিগের জন্য তাঁহার কাতরতার ভাগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর একটি দুঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে কৃষ্ণ অঞ্জলি ভরিয়া তাহাকে রত্ন দিলেন। কথাগুলির ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই; কিন্তু আমরা পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত।

৭। যমলার্জুনভঙ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় "দুরন্তপনা" করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদা তাঁহার পেটে দড়ি বাঁধিয়া, একটা উদূখলে বাঁধিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ উদূখল

টানিয়া লইয়া চলিলেন। যমলার্জুন নামে দুইটা গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া চলিলেন। উদূখল, গাছের মুলে বাধিয়া গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ দুইটা ভাঙ্গিয়া গেল।

এ কথা বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরস্কারবাক্য আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? অর্জুন বলে কুরচি গাছকে; যমলার্জুন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায়। যদি চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান্ শিশুর বলে ঐরূপ অবস্থায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ভাগবতকার পূর্বপ্রচলিত কথার উপর, অতিরঞ্জন চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। গাছ দুইটি কুবেরপুত্র; শাপনিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষ্ণস্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বধামে গমন করিল। কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার কালে গোকুলে যত দড়ি ছিল, সব যোড়া দিয়াও কচি ছেলের পেট বাঁধা গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়া করিয়া বাঁধা দিলেন।

বিষ্ণুর একটি নাম দামোদর। বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহকে দম বলে। উদ্ উপর, ঋ গমনে, এজন্য উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গতি। দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, তিনিই দামোদর। বেদে আছে, বিষ্ণু তপস্যা করিয়া বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ মাত্র। শঙ্করাচার্য দামোদর শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "দমাদিসাধনেন উদরা উৎকৃষ্টা গতির্যা তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ।" মহাভারতেও আছে, "দমাদ্দামোদরং বিদুঃ।"

কিন্তু দামন্ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায়। যাহার উদর গোরুর দড়িতে বাঁধা হইয়াছিল, সেও দামোদর। গোরুর দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামটা প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়া ভাগবতকার দড়ি বাঁধার উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ হয় না কি?

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পূর্ববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ নানাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা বৃন্দাবন গেলেন, এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে। বৃন্দাবন অধিকতর সুখের স্থান, এ জন্যও হইতে পারে। হরিবংশে পাওয়া যায়, এই সময় ঘোষনিবাসে বড় বৃকের ভয় হইয়াছিল। গোপেরা তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—কৈশোর লীলা

এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিৎপুষ্পশোভিত পুলিনশালিনী কলনাদিনী কালিন্দীকূলে কোকিল-ময়ূর-ধ্বনিত-কুঞ্জবনপরিপূর্ণা, গোপবালকগণের শৃঙ্গবেণুর মধুর রবে শব্দময়ী, অসংখ্যকুসুমামোদসুবাসিতা, নানাভরণভূষিতা, বিশালায়তলোচনা ব্রজসুন্দরীগণসমলঙ্কৃতা বৃন্দাবনস্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কাব্যরস আস্বাদন জন্য কালবিলম্ব করিবার আমাদের সময় নাই। আমরা আরও গুরুতর তত্ত্বের অন্বেষণে নিযুক্ত।

ভাগবতকার বলেন, বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অসূর বধ করিলেন,—(১) বৎসাসুর, (২) বকাসুর, (৩) অঘাসুর। প্রথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূপী, তৃতীয়টি সর্পরূপী। বলবান্ বালক, ঐ সকল জন্তু গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিরও কথা বিষ্ণুপুরাণে বা মহাভারতে, এমন কি, হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অমৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য।

এই বৎসাসুর, বকাসুর এবং অঘাসুরবধোপাখ্যান মধ্যে সেরূপ তত্ত্ব খুঁজিলে না পাওয়া যায়, এমত নহে। বদ্ ধাতু হইতে বৎস; বন্‌ক্ ধাতু হইতে বক, এবং অঘ্ ধাতু হইতে অঘ। বদ ধাতু প্রকাশে, বন্‌ক্ কৌটিল্যে, এবং অঘ্ পাপে। যাহারা প্রকাশ্যবাদী বা নিন্দক, তাহারা বৎস, কুটিল শত্রুপক্ষ বক, পাপীরা অঘ। কৃষ্ণ অপ্রাপ্তকৈশোরেই এই ত্রিবিধ শত্রু-পরাস্ত করিলেন। যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নমন্ত্রের ৮০ কণ্ডিকায় যে মন্ত্র, তাহাতে এইরূপ শত্রুদিগের নিপাতনের প্রার্থনা দেখা যায়। মন্ত্রটি এই;—

"হে অগ্নে! যাহারা আমাদের অরাতি, যাহারা দ্বেষী, যাহারা নিন্দক এবং যাহারা জিঘাংসু, এই চারি প্রকার শত্রুকেই ভস্মসাৎ কর।"*

এই মন্ত্রের বেশির ভাগ অরাতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না (ভাষায় জুয়াচোর), তাহাদের নিপাতেরও কথা আছে। কিন্তু ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই মন্ত্রটি যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, ঐ রূপকের মূল ঐ মন্ত্রে আছে।

তার পর ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা মায়ার দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট্ রাখাল ও গোবৎসের সৃষ্টি করিয়া পূর্ববৎ বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্য

এই যে, ব্রহ্মাও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম। তার পর একদিন, কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকণ্ঠের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্ণবচূড়ামণি তাঁহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন।

এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথা বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমাত্র মহাভারতে নাই। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই উপন্যাসমাত্র—অনৈসর্গিকতায় পরিপূর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে—রূপক। রূপকও অতি মনোহর।
* সামশ্রমীকৃত অনুবাদ।উপন্যাসটি এই। যমুনার এক হ্রদে বা আবর্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহার বহু ফণা। বিষ্ণুপুরাণের মতে তিনটি,# হরিবংশের মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহস্র। তাহার অনেক স্ত্রী পুত্র পৌত্র ছিল। তাহাদিগের বিষে সেই আবর্তের জল এমন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তজ্জন্য নিকটে কেহ তিষ্ঠিতে পারিত না। অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়া প্রাণ হারাইত। সেই বিষের জ্বালায়, তীরে কোন তৃণলতা বৃক্ষাদিও বাঁচিত না। পক্ষিগণও সেই আবর্তের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে বিষে জর্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিযা বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লম্ফনপূর্বক হ্রদমধ্যে নিপতিত হইলেন। কালিয় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ করিয়া বংশীধর গোপবালক নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গ সেই নৃত্যে নিপীড়িত হইয়া রুধিরবমনপূর্বক মুমূর্ষু হইল।

তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্ণকে মনুষ্যভাষায় স্তব করিতে লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভুজঙ্গমাঙ্গনাগণকে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদিগের মুখনির্গত স্তব বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপত্নীগণকে কেহ গরলোদ্গারিণী মনে করেন করুন, নাগপত্নীগণ সুধাবর্ষিণী বটে। শেষে কালিয় নিজেও কৃষ্ণস্তুতি আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া যমুনা পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। যমুনা প্রসন্নসলিলা হইলেন।

এই গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা এই। এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালস্রোতস্বতী। ইহার

অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালস্রোতের আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশত্রু সকল এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভুজঙ্গের ন্যায় অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধবিশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফণা। আর যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে, পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটি ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে, ইহার সহস্র ফণা। আমরা ঘোর বিপদাবর্তে এই ভুজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্তিবিকাশপূর্বক অভয়বংশী বাদন করেন, শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। করালনাদিনি কালতরঙ্গিণী প্রসন্নসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কালস্রোতস্বতীর আবর্তমধ্যে অমঙ্গলভুজঙ্গমের মস্তকারূঢ় এই অভয়বংশীধর মূর্তি, পুরাণকারের অপূর্ব সৃষ্টি! যে গড়িয়া পূজা করিবে কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে?

আমরা ধেনুকাসুর (গর্দভ) এবং প্রলম্বাসুরের বধবৃত্তান্ত কিছু বলিব না, কেন না, উহা বলরামকৃত—কৃষ্ণকৃত নহে। বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে বলিব, এখন কেবল গিরিযজ্ঞবৃত্তান্ত বলিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

"মধ্যমং ফণং" ইহাতে তিনটি বুঝায়।বৃন্দাবনে গোবর্ধন নামে এক পর্বত ছিল, এখনও আছে। গোঁসাই ঠাকুরেরা এক্ষণে যেখানে বৃন্দাবন স্থাপিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবর্ধন আর এক দেশে। কিন্তু পুরাণাদিতে পড়ি, উহা বৃন্দাবনের সীমান্তস্থিত। ঐ পর্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে উহা কোন কালে, কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অনেক সহস্র বৎসর ঐ ক্ষুদ্র পর্বত ঐ অবস্থাতেই আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ গিরি তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনর্বার সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

উপন্যাসটা এই। বর্ষান্তে নন্দাদি গোপগণ বৎসর বৎসর একটা ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন। তাহার আয়োজন হইতেছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন

ইহা হইতেছে? তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্য জন্মে, শস্য খাইয়া আমরা ও গোপগণ জীবনধারণ করি, এবং গোসকল দুগ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজা করা কর্তব্য। কৃষ্ণ বলিলেন, আমরা কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভীগণের পূজা, অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গিরির আশ্রিত, ইহার পূজা করুন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্তগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই হইল। অনেক দীনদরিদ্র ক্ষুধার্ত এবং ব্রাহ্মণগণ (তাঁহারা দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন করিলেন। গাভীগণ খুব খাইল। গোবর্ধনও মূর্তিমান্ হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মূর্তিমান্ গিরি সাজিয়া খাইয়াছিলেন।

ইন্দ্রযজ্ঞ হইল না। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমাদিগের পুরাণেতিহাসোক্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণ সকল ভারী বদ্‌রাগী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা দিলেন, বৃষ্টি করিয়া বৃন্দাবন ভাসাইয়া দাও। মেঘসকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন ভাসিয়া যায়। গোবৎস ও ব্রজবাসিগণের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন উপাড়িয়া বৃন্দাবনের উপর ধরিলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্বত এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া রাখিলেন। বৃন্দাবন রক্ষা পাইল। ইন্দ্র হার মানিয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ও সন্ধি স্থাপন করিলেন।

মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিরিযজ্ঞের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল বলিতেছে যে, কৃষ্ণ যে বল্মীকতুল্য গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই কি একটা বিচিত্র কথা? কৃষ্ণের প্রভূত অন্নব্যঞ্জনভোজন সম্বন্ধেও একটু ব্যঙ্গ আছে। এই পর্যন্ত। কিন্তু গোবর্ধন আজিও বিদ্যমান,—বল্মীক নয়, পর্বত বটে। কৃষ্ণ কি এই পর্বত সাত দিন এক হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন? যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ঈশ্বরের অসাধ্য কি? স্বীকার করি—কিন্তু সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করি, ঈশ্বরাবতারের পর্বতধারণের প্রয়োজন কি? যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত মেঘ এক ফোঁটাও বৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, সাত দিন পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে বৃন্দাবন রক্ষা করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি? যাঁহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদূরিত, বৃষ্টি উপশান্ত, এবং আকাশ নির্মল হইতে পারিত, তাঁহার পর্বত তুলিয়া ধরিয়া সাত দিন খাড়া থাকিবার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহা ভগবানের লীলা। ইচ্ছময়ের ইচ্ছা, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিব কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবান্,

তাহার পর গিরিধারণ তাঁহার ইচ্ছাবিস্তারিত লীলা বলিয়া স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবান্ ইহা বুঝিব কি প্রকারে? ইঁহার কার্য দেখিয়া। যে কার্যের অভিপ্রায় বা সুসঙ্গতি বুঝিতে পারিলাম না, সেই কার্যের কর্তা ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় কি? না বুঝিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় কি? যদি তাহা না যায়, তবে অনৈসর্গিক পরিত্যাগের যে নিয়ম আমরা সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অনুবর্তী হইয়া এই গিরিধারণবৃত্তান্তও উপন্যাসমধ্যে গণনা করাই বিধেয়। তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে বিরত করিয়া গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তার পর বাকি অনৈসর্গিক ব্যাপারটা গোবর্ধনের উৎখাত ও পুনঃস্থাপিত অবস্থা অনুসারে গঠিত হইয়াছে।

এরূপ কার্যের একটা নিগূঢ় তাৎপর্যও দেখা যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই বুঝাইতেছি।

এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক্ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্বকর্তা, সর্বত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি করেন,—বৃষ্টির জন্য একজন পৃথক্ বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না। তবে ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ বা সাধারণ যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপূজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্ত প্রকৃতি, তাঁহার গুণ ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপূজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্ত প্রকৃতি, তাঁহার গুণ সকল অনন্ত, কার্য অনন্ত, শক্তি সকলও সংখ্যায় অনন্ত। এরূপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহারা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করে। এরূপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাজ্বল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাই। তৎ-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান সুসাধ্য হয়। এই জন্য প্রাচীন আর্যগণ তাঁহার জগৎপ্রসবিতৃত্ব স্মরণ করিয়া সূর্যে, তাঁহার সর্বাবরকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাঁহার সর্বতেজের আধারভূতি স্মরণ করিয়া অগ্নিতে, তাঁহাকে জগৎপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে, এবং তদ্রূপে অন্যান্য জড়পদার্থে তাঁহার আরাধনা করিতেন।* ইন্দ্রে এইরূপ তাঁহার বর্ষণকারিণী শক্তির উপাসনা করিতেন। কালে, লোকে উপাসনার অর্থ ভুলিয়া গেল, কিন্তু উপাসনার আকারটা বলবান্ রহিল। কালে এইরূপই ঘটিয়া থাকে; ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে; ভগবদ্গীতায় এবং মহাভারতের অন্যত্র

দেখিব যে, কৃষ্ণ ধর্মের এই মৃতদেহের সৎকারে প্রবৃত্ত—তৎপরিবর্তে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে প্রবৃত্ত করিতে যত্নবান্। যাহা পরিণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিযজ্ঞে তাহার প্রবর্তনায় তাঁহার প্রথম উদ্যম। জগদীশ্বর সর্বভূতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, পর্বতে ও গোবৎসেও সেইরূপ আছেন। যদি মেঘের বা আকাশের পূজা করিলে তাঁহার পূজা করা হয়, তবে পর্বত বা গোগণের পূজা করিলেও তাঁহারই পূজা করা হইবে। বরং আকাশাদি জড়পদার্থের পূজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবৎসের সপরিতোষ ভোজন করান অধিকতর ধর্মানুমত। গিরিযজ্ঞের তাৎপর্যটা এইরূপ বুঝি।

* যখন আমি প্রথম "প্রচার" নামক পত্রে এই মত প্রকাশিত করি, তখন অনেকে কথা বলিয়াছিলেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, আমি একটা নূতন মত প্রচার করিতেছি। তাঁহারা জানেন না যে, এ আমার মত নহে, স্বয়ং নিরুক্তকার যাস্কের মত। আমি যাস্কের বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি-

"মাহাত্ম্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। * * আত্মা এব এষাং রথো ভবতি, আত্মা অশ্বাঃ, আয়ুধম্, আত্মা ইষবঃ, আত্মা সর্বদেবস্য।"

কৃষ্ণচরিত্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী-বিষ্ণুপুরাণ

কৃষ্ণদ্বেষীদিগের নিকট যে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্ণ-উপাসকদিগের নিকট যাহা কৃষ্ণভক্তির কেন্দ্রস্বরূপ, আমি এক্ষণে সেই তত্ত্বে উপস্থিত। কৃষ্ণের সহিত ব্রজ গোপীদের সম্বন্ধের কথা বলিতেছি। কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনায় এই তত্ত্ব অতিশয় গুরুতর। এই জন্য এ কথা আমরা অতিশয় বিস্তারের সহিত কহিতে বাধ্য হইব।

মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাপর্বে শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারত প্রণয়নকালে ব্রজগোপীগণঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধবৃত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না—তাহার পরে গঠিত হইয়াছে।

মহাভারতে কেবল ঐ সভাপর্বে দ্রৌপদীবস্ত্রহরণকালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দটা আছে, যথা—

> "আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
> গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়!||"

বৃন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধুর্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপগোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিকা, যুবতী বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। বৃদ্ধা এবং যমলার্জুনভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন করিত এরূপ লেখা আছে। অতএব এই 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।

আমরা পূর্বে যে নিয়ম করিয়াছি, তদনুসারে মহাভারতের পর বিষ্ণুপুরাণ দেখিতে হয়, এবং পূর্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনি দেখিব যে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম

কিঞ্চিত বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।

এই সকল কথা সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমরা বিষ্ণুপুরাণে যতটুকু গোপীদিগের কথা আছে, তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করিতেছি। দুই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে, এজন্য আমি মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাৎ তাহা অনুবাদিত করিলাম।

"কৃষ্ণস্তু বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাম্।
তথা কুমুদিনীং ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্ || ১৪ ||
বনরাজিং তথা কূজদ্ভৃঙ্গমালাং মনোরমাম্।
বিলোক্য সহ গোপীভির্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি || ১৫ ||
সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্।
জগৌ কলপদং শৌরির্নানাতন্ত্রী কৃত-ব্রতম্ || ১৬ ||

রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা।
আজগ্মুস্ত্বরিতা গোপ্যো যত্রাস্তে মধুসূদনঃ || ১৭ ||
শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগম্।
দত্তাবধানা কাচিত্তু তমেব মনসা স্মরন্ || ১৮ ||
কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্ত্বা লজ্জামুপাগতা।
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্শ্বমবিলজ্জিতা || ১৯ ||
কাচিদাবসথস্যান্তঃস্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গুরুন্।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা || ২০ ||
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা || ২১ ||
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা || ২২ ||
গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ || ২৩ ||
গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাস্বায়ত্তমূর্তয়ঃ।
অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুবৃন্দাবনান্তরম্ || ২৪ ||
কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।

কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্ || ২৫ ||
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্বস্বমাদদে || ২৬ ||
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্ধনো ময়া || ২৭ ||
ধেনুকোঽয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরন্তু যথেচ্ছয়া।
গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী || ২৮ ||
এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাস্তদা।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্চেরু রম্যং বৃন্দাবনং বনম্ || ২৯ ||
বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা।
পুলকাঞ্চিতসর্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা || ৩০ ||

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্ক-রেখাবন্ত্যালি! পশ্যত।
পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ || ৩১ ||
কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনূনি চ || ৩২ ||
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্।
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ || ৩৩ ||
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চিতো যয়া || ৩৪ ||
পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাস্য তাম্।
নন্দগোপসুতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত || ৩৫ ||
অনুযানেঽসমথান্যা নিতম্বভরমন্থরা।
যা গন্তব্যে দ্রুতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ || ৩৬ ||
হস্তন্যস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি।
অনায়ত্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ || ৩৭ ||
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্তেনৈষা বিমানিতা।
নৈরাশ্যমন্দগামিন্যা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্ || ৩৮ ||
নূনমুক্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেঽন্তিকম্।

তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ || ৩৯ ||
প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে।
নিবর্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরে || ৪০ ||
নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে।
যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্চরিতং তদা || ৪১ ||
ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি-মুখপঙ্কজম্।
গোপ্যস্ত্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্ট-চেষ্টিতম্ || ৪২ ||
কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমতিহর্ষিতা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ || ৪৩ ||
কাচিদ্‌ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্।
বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্ || ৪৪ ||

কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচনা।
তস্যৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূঢ়ের চাবভৌ || ৪৫ ||
ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্‌ভ্রূভঙ্গ-বীক্ষণৈঃ।
নিন্যেহনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ || ৪৬ ||
তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্।
ররাম রাসগোষ্ঠীভিরুদার-চরিতো হরিঃ || ৪৭ ||
রাসমণ্ডল-বন্ধোহপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুজ্‌ঝতা।
গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা || ৪৮ ||
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্।
চকার তৎকরস্পর্শনিমীলিতদৃশাং হরিঃ || ৪৯ ||
ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ।
অনুযাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরনুক্রমাৎ || ৫০ ||
কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ || ৫১ ||
পরিবর্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্।
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ || ৫২ ||
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।
গোপী গীতস্তুতিব্যাজ-নিপুণা মধুসূদনম্ || ৫৩ ||

গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ।
পুলকোদ্গামশস্যায় স্বেদাম্বু ঘনতাং গতৌ ‖ ৫৪ ‖
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতধ্বনিঃ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ ‖ ৫৫ ‖
গতে তু গমনং চক্রুর্বলনে সংমুখং যযুঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্ ‖ ৫৬ ‖
স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুসূদনঃ।
যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ‖ ৫৭ ‖
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ‖ ৫৮ ‖
সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ‖” ৫৯ ‖

বিষ্ণুপুরাণম্ পঞ্চমাংশ, ১৩

অঃ

“নির্মলাকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, ফুল্লকুমুদিনী, দিক্ সকল গন্ধামোদিত, ভৃঙ্গমালাশব্দে বনরাজি মনোরম দেখিয়া, কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে মানস করিলেন। বলরামের সহিত সৌরি অতীব মধুর স্ত্রীজনপ্রিয় নানাতন্ত্রীসম্মিলিত অস্ফুটপদ সঙ্গীত গান করিলেন। রম্য গীতধ্বনি শুনিয়া তখন গৃহপরিত্যাগপূর্বক যথা মধুসূদন আছেন, সেইখানে গোপীগণ ত্বরান্বিতা হইয়া আসিল। কোন গোপী তাঁহার লয়ানুগমনপূর্বক ধীরে ধীরে গায়িতে লাগিল। কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্মরণপূর্বক তাঁহাতে একমনা হইল। কেহ বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া লজ্জিতা হইল। কেহ বা লজ্জাহীনা ও প্রেমান্ধা হইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিল। কেহ বা গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে দেখিয়া নিমীলিতলোচনা হইয়া গোবিন্দকে তন্ময়ত্বের সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। অন্যা গোপকন্যা কৃষ্ণচিন্তাজনিত বিপুলাহ্লাদে ক্ষীণপুণ্যা হইয়া এবং কৃষ্ণকে অপ্রাপ্তিহেতু যে মহাদুঃখ, তদ্দ্বারা তাহার অশেষ পাতক বিলীন হইলে, পরব্রহ্মস্বরূপ জগৎকারণকে চিন্তা করিয়া পরোক্ষার্থ জ্ঞানহেতু মুক্তিলাভ করিল। গোবিন্দ শরচ্চন্দ্র মনোরম রাত্রিতে গোপীজন কর্তৃক পরিবৃত হইয়া রাসারম্ভরসে* সমুৎসুক হইলেন। কৃষ্ণ অন্যত্র চলিয়া গেলে গোপীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকারিণী হইয়া দলে দলে বৃন্দাবনমধ্যে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া হইয়া

পরস্পরকে এইরূপ বলিতে লাগিল, 'আমি কৃষ্ণ, এই ললিতগতিতে গমন করিতেছি, তোমরা আমার গমন অবলোকন কর।' অন্যা বলিল, 'আমি কৃষ্ণ, আমার গান শ্রবণ কর।' অপরা বলিল 'দুষ্ট কালিয়! এইখানে থাক, আমি কৃষ্ণ,' এবং বাহু আস্ফোটন-পূর্বক কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিল। আর কেহ বলিল, 'হে গোপগণ! তোমরা নির্ভয়ে এইখানে থাক, বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও না, আমি এইখানে গোবর্ধন ধরিয়া আছি।' অন্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী গোপী বলিল, 'এই ধেনুককে আমি নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ কর।' এইরূপে সেই সকল গোপী তৎকালে নানাপ্রকার কৃষ্ণচেষ্টানুবর্তিনী হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য বৃন্দাবন বনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক গোপবরাঙ্গনা গোপী ভূমি দেখিয়া সর্বাঙ্গ পুলকরোমাঞ্চিত হইয়া এবং নয়নোৎপল বিকশিত করিয়া বলিতে লাগিল, 'হে সখি! দেখ, এই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশরেখাবন্ত পদচিহ্নসকল লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের। কোন পুণ্যবতী মদালসা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্নগুলি! সেই মহাত্মার (কৃষ্ণের) পদচিহ্নের অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিত দামোদর এইখানে উচ্চ পুষ্পসকল অবচিত করিয়াছেন। তিনি কোনও গোপীকে এইখানে বসিয়া পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সে জন্মান্তরে সর্বাত্মা বিষ্ণুকে অর্চিত করিয়া থাকিবে। পুষ্পবন্ধনসম্মানে সে গর্বিতা হইয়া থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দগোপসুত এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ। আর এই পাদাগ্রচিহ্ন সকলের নিম্নতা দেখিয়া (বোধ হইতেছে) নিতম্বভারমন্থরা কেহ তাঁহার সঙ্গে গমনে অসমর্থা হইয়া গন্তব্যে দ্রুত গমনের চেষ্টা করিয়াছিল। হে সখি, আর এইখানে পদচিহ্ন সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই অনায়ত্তপদন্যাসা গোপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ পরেই সেই ধূর্তের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কেন না, এ পদচিহ্ন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সে নৈরাশ্যহেতু মন্দগামিনী হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হইয়াছিল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গিয়া আমি তোমার নিকট পুনর্বার আসিতেছি। সেই জন্য ইহার পদপদ্ধতি আবার ত্বরিত হইয়াছে। এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন বোধ হয়, কেন না, আর পদচিহ্ন দেখা যায় না। এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস ফিরিয়া যাই।"

* রাস অর্থে নৃত্যবিশেষ :-"অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদঃ রাসো" নাম ইতি শ্রীধরঃ।

"অনন্তর গোপীগণ দেখিল, বিকশিতমুখপঙ্কজ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্তা অক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণ আসিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কোন গোপী ললাটফলকে ভ্রূভঙ্গ করিয়া, হরিকে দেখিয়া, তাঁহারা মুখপঙ্কজ নেত্রভৃঙ্গদ্বয়ের দ্বারা পান করিতে লাগিল। কেহ গোবিন্দকে দেখিয়া নিমীলিত লোচনে যোগারূঢ়ার ন্যায় শোভিত হইয়া তাঁহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে বা প্রিয়ালাপের দ্বারা, কাহাকে বা ভ্রূভঙ্গবীক্ষণের দ্বারা কাহাকে বা করস্পর্শের দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন। পরে উদারচরিত হরি প্রসন্নচিত্তা গোপীদিগের সহিত সাদরে রাসমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণের পার্শ্ব ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, এজন্য সেই গোপীদিগের সহিত রাসমণ্ডলবন্ধও হইল না। পরে একে একে গোপীদিগকে হস্তের দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহারা তাঁহার করস্পর্শে নিমীলিতচক্ষু হইলে কৃষ্ণ রাসমণ্ডলী প্রস্তুত করিলেন। অতঃপর গোপীদিগের চঞ্চলবলয়শব্দিত এবং গোপীগণগীত শরৎকাব্যগানের দ্বারা অনুযাত রাসক্রীড়ায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্র ও কৌমুদী ও কুমুদ সম্বন্ধীয় গান করিলেন। গোপীগণ পুনঃ পুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোপী নর্তনজনিত শ্রমে শ্রান্ত হইয়া চঞ্চলবলয়ধ্বনিবিশিষ্ট বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে স্থাপিত করিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোপী কৃষ্ণগীতের স্তুতিচ্ছলে বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুসূদনকে চুম্বিত করিল। কৃষ্ণের ভুজদ্বয় কোন গোপীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত হইয়া পুলকোদ্গমরূপ শস্যোৎপাদনের জন্য স্বেদাম্বুমেঘত্ব প্রাপ্ত হইল। তরতর ধ্বনিতে কৃষ্ণ যাবৎকাল রাসগীত গায়িতে লাগিলেন, তাবৎকাল গোপীগণ 'সাধু কৃষ্ণ, সাধু কৃষ্ণ' বলিয়া দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্তন করিলে তাহারা সম্মুখে আসিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম অনুলোম গতির দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ হরিকে ভজনা করিল। মধুসূদন গোপীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন। তাহারা তাঁহাকে বিনা, ক্ষণমাত্রকে কোটি বৎসর মনে করিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পতির দ্বারা, পিতার দ্বারা, ভ্রাতার দ্বারা নিবারিত হইয়াও রাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিল। শত্রুধ্বংসকারী অমেয়াত্মা মধুসূদনও আপনাকে কিশোরবয়স্ক জানিয়া, রাত্রে তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন।"

এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য এই যে, “রম্”-ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের অর্থে আমি ক্রীড়ার্থে “রম” ধাতু বুঝিয়াছি; যথা, “রতিপ্রিয়া” অর্থে আমি ‘ক্রিড়ানুরাগিণী’ বুঝিয়াছি। আদৌ “রম্” ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহৃত। উহার যে অর্থান্তর আছে, তাহা ক্রীড়ার্থ হইতেই পশ্চাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ‘রতি’ ও ‘রতিপ্রিয়’ শব্দ এই অর্থে যে কৃষ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক হরিবংশের সপ্তষষ্টিতম পুস্তকান্তরে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় এইরূপ প্রয়োগ দেখিবেন।* তথায় ক্রীড়াশীল গোপালগণকে ‘রতিপ্রিয়’ গোপাল বলা হইয়াছে। আর এই অর্থই এখানে সঙ্গত, কেন না, ‘রাস’ একটি ক্রীড়াবিশেষ। অদ্যাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ঐরূপ ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ কি, তাহা শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন—

“অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদা রাসো নাম।”

অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকবালিকায় এরূপ নৃত্য করে আমরা দেখিয়াছি, এবং যাহারা বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে এরূপ নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই।

*“স তত্র বয়সা তুল্যৈর্বৎসপালৈঃ সহানঘঃ।
রেমে বৈ দিবসং কৃষ্ণঃ পুরা স্বর্গগতো যথা ||
তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্ণং ভাণ্ডীরবাসিনম্।
রময়ন্তি স্ম বহবো বন্যৈঃ ক্রীড়নকৈস্তদা ||
অন্যে স্ম পরিগায়ন্তি গোপামূদিতমানসাঃ।
গোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্যে গায়ন্তি স্ম রতিপ্রিয়া ||”

এই তিন শ্লোকে “রম্” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ তিন বার ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা “রেমে”, “রময়ন্তি”, “রতিপ্রিয়া”; তিন বারই ক্রীড়ার্থে, অর্থান্তর কোন মতেই ঘটান যায় না। কেন না, গোপালদিগের কথা হইতেছে।

'রাস' একটা খেলা, এবং 'রতি' শব্দে খেলা। অতএব রাসবর্ণনে 'রতি' শব্দ ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে তৎপ্রতিশব্দস্বরূপ 'ক্রীড়া' শব্দই ব্যবহার করিতে হয়।

এই রাসলীলাবৃত্তান্ত কিয়ৎপরিমাণে দুর্বোধ্য। ইহার ভিতরে যে গূঢ় তাৎপর্য আছে, তাহা আমি গ্রন্থাকারে পরিস্ফুট করিয়াছি। কিন্তু এখানে এ তত্ত্ব অসম্পূর্ণ রাখা অনুচিত, এজন্য যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনরুক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।

আমি "ধর্মতত্ত্ব" গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম। সেই মনুষ্যত্ব বা ধর্মের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্তিগুলিকে শারীরিক, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্যাদির পর্যালোচনা করিয়া আমরা নির্মল এবং অতুলনীয় আনন্দ অনুভূব করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্ অনুশীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা স্ফূর্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই রাসলীলায় কৃষ্ণ এবং গোপীগণকৃত সেই চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ।

কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগমাত্র, কিন্তু গোপীপক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক দিকে অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যবিকাশ, আর এক দিকে অনন্তসুন্দরের উপাসনা। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির চরম অনুশীলন সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, কথিত হইয়াছে, "পরানুরক্তিরীশ্বরে"। অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যই তাহাতে বর্তমান। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামলসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিতকুসুমসুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবন-বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে অনন্তসুন্দরের স্বশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে

লাগিল, এবং কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য, তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।

ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক যুবতী একত্র হইয়া নৃত্যগীত করা আমাদিগের আধুনিক সমাজে নিন্দনীয়। অন্যান্য সমাজে—যথা ইউরোপে—নিন্দোনীয় নহে। বোধ হয়, যখন বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল, এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কার্যটা নিন্দনীয়। সেই জন্যই তিনি লিখিয়া থাকিবেন যে,—

"তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা।"

এবং সেই জন্যই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দোষক্ষালন জন্য লিখিয়াছেন,—

"তদ্ভর্তৃষু তথা তাসু সর্ব্বভুতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোহসৌ রাপ্য বায়ুরিব স্থিতঃ ||
যথা সমস্তভূতেষু নভোহগ্নিঃ পৃথিবী জলম্।
বায়ুশ্চাত্মা তথৈবাসৌ বাপ্য সর্বমবস্থিতঃ ||"

তিনি তাহাদিগের ভর্তৃগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্বভূতেতে, ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপরূপে সকলেই বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন। যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং বায়ু, তেমনি তিনিই সর্বভূতে আছেন।

এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় ধর্মতঃ কোন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে, বোধ হয়, সে সামাজিক দোষও ছিল না।

কৃষ্ণচরিত্র

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী।

হরিবংশ

বিষ্ণুপুরাণ হইতে পূর্বপরিচ্ছেদে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পঞ্চম অংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে। ঐ অধ্যায় ব্যতীত ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণুপুরাণে আর কোথাও নাই। কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাঁহাদের খেদোক্তি আছে।

সেইরূপ হরিবংশেও ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণুপর্বের ৭৭ অধ্যায়, গ্রন্থান্তরে ৭৬ অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও নাই। যাহা আছে, সে সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু উদ্ধৃত করিবার আগে বক্তব্য সে, "রাস" শব্দ হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপরিবর্তে "হল্লীষ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম "হল্লীষক্রীড়নম্"। যথা "ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি হল্লীষক্রীড়নে সপ্তসপ্ততোহধ্যায়।" হেমচন্দ্রাভিধানে, "হল্লীষ" অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকন্তু তৎ।"

বাচস্পত্যে তারানাথ লিখিয়াছেন—

"স্ত্রীণাং মণ্ডলিকাকারনৃত্যে।"

অতএব 'হল্লীষ' এবং 'রাস' একই কথা—নৃত্যবিশেষ।

এক্ষণে হরিবংশের কথা তুলিতেছি।

[illegible] যৌবনং দৃষ্টা নিশি চন্দ্রমসো নবং।
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিম্প্রতি ||
স করীষাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্যবান।
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজয়ৎ ||
গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্ যোধয়ামাস বীর্যবান্।
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্বিভুঃ ||
যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ।
কৈশোরকং মানয়ন্ বৈ সহ তাভির্মুমোদ হ ||
তাস্তস্য বদনং কান্তং কান্তা গোপস্ত্রিয়ো নিশি।
পিবিন্তি নয়নাক্ষেপৈর্গাঙ্গতং শশিনং যথা ||
হরিতালার্দ্রপীতেন সকৌষেয়েন বাসসা।
বসানো ভদ্রবসনং কৃষ্ণঃ কান্ততরোহভবৎ ||

স বৃদ্ধাঙ্গদনির্যুহশ্চিত্রয়া বনমালয়া।
শোভামানো হি গোবিন্দঃ শোভয়ামাস তং ব্রজং ||

নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যাস্তদাহব্রুবন্।
বিচিত্রং চরিতং ঘোষে দৃষ্টা তত্তস্য ভাসতঃ ||
তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোভিঃ সমপীড়য়ন্।
ভ্রামিতাক্ষৈশ্চ বদনৈর্নিরৈক্ষন্ত বরাঙ্গনাঃ ||
তা বার্যৎমাণাঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভির্মাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ ||
তাস্ত পংক্তীকৃতাঃ সর্বা রময়ন্তি মনোরমং।
গায়ন্ত্য কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দ্বশো গোপকন্যকাঃ ||
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ।
কৃষ্ণস্য গতিগামিন্যস্তরুণ্যস্তা বরাঙ্গনাঃ ||
বনেষু তালহস্তাগ্রেঃ কুট্টয়ন্তস্তথাহপরাঃ।
চেরুর্বৈ চরিতং তস্য কৃষ্ণস্য ব্রজযোষিতঃ ||
তাস্তস্য নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসস্মিতবীক্ষত্ম।
মুদিতাশ্চানুকুর্বন্ত্যঃ ক্রীড়ন্ত্যো ব্রজযোষিতঃ ||
ভাবনিস্যন্দমধুরং গায়ন্ত্যস্তা বরাঙ্গনাঃ।
ব্রজং গতাঃ সুখং চেরুর্দামোদরপরায়ণাঃ ||
করীষপাংশুদিগ্ধাঙ্গাস্তাঃ কৃষ্ণমনুবব্রিরে।
রময়ন্ত্যো যথা নাগং সম্প্রমত্তং করেণবঃ ||
তমন্যা ভাববিকচৈর্নৈত্রৈঃ প্রহসিতাননাঃ।
পিবন্ত্যতৃপ্তা বনিতাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃগেক্ষণাঃ ||
মুখমস্যাব্জসঙ্কাশং তৃষিতা গোপকন্যকাঃ।
রত্যন্তরগতা রাত্রৌ পিবন্তি রতিলালসাঃ ||
হাহেতি কুর্বতস্তস্য প্রহৃষ্টাস্তা বরাঙ্গনাঃ।
জগৃহুর্নিঃসৃতাং বাণীং সাম্না দামোদরেরিতাং ||
তাসাং গ্রথিতসীমন্তা রতিশ্রান্ত্যাকুলীকৃতাঃ।
চারু বিস্রংসিরে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোষিতাম্ ||
এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ।

শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী ||”

—হরিবংশে, ৭৭, অধ্যায়

“কৃষ্ণ রাত্রে চন্দ্রমার নবযৌবন (বিকাশ) দেখিয়া এবং রম্যা শারদীয়া নিশা দেখিয়া ক্রীড়াভিলাষী হইলেন। কখনও ব্রজের শুষ্কগোময়াকীর্ণ রাজপথে জাতদর্প বৃষগণকে বীর্যবান্ কৃষ্ণ যুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বলদৃপ্ত গোপালগণকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং কুম্ভীরের ন্যায় গোগণকে বনমধ্যে গ্রহণ করিতেন। কালজ্ঞ কৃষ্ণ আপনার কিশোর বয়সের সম্মানার্থ যুবতী গোপকন্যাগণের জন্য কাল নির্ণীত করিয়া রাত্রে তাহাদিগের সহিত আনন্দানুভাব করিলেন। সেই গোপসুন্দরীগণ নয়নাক্ষেপ দ্বারা ধরাগত চন্দ্রের মত তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল পান করিল। সুবসন কৃষ্ণ, হরিতালার্দ্র পীত কৌষেয় বসন পরিহিত হইয়া কান্ততর হইলেন। অঙ্গদসমূহ ধারণপূর্বক বিচিত্র বনমালা দ্বারা শোভিত হইয়া গোবিন্দ সেই ব্রজ শোভিত করিতে লাগিলেন। সেই বাক্যালাপী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া ঘোষমধ্যে গোপকন্যাগণ তখন তাঁহাকে দামোদর বলিত; পয়োধরস্থিতিহেতু ঊর্দ্ধমুখ হৃদয়ের দ্বারা নিপীড়িত করিয়া সেই বরাঙ্গনাগণ ভ্রামিত-চক্ষু বদনের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পিতা, ভ্রাতা ও মাতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে কৃষ্ণের নিকটে গমন করিল। তাহারা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়া করিল; এবং যুগ্মে যুগ্মে কৃষ্ণচরিত গান করিল। বরাঙ্গনা তরুণীগণ কৃষ্ণলীলানুকারিণী, কৃষ্ণে প্রণিহিতলোচনা; এবং কৃষ্ণের গমনানুগামিনী হইল। কোন কোন ব্রজবালা হস্তাগ্রে তালকুট্টনপূর্বক কৃষ্ণচরিত আচরিত করিতে লাগিল। ব্রজযোষিদ্‌গণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বিলাসস্মিতবীক্ষণ অনুকরণপূর্বক, সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কৃষ্ণপরায়ণা বরাঙ্গনাগণ ভাবনিস্যন্দমধুর গান করতঃ ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। সম্প্রমত্ত হস্তীকে করেণুগণ যেরূপ ক্রীড়া করায়, শুষ্ক গোময় দ্বারা দিগ্ধাঙ্গ সেই গোপীগণ সেইরূপ কৃষ্ণের অনুবর্তন করিল। সহাস্যবদনা কৃষ্ণমৃগলোচনা অন্য বনিতাগণ ভাবোৎফুল্ল লোচনের দ্বারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান করিতে লাগিল। ক্রীড়ালালসাতৃষিতা গোপকন্যাগণ রাত্রিতে অনন্যক্রীড়াসক্ত হইয়া অব্জসঙ্কাশ কৃষ্ণমুখমণ্ডল পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণা হা হা ইতি শব্দ করিয়া গান করিলে কৃষ্ণমুখনিঃসৃত সেই বাক্য, বরাঙ্গনাগণ আহ্লাদিত হইয়া গ্রহণ করিল। সেই গোপযোষিদ্গণের ক্রীড়াশ্রান্তিপ্রযুক্ত আকুলীকৃত সীমন্তগ্রথিত কেশদাম কুচাগ্রে

বিস্রস্ত হইতে লাগিল। চক্রবালালঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সচন্দ্রা শারদী নিশাতে সুখে গোপীদিগের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন।”

বিষ্ণুপুরাণ হইতে রাসলীলাতত্ত্ব অনুবাদ কালে ‘রম্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ সকলের যেরূপ ক্রীড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি; এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে ঐ সকল শব্দের ক্রীড়ার্থ প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অন্য কোনরূপ প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা—

“তাস্তু পংক্তীকৃতাঃ সর্বা রময়ন্তি মনোরমম্।”

এখানে ক্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যর্থে ‘রময়ন্তি’ শব্দ কোন রকমেই বুঝা যায় না। যাঁহার অনুরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্বপ্রচলিত কুসংস্কারবশতঃই করিয়াছেন।

এই হল্লীষক্রীড়াবর্ণনা বিষ্ণুপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী। এমন কি, এক একটি শ্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই। যথা, বিষ্ণুপুরাণে আধে —

“তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা।

কৃষ্ণং গোপাঙ্গানা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ ||”

হরিবংশে আছে–

“তা বার্যমাণাঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভির্মাতৃভিস্তথা।

কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়া ||”

তবে বিষ্ণুপুরাণের অপেক্ষা হরিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য বিষয়ে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণে যাহা সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহা বিস্তৃত এবং নানা প্রকার নূতন উপন্যাস ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। হরিবংশে রাসলীলার এইরূপ সংক্ষেপ বর্ণনার একটু কারণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, কবিত্বে, গাম্ভীর্যে, পাণ্ডিত্যে এবং ঔদার্যে হরিবংশকার বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষা অনেক লঘু। তিনি বিষ্ণুপুরাণের রাসবর্ণনার নিগূঢ় তাৎপর্য এবং গোপীগণকৃত ভক্তিযোগ দ্বারা কৃষ্ণে একাত্মতা প্রাপ্তি বুঝিতে পারেন নাই। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই সেখানে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন,—

“কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।”

সেখানে হরিবংশকার লিখিয়া বসিয়াছেন,

“তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোভিঃ সমপীড়য়ন্।” ইত্যাদি

প্রভেদটুকু এই যে, বিষ্ণুপুরাণের চপলা বালিকা আনন্দে চঞ্চলা, আর হরিবংশের এই গোপীগণ বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করিতেছে। হরিবংশকারের অনেক স্থলে বিলাসপ্রিয়তার মাত্রাধিক্য দেখা যায়।

আর আর কথা বিষ্ণুপুরাণে রাসলীলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, হরিবংশের এই হল্লীষক্রীড়া সম্বন্ধেও বর্তে।

উপরিলিখিত শ্লোকগুলি ভিন্ন হরিবংশে ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—ব্রজ গোপী-ভাগবত

বস্ত্রহরণ

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। ভাগবতকার গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাহা আধুনিক রুচির বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই সকল বর্ণনার বাহ্যদৃশ্য এখনকার রুচিবিগর্হিত হইলেও অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে। হরিবংশকারের ন্যায় ভাগবতকার বিলাস-প্রিয়তা-দোষে দূষিত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগূঢ় এবং অতিশয় বিশুদ্ধ।

দশম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীদিগের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্ণানুরাগ ব্যক্ত করিতেছে। সেই পূর্ব্বানুরাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেই উপন্যাস "বস্ত্রহরণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্ত্রহরণের কোন কথা মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে বা হরিবংশে নাই, সুতরাং উহা ভাগবতকারের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বৃত্তান্তটা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কেন না, ভাগবতব্যাখ্যাত রাসলীলাকথনে আমরা প্রবৃত্ত, এবং সেই রাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ।

কৃষ্ণানুরাগবিবশা ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত করিল। ব্রতের নিয়ম এক মাস। এই এক মাস তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রত্যূষে যমুনাসলিলে অবগাহন করিত। স্ত্রীলোকদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা কুৎসিত প্রথা এ কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেরা অবগাহনকালে নদীতীরে বস্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া, বিবস্ত্রা হইয়া জলমগ্না হয়। সেই প্রথানুসারে এই ব্রজাঙ্গনাগণ কূলে বসন রক্ষা করিয়া বিবস্ত্রা হইয়া অবগাহন করিত। মাসান্তে যে দিন ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা ঐরূপ করিল। তাহাদের কর্ম্মফল (উভয়ার্থে) দিবার জন্য সেই দিন শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

গোপীগণ বড় বিপন্না হইল। তাহারা বিনাবস্ত্রে উঠিতে পারে না; এ দিকে প্রাতঃসমীরণে জলমধ্যে শীতে প্রাণ যায়। তাহারা কণ্ঠ পর্যন্ত নিমগ্ন হইয়া, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, কৃষ্ণের নিকট বস্ত্রভিক্ষা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সহজে বস্ত্র দেন না—গোপীদিগের "কর্মফল" দিবার ইচ্ছা আছে। তার পর যাহা ঘটিল, তাহা আমরা স্ত্রীলোক বালক প্রভৃতির বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না। অতএব মূল সংস্কৃতই বিনানুবাদে উদ্ধৃত করিলাম।

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে বলিতে লাগিল;—

মহিনয়ং ভো কৃথাস্ত্বান্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোহঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ||
শ্যামসুন্দর তে দাস্য করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে ||

শ্রীভগবানুবাচ।

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ।
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি ||

ততো জলাশয়ায়ৎ সর্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং * * আচ্ছাদ্য প্রোক্তেরুঃ শীতকর্ষিতাঃ ||
ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্ ||
যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূদ্ধর্ণ্যপনুত্তয়েহংহসঃ কৃত্বা নমো* বসনং প্রগৃহ্যতাম্ ||
ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজবালা নত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্।
তৎপূর্তিকামাস্তদশেষকর্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ ||
তাস্তথাবনতা দৃষ্টা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ||

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ম স্কন্দঃ, ২২ অধ্যায়।

অন্তর্নির্হিত ভক্তিতত্ত্বটা এই। ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে সর্বার্পণ। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ||"

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্বার্পণ করিল। স্ত্রীলোক, যখন সকল পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না। ধন ধর্ম কর্ম ভাগ্য—সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের লজ্জা যায় না। লজ্জা স্ত্রীলোকের শেষ রত্ন। যে স্ত্রীলোক, অপরের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিল, সে তাহাকে সব দিল। এই স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জাও অর্পিত করিল। এ কামাতুরার লজ্জার্পণ নহে—লজ্জাবিবশার লজ্জার্পণ। অতএব তাহারা ঈশ্বরে সর্বস্বার্পণ করিল। কৃষ্ণও তাহা ভক্ত্যুপহার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাতে যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামনা কামার্থে কল্পিত হয় না। যব ভর্জিত এবং ক্বাথিত হইলে, বীজত্বে সমর্থ হয় না।" অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণকামিনী, তাহাদিগের কামাবশেষ হয়। আরও বলিলেন, "তোমরা যে জন্য ব্রত করিয়াছ, আমি তাহা রাত্রে সিদ্ধ করিব।"

এখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিস্বরূপ পাইবার জন্যই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ, তাহাদের কামনাপূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন। কাজেই বড় নৈতিক গোলযোগ উপস্থিত। এই গোপাঙ্গনাগণ পরপত্নী, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করায়, পরদারাভিমর্ষণ স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ পাপারোপণ কেন?

ইহার উত্তর আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়াছি যে, এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই। কিন্তু পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পরিক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শুকমুখে একটা উত্তর দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথা বলিব। কিন্তু আমাকেও এখানে বলিতে হইবে যে, হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদানুসারে, কৃষ্ণকে এই গোপীগণপতিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

"যে, যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, "আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।" অর্থাৎ যে আমার নিকট বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই। বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবমাতা

অদিতি কৃষ্ণ(বিষ্ণু)কে বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে তোমাকে পুত্রভাবেই পাইয়াছি। এই ভাগবতেই আছে যে, বসুদেব দেবকী জগদীশ্বরকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে পুত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোপীগণ তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত সাধনা করিয়াছিল বলিয়া কৃষ্ণকে তাহারা পতিভাবে পাইল।

যদি তাই হইল, তবে তাহাদের অধর্ম কি? ঈশ্বর প্রাপ্তিতে অধর্ম আবার কি? পাপের দ্বারা, পুণ্যময়, পুণ্যের আদিভূত স্বরূপ জগদীশ্বরকে কি পাওয়া যায়? পাপ-পুণ্য কি? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সন্নিধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পুণ্য—তাহাই ধর্ম, তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ—তাহাই অধর্ম।

পুরাণকার এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই। তিনি ২৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃষ্ণকে কামনা না করিয়া উপপতিভাবে তাঁহাকে কামনা করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে সশরীরে পাইল না; তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে আসিতে দিল না; কৃষ্ণচিন্তা করিয়া তাহারা প্রাণত্যাগ করিল।

"তমেব পরমাত্মানাং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনা : ||" ১০।২৯।১০

কৃষ্ণপতি ভিন্ন অন্য পতি যাহাদের স্মরণ মাত্রে ছিল, কাজেই তাহারা কৃষ্ণকে উপপতি ভাবিল। কিন্তু অন্য পতি স্মৃতিমাত্রে থাকায়, তাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনন্যচিন্তা হইতে পারিল না। তাহারা সিদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারিণী হইল না। যতক্ষণ জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ পাপবুদ্ধি থাকিবে, কেন না, জারানুগমন পাপ। যতক্ষণ জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে না—কেন না, ঈশ্বরে জারজ্ঞান হয় না—ততক্ষণ কৃষ্ণকামনা, কামকামনা মাত্র। ঈদৃশী গোপী কৃষ্ণপরায়ণা হইলেও সশরীরে কৃষ্ণকে পাইতে অযোগ্যা।

অতএব এই পতিভাবে জগদীশ্বরকে পাইবার কামনায় গোপীদিগের পাপমাত্র রহিল না। গোপীদিগের রহিল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষ্ণুপুরাণকার যাহা বলিয়াছেন, ভাগবতকারও তাহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের আবার পাপপূণ্য কি? তিনি আমাদের মত শরীরী নহেন, শরীরী ভিন্ন ইন্দ্রিয়পরতা বা তজ্জনিত দোষ ঘটে না। তিনি সর্বভূতে আছেন, গোপীগণেও আছেন, গোপীগণের স্বামীতেও আছেন। তাঁহার কর্তৃক পরদারাভিমর্ষণ সম্ভবে না।

এ কথায় আমাদের একটা আপত্তি আছে। ঈশ্বর এখানে শরীরী, এবং ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। যখন ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে মানবশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানবধর্মাবলম্বী হইয়া কার্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধর্মীর পক্ষে গোপবধূগণ পরস্ত্রী, এবং তদভিগমন পরদারপাপ। কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কর্ম করিয়া থাকেন। লোকশিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব পুরাণকারকৃত দোষক্ষালন খাটে না। এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজনও নাই। ভাগবতকার নিজেই কৃষ্ণকে এই রাসমণ্ডলমধ্যে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ||

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ স্ক, ৩৩ অঃ, ২৬

তবে, বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষাও ভাগবতকার প্রগাঢ়তায় এবং ভক্তিতত্ত্বের পারদর্শিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ। স্ত্রীজাতী, জগতের মধ্যে পতিকেই প্রিয়বস্তু বলিয়া জানে; যে স্ত্রী, জগদীশ্বরে পরমভক্তিমতী, সে সেই পতিভাবেই তাঁহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল—ইংরেজি পড়িয়া আমরা যাই বলি—কথাটা অতি রমণীয়!—ইহাতে কত মনুষ্যহৃদয়াভিজ্ঞতার এবং ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্যগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। তারপর যে পতিভাবে তাঁহাকে দেখিল, সেই পাইল,—যাহার জারবুদ্ধি রহিল, সে পাইল না, একথাও ভক্তির ঐকান্তিকতা বুঝাইবার কি সুন্দর উদাহরণ! কিন্তু আর একটা কথায় পুরাণকার বড় গোলযোগের সূত্রপাত করিয়াছেন। পতিত্বে একটা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ আছে। কাজে কাজেই সেই ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাগবতোক্ত রাস, বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের রাসের ন্যায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্বী কপর্দীর রোষানলে ভস্মীভূত, সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনর্জীবনার্থ ধূমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন। পুরাণকারের অভিপ্রায় কদর্য নয়; ঈশ্বরপ্রাপ্তিজনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ইতি বাক্য স্মরণ রাখিয়া, তাহাই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। তাঁহার রোপিত ভগবদ্ভক্তিপঙ্কজের মূল, অতল জলে ডুবিয়া রহিল—উপরে কেবল বিকশিত কুসুমদামের ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে—তলায় না, তাহারা কেবল সেই কুসুমদামের মালা গাঁথিয়া, ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম প্রস্তুত করিল। যাহা ভাগবতে

নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব। এত কাল, আমাদের জন্মভূমি সেই মদনধর্মোৎসবভারাক্রান্ত। তাই কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে। কৃষ্ণচরিত্র, বিশুদ্ধিতায়, সর্বগুণময়ত্বে জগতে অতুল্য। আমার ন্যায় অক্ষম, অধম ব্যক্তি সেই পবিত্র চরিত্র গীত করিলেও লোকে তাহা শুনিবে, তাই এই অভিনব কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়াছি।

কৃষ্ণচরিত্র

অষ্টম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী-ভাগবত

ব্রাহ্মাণকন্যা

বস্ত্রহরণের নিগূঢ় তাৎপর্য আমি যেরূপ বুঝাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে একটা কথা বাকি আছে।

“যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ||

ইতি বাক্যের অনুবর্তী হইয়া যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বস্ত্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্বার্পণ ক্ষমতা দেখাইল, এজন্য তাহারা কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারিণী হইল। আর একটি উপন্যাস রচনা করিয়া ভাগবতকার এই তত্ত্ব আরও পরিষ্কৃত করিয়াছেন। সে উপন্যাস এই,—

একদা গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট আহার্য প্রার্থনা করিল। অদূরবর্তী কোন স্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। কৃষ্ণ গোপালগণকে উপদেশ করিলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেরা যজ্ঞস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাহিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দিল। গোপালগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সেই সকল কথা জানাইল। কৃষ্ণ তখন বলিলেন যে, তোমরা পুনর্বার যজ্ঞস্থলে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাদিগের নিকট আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেরা তাহাই করিল। ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণের নাম শুনিয়া গোপালদিগকে প্রভূত অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিল, এবং কৃষ্ণ অদূরে আছেন শুনিয়া তাঁহার দর্শনে আসিল। তাহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণকে দর্শন করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। ব্রাহ্মণকন্যাগণ বলিলেন, “আমরা আপনার ভক্ত, আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—তাঁহারা আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। আমরা আপনার পদাগ্রে পতিত হইতেছি, আমাদিগের অন্যা গতি আপনি বিধান করুন।” কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, “দেখ, অঙ্গসঙ্গই কেবল অনুরাগের কারণ নহে। তোমরা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর, আমাকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে। আমার

শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান, অনুকীর্তনে আমাকে পাইবে—সন্নিকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।” তাহারা ফিরিয়া গেল।

এখন এই ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণকে পাইবার যোগ্য কি করিয়াছিলেন? কেবলমাত্র পিত্রাদি স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারানুগমনার্থেও তাহা করিয়া থাকে। ভগবানে সর্বস্বার্পণ তাঁহাদিগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার তাঁহারা অধিকারিণী হন নাই। অতএব সিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির জন্য তাঁহাদিগকে উপদিষ্ট করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পবিত্রব্রাহ্মণকুলোদ্ভূতা সাধনাভাবে যাহাতে অধিকারিণী হইল না, সাধনাপ্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে অধিকারিণী হইল। পূর্বরাগবর্ণনস্থলে, ভাগবতকার গোপকন্যাদিগের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন।

এক্ষণে আমরা ভাগবতে বিখ্যাত রাসপঞ্চাধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এই রাসলীলাতত্ত্ব বস্ত্রহরণোপলক্ষে আমি এত সবিস্তারে বুঝাইয়াছি যে, এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে।

নবম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী-ভাগবত

রাসলীলা

ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এই পাঁচ অধ্যায়ে রাসপঞ্চাধ্যায়। প্রথম অর্থাৎ ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে শারদ পূর্ণিমা-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বেণুবাদন করিলেন। পাঠকের স্মরণ হইবে যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে তিনি কলপদ অর্থাৎ অস্ফুটপদ গীত করিলেন। ভাগবতকার সেই 'কল' শব্দ রাখিয়াছেন, যথা "জগৌ কলম্"। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই 'কল' শব্দ হইতে কৃষ্ণমন্ত্রের 'ক্লীং' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তিনি উহাকে কামগীত বলিয়াছেন। টীকাকারদিগের মহিমা অনন্ত! পুরাণকার স্বয়ং ঐ গীতকে 'অনঙ্গবর্ধনম্' বলিয়াছেন।

বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণদর্শনে ধাবিতা হইল। পুরাণকার তাঁহাদিগের ত্বরা এবং বিভ্রম যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কালিদাসকৃত পুরস্ত্রীগণের ত্বরা এবং বিভ্রমবর্ণনা মনে পড়ে। কে কাহার অনুকরণ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

গোপীগণ সমাগতা হইলে, কৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল ত? তোমাদিগের প্রিয় কার্য কি করিব? ব্রজের কুশল ত? তোমরা কেন আসিয়াছ?" এই বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, "এই রজনী ঘোররূপা, ভীষণ পশু সকল এখানে আছে, এ স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার যোগ্য স্থান নয়। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও। তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি তোমাদিগকে না দেখিয়া তোমাদিগের অন্বেষণ করিতেছে। বন্ধুগণের ভয়োৎপত্তির কারণ হইও না। রাকাচন্দ্রবিরঞ্জিত যমুনাসমীরণলীলাকম্পিত তরুপল্লবশোভিত কুসুমিত বন দেখিলে ত? এখন হে সতীগণ, অচিরে প্রতিগমন করিয়া পতিসেবা কর। বালক ও বৎস সকল কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাও। অথবা আমার প্রতি স্নেহ করিয়া, স্নেহের বশীভূতবুদ্ধি হইয়া আসিয়া থাকিবে। সকল প্রাণীই আমার প্রতি এইরূপ প্রীতি করিয়া থাকে। কিন্তু হে কল্যাণীগণ! পতির অকপট শুশ্রূষা এবং বন্ধুগণের ও সন্তানগণের অনুপোষণ ইহাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম। পতি দুঃশীলই হউক, দুর্ভগই হউক, জড় হউক, রোগী বা অধনী হউক, যে স্ত্রীগণ অপাতকী হইয়া উভয় লোকের মঙ্গল কামনা করে,

তাহাদিগের দ্বারা সে পতি পরিত্যাজ্য নয়। কুলস্ত্রীদিগের ঔপপত্য অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অতি তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সর্বত্র নিন্দিত। শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে, অনুকীর্তনে মদ্ভাবোদয় হইতে পারে, কিন্তু সন্নিকর্ষে নহে। অতএব তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।"

কৃষ্ণের মুখে এই উক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়া পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিব্রত্যধর্মের মাহাত্ম্যের অনভিজ্ঞতা অথবা তৎপ্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তিনি কৃষ্ণগোপীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় বর্ণনে প্রবৃত্ত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় পূর্বে বুঝাইয়াছি। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গোপীগণ ফিরিল না। তাহারা কাঁদিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "এমন কথা বলিও না, তোমার পাদমূলে সর্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। আদিপুরুষদেব যেমন মুমুক্ষকে পরিত্যাগ করেন না, তেমনি আমরা দুরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ধর্মজ্ঞ, পতি অপত্য সুহৃৎ প্রভৃতির অনুবর্তন স্ত্রীলোকদিগের স্বধর্ম বলিয়া যে উপদেশ দিতেছ, তাহা তোমাতেই বর্তিত হউক। কেন না, তুমি ঈশ্বর। তুমি দেহধারীদিগের প্রিয় বন্ধু এবং আত্মা। হে আত্মন্! যাহারা কুশলী, তাহারা, নিত্যপ্রিয় যে তুমি, সেই তোমাতেই রতি (আত্মরতি) করিয়া থাকে। দুঃখদায়ক পতিসুতাদির দ্বারা কি হইবে?" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে পুরাণকার বুঝাইয়াছেন যে, গোপীগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরার্থেই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল। তার পর আরও কতকগুলি কথা আছে, যাহা দ্বারা কবি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধা হইয়াই, গোপীগণ কৃষ্ণানুসারিণী। তাহার পরে পুরাণকার বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম অর্থাৎ আপনাতে ভিন্ন তাঁহার রতি বিরতি কিছুতেই নাই, তথাপি এই গোপীগণের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন; এবং তাহাদিগের সহিত গান করতঃ যমুনাপুলিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ কিছু নাই। যদি এ কথা প্রকৃত হইত, তাহা হইলে আমি এ রাসলীলার অর্থ যেরূপ করিয়াছি, তাহা কোন রকমেই খাটিত না। কিন্তু এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই স্থান হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বাহুপ্রসারপরিরম্ভ-করালকোরুনীবীস্তনালভননর্মনখাগ্রপ্যতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ||" ৪১ ||

অন্যান্য স্থান হইতেও আরও দুই চারিটি এরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। এ সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে।

তার পর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রজগোপীগণ অত্যন্ত মানিনী হইলেন। তাঁহাদিগের সৌভাগ্যমদ দেখিয়া তদুপশনমার্থে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। এই গেল ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্ণান্বেষণবৃতান্ত আছে। তাহা স্থূলতঃ বিষ্ণুপুরাণের অনুকরণ। তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। একত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতে করিতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে ভক্তিরস এবং আদিরস দুইই আছে। বুঝাইবার কথা বেশি কিছু নাই। দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবির্ভূত হইলেন। এইখানে গোপীদিগের ইন্দ্রিয়প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব।

"কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাৎ তন্বী তাম্বুলচর্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ ||"

এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন আছে। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। তাহার পর ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে রাসক্রীড়া ও বিহারবর্ণন। রাসক্রীড়া বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাসক্রীড়ার ন্যায় নৃত্যগীত মাত্র। তবে গোপীগণ এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য কিঞ্চিন্মাত্র ইন্দ্রিয়সম্বন্ধও আছে। যথা—

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্বিতম্ || ১৩ ||
নৃত্যন্তী গায়তী কাচিং কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়ো শিবম্ ||১৪ ||

* * *

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ || ১৮ ||

এইরূপ কথা ভিন্ন বেশী আর কিছু নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পুরাণকার জিতেন্দ্রিয়স্বরূপ বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি এবং তাহার প্রমাণও দিয়াছি।

কৃষ্ণচরিত্র

দশম পরিচ্ছেদ—শ্রীরাধা

অথর্ববেদের উপনিষদ সকলের মধ্যে একখানির নাম গোপালতাপনী। কৃষ্ণের গোপমূর্তির উপাসনা ইহার বিষয়। উহার রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, অধিকাংশ উপনিষদ্ অপেক্ষা উহা অনেক আধুনিক। ইহাতে কৃষ্ণ যে গোপগোপীপরিবৃত তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে গোপগোপীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। গোপী অর্থে অবিদ্যা কলা। টীকাকার বলেন,

"গোপায়ন্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ।" আর গোপীজনবল্লভ অর্থে "গোপীনাং পালনশক্তীনাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্লভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ।"

উপনিষদে এইরূপ গোপীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোন কথাই নাই। রাধার নামমাত্র নাই। এক জন প্রধানা গোপীর কথা কাছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, তাঁহার নাম গান্ধর্বী। তাঁহার প্রাধান্যও কামকেলিতে নহে—তত্ত্বজিজ্ঞাসায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নাই।

ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যয়ের মধ্যে 'রাধা' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবাচার্যদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট। তাঁহারা টীকাটিপ্পনীর ভিতর পুনঃ পুনঃ রাধাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। গোপীদিগের অনুরাগাধিক্যজনিত ঈর্ষার প্রমাণ স্বরূপ কবি লিখিয়াছেন যে, তাহারা পদচিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল যে, কোন এক জন গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও গোপীদিগের ঈর্ষাজনিত ভ্রমমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়া অন্তর্হিত হইলেন, এমন কথা নাই এবং রাধার নামগন্ধও নাই।

রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মন্দির নাই বা মূর্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে 'রাধা' নাই, তবে এ 'রাধা' আসিলেন কোথা হইতে?

রাধাকে প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখিতে পাই। উইল্‌সন্ সাহেব বলেন যে, ইহা পুরাণগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী মনসারও কথা আছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা এখন আছে, তাহাতে এক নূতন দেবতত্ত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাই পূর্বাবধি প্রসিদ্ধ যে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। ইনি বলেন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হওয়া দূরে থাকুক, কৃষ্ণই বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাসমণ্ডলে,—বৈকুণ্ঠ তাহার অনেক নীচে। ইনি কেবল বিষ্ণুকে নহে, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী এবং জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহার বাসস্থান গোলকধামে, বলিয়াছি। তথায় গো, গোপ ও গোপীগণ বাস করে। তাহারা দেবদেবীর উপর। সেই গোলোকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলাসিনী দেবীই রাধা। রাধার আগে রাসমণ্ডল, রাসমণ্ডলে ইনি রাধাকে সৃষ্টি করেন। রাসের রা, এবং ধাতুর ধা, ইহাতে রাধা নাম নিষ্পন্ন করিয়াছেন।* সেই গোপগোপীর বাসস্থান রাধাধিষ্ঠিত গোলোকধাম পূর্বকবিদিগের বর্ণিত বৃন্দাবনের বজনিশ নকল। এখনকার কৃষ্ণযাত্রায় যেমন চন্দ্রাবলী নামে রাধার প্রতিযোগিনী গোপী আছে, গোলকধামেও সেইরূপ বিরজা নাম্নী রাধার প্রতিযোগিনী গোপী ছিল। মানভঞ্জন যাত্রায় যেমন যাত্রাওয়ালারা কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লইয়া যায়, ইনিও তেমনি কৃষ্ণকে গোলোকধামে বিরজার কুঞ্জে লইয়া গিয়াছেন। তাহাতে যাত্রার রাধিকার যেমন ঈর্ষা ও কোপ উপস্থিত হয়, ব্রহ্মবৈবর্তের রাধিকারও সেইরূপ ঈর্ষা ও কোপ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে আর একটা মহা গোলযোগ ঘটিয়া যায়। রাধিকা কৃষ্ণকে বিরজার মন্দিরে ধরিবার জন্য রথে চড়িয়া বিরজার মন্দিরে গিয়া উপস্থিত। সেখানে বিরজার দ্বারবান্ ছিলেন শ্রীদামা বা শ্রীদাম। শ্রীদামা রাধিকাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল না। এ দিকে রাধিকার ভয়ে বিরজা গলিয়া জল হইয়া নদীরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে পুনর্জীবন এবং পূর্ব রূপ প্রদান করিলেন। বিরজা গোলোকনাথের সহিত অবিরত আনন্দানুভব করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার সাতটি পুত্র জন্মিল। কিন্তু পুত্রগণ আনন্দানুভবের বিঘ্ন, এ জন্য মাতা তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, তাঁহারা অনেক ভর্ৎসনা করিলেন, তাঁহারা সাত সমুদ্র হইয়া রহিলেন। এ দিকে রাধা, কৃষ্ণবিরজা-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, কৃষ্ণকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন, এবং অভিশাপ প্রদান করিলেন, যে তুমি গিয়া পৃথিবীতে বাস

কর। এ দিকে কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীদামা রাধার এই দুর্ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। শুনিয়া রাধা শ্রীদামাকে তিরস্কার করিয়া শাপ দিলেন, তুমি গিয়া অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। শ্রীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন, তুমিও গিয়া পৃথিবীতে মানুষী হইয়া রায়াণপত্নী (যাত্রার আয়ান ঘোষ) এবং কলঙ্কিনী হইয়া খ্যাত হইবে।

শেষ দুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। শ্রীদামাকে কৃষ্ণ বর দিয়া বলিলেন যে, তুমি অসূরেশ্বর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না। শেষে শঙ্করশূলস্পর্শে মুক্ত হইবে। রাধাকেও আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, 'তুমি যাও; আমিও যাইতেছি।' শেষে পৃথিবীর ভারাবতরণ জন্য, তিনি পৃথিবীতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

* রাসে সম্ভূয় গোলোকে, সা দধাব হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিড্ভির্দ্বিজোত্তম ||-ব্রহ্মখণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ।
কিন্তু আবার স্থানান্তরে,-
* * * রাকারো দানবাচকঃ।
ধা নির্বাণঞ্চ তদ্দাত্রী তেন রাধা প্রকির্তিতা ||-শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ।

এ সকল কথা নূতন হইলেও, এবং সর্বশেষে প্রচারিত হইলেও এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাদি বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবিগণ, বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালার যাত্রা মহোৎসবাদির মূল ব্রহ্মবৈবর্তে। তবে ব্রহ্মবৈবর্তকারকথিত একটা বড় মূল কথা বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেন নাই, অন্ততঃ সেটা বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্মে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই—রাধিকা রায়াণপত্নী বলিয়া পরিচিতা, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। সেই বিবাহবৃত্তান্তটি সবিস্তারে বলিতেছি, বলিবার আগে গীতগোবিন্দের প্রথম কবিতাটা পাঠকের স্মরণ করিয়া দিই।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ—
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ||

অর্থ। হে রাধে! আকাশ মেঘে স্নিগ্ধ হইয়াছে, তমাল দ্রুম সকলে বনভূমি অন্ধকার হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, পথিস্থ কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত রাধামাধবের যমুনাকূলে বিজনকেলি সকলের জয় হউক।

এ কথার অর্থ কি? টীকাকার কি অনুবাদকার কেহই বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন না। একজন অনুবাদকার বলিয়াছেন, "গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি কিছু অস্পষ্ট; কবি নায়ক-নায়িকার কোন্ অবস্থা মনে করিয়া লিখিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। টীকাকারের মত, ইহা রাধিকাসখীর উক্তি। তাহাতে ভাব এক প্রকার মধুর হয় বটে, কিন্তু শব্দার্থের কিছু অসঙ্গতি ঘটে।" বস্তুতঃ ইহা রাধিকাসখীর উক্তি নহে; জয়দেব গোস্বামী ব্রহ্মবৈবর্ত-লিখিত এই বিবাহের সূচনা স্মরণ করিয়াই এ শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্রহ্মবৈবর্ত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; তবে বক্তব্য এই যে, রাধা শ্রীদামশাপানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কয় বৎসর আগে পৃথিবীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া, রাধিকা কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। তিনি যখন যুবতী, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু।

"একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলম্ ‖ ১ ‖
সরঃসুস্বাদুতোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তং পপৌ।
উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি ‖ ২ ‖
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ।
চকার মায়য়াকস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে ‖ ৩ ‖
মেঘাবৃতং নভো দৃষ্টা শ্যামলং কাননান্তরম্।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম্ ‖ ৪ ‖
বৃষ্টিধারামতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্টৈ্বং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপ হ ‖ ৫ ‖
কথং যাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি।
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বালকস্য কিম্ ‖ ৬ ‖
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা।
মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ ‖ ৭ ‖
এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।"

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ।

অর্থ। "একদা কৃষ্ণসহিত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাকার ভাণ্ডীরবনে গোগণকে চরাইতেছিলেন। সরোবরে স্বাদু জল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান করিলেন। এবং বালককে বক্ষে লইয়া বটমূলে বসিলেন। হে মুনে! তার পর মায়াতে শিশুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ অকস্মাৎ মায়ার দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননান্তর শ্যামল; ঝঞ্ঝাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বজ্রশব্দ, অতিস্থূল বৃষ্টিধারা, এবং বৃক্ষসকল কম্পমান হইয়া পতিতস্কন্ধ হইতেছে, দেখিয়া নন্দ ভয় পাইলেন। 'গোবৎস ছাড়িয়া কিরূপেই বা আপনার আশ্রমে যাই, যদি গৃহে না যাই, তবে এই বালকেরই বা কি হইবে,' নন্দ এইরূপ বলিতেছিলেন, শ্রীহরি তখন কাঁদিতে লাগিলেন; মায়াভয়ে ভীতযুক্ত হইয়া বাপের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

রাধার অপূর্ব লাবণ্য দেখিয়া নন্দ বিস্মিত হইলেন, তিনি রাধাকে বলিলেন, "আমি গর্গমুখে জানিয়াছি, তুমি পদ্মারও অধিক হরির প্রিয়া; আর ইনি পরম নির্গুণ অচ্যুত মহাবিষ্ণু; তথাপি আমি মানব, বিষ্ণুমায়ায় মোহিত আছি। হে ভদ্রে! তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; যথায় সুখী হও, যাও। পশ্চাৎ মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার পুত্র আমাকে দিও।"

এই বলিয়া নন্দ রাধাকে কৃষ্ণসমর্পণ করিলেন। রাধাও কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। দূরে গেলে রাধা রাসমণ্ডল স্মরণ করিলেন, তখন মনোহর বিহারভূমি সৃষ্ট হইল। কৃষ্ণ সেইখানে নীত হইলে কিশোরমূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি রাধাকে বলিলেন, "যদি গোলোকের কথা স্মরণ হয়, তবে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব।" তাঁহারা এরূপ প্রেমালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাধাকে অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। পরিশেষে নিজে কন্যাকর্তা হইয়া, যথাবিহিত বেদবিধি অনুসারে রাধিকাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। রায়াণের সঙ্গে রাধিকার যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়াছিল কি না, যদি হইয়া থাকে, তবে পূর্বে কি পরে হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাইলাম না। রাধাকৃষ্ণের বিবাহের পর বিহারবর্ণন। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মবৈবর্তের রাসলীলাও ঐরূপ।

যাহা হউক, পাঠক দেখিবেন যে, ব্রহ্মবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্ট করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামগন্ধমাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই নূতন বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ। জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নূতন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বন করিয়াই গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। বলিতে গেলে, সকল কবি, সকল ঋষি, সকল পুরাণ, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্তকারই বাঙ্গালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, এই নূতন তাৎপর্য কি এবং কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইল।

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনের প্রাধান্য সচরাচর স্বীকৃত হয়। কিন্তু ছয়টির মধ্যে দুইটিরই প্রাধান্য বেশী—বেদান্তের ও সাঙ্খ্যের। সচরাচর ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বস্তুতঃ বেদান্তদর্শনের আদি ব্রহ্মসূত্রে নহে, উপনিষদে। উপনিষদ্‌কেও বেদান্ত বলে। উপনিষদযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব, সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাই। এই জগৎ ও জীবগণ ঈশ্বরেরই অংশ। তিনি এক ছিলেন, সিসৃক্ষাপ্রযুক্ত বহু হইয়াছেন। তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশ, ঈশ্বরের মায়া হইতেই জীবাত্মা প্রাপ্ত; এবং সেই মায়া হইতে মুক্ত হইলেই আবার ঈশ্বরে বিলীন হইবে। ইহা অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ।

প্রাথমিক বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি এই বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের উপর নির্মিত। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ, বৈদান্তিক ঈশ্বর। বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবত এবং তাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থে যে সকল বিষ্ণুস্তোত্র বা কৃষ্ণস্তোত্র আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অসম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদাত্মক। কিন্তু এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ শান্তিপর্বের ভীষ্মকৃত কৃষ্ণস্তোত্র।

কিন্তু অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে। আধুনিক সময়ে শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য মধ্বাচার্য এবং বল্লভাচার্য, এই চারি জনে অদ্বৈতবাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিশুদ্ধদ্বৈতবাদ—এই চারি প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে এত ছিল না। প্রাচীনকালে ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে দুই রকম

ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই জগৎ, তদ্ভিন্ন জাগতিক কোন পদার্থ নাই। আর এক মত এই যে, জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগৎ নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে জগৎ আছে—"সূত্রে মণিগণা ইব।" ঈশ্বরও জাগতিক সর্বপদার্থে আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তদতিরিক্ত। প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশাস্ত্র সাঙ্খ্য। কপিলের সাঙ্খ্য ঈশ্বরই স্বীকার করে না। কিন্তু পরবর্তী সাঙ্খ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাঙ্খ্যের স্থূলকথা এই, জড়জগৎ বা জড়জগন্ময়ী শক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। পরমাত্মা বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গশূন্য; তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগৎ এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইঁহারা 'প্রকৃতি' নাম দিয়াছেন। এই প্রকৃতিই সর্বসৃষ্টিকারিণী, সর্বসঞ্চারিণী, সর্বসঞ্চালিনী, এবং সর্বসংহারিণী। এই প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব হইতে প্রকৃতিপ্রধান তান্ত্রিকধর্মের উৎপত্তি। এই তান্ত্রিকধর্মে, প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রকৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম লোকরঞ্জন হইয়াছিল। যাহারা বৈষ্ণবদিগের অদ্বৈতবাদে অসন্তুষ্ট, তাঁহারা তান্ত্রিকধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই তান্ত্রিকধর্মের সারাংশ এই বৈষ্ণবধর্মে সংলগ্ন করিয়া এই বৈষ্ণবধর্মকে পুনরুজ্জ্বল করিবার জন্য ব্রহ্মবৈবর্তকার এই অভিনব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্ণবধর্মের পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টা রাধা সেই সাঙ্খ্যদিগের মূলপ্রকৃতিস্থানীয়া। যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া, তাহার পর রাধাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই রাধাকে পুনঃ পুনঃ মূলপ্রকৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। যথা—

"মমার্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ||"

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোকঃ।

পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কি সম্বন্ধ, তাহার পুরাণকার এইরূপে বুঝাইতেছেন। ইহা কৃষ্ণোক্তি।

"যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদো হি নাবয়োর্ধ্রুবম্ || ৫৭ ||
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি।
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্ || ৫৮ ||
বিনা মৃদা ঘটং কর্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্।

কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন ‖ ৫৯ ‖
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্তুমহং ক্ষমঃ।
সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরূপোঽহমচ্যুতঃ ‖ ৬০ ‖
*　　*　　*　　*

কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্ ‖ ৬২ ‖
ত্বঞ্চ শ্রীস্ত্বঞ্চ সম্পত্তিস্ত্বমাধারস্বরূপিণী।
সর্বশক্তিস্বরূপাসি সর্বেষাঞ্চ মমাপি চ ‖ ৬৩ ‖
ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।
ত্বঞ্চ সর্বস্বরূপাসি সর্বরূপোঽহমক্ষরে ‖ ৬৪ ‖
যদা তেজঃস্বরূপোঽহং তেজোরূপাসি ত্বং তদা।
ন শরীরী যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরীরিণী ‖ ৬৫ ‖
সর্ববীজস্বরূপোঽহং যদা যোগেন সুন্দরি।
ত্বঞ্চ শক্তিস্বরূপাসি সর্বস্ত্রীরূপধারিণী ‖ ৬৬ ‖”

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ।

“তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে সর্বদাই আছি। কুম্ভকার বিনা মৃত্তিকায় ঘট করিতে পারে না, স্বর্ণকার স্বর্ণ বিনা কুণ্ডল গড়িতে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারি না। তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীজরূপী। আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি, তখন লোকে আমাকে ‘কৃষ্ণ’ বলে, তোমার সহিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আধারস্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্বশক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে! তুমি সর্বস্বরূপা, আমি সর্বরূপ। আমি যখন তেজঃস্বরূপ তুমি তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, তখন তুমিও অশরীরিণী। হে সুন্দরি! আমি যখন যোগের দ্বারা সর্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সর্বস্ত্রীরূপধারিণী হও।”

পুনশ্চ,

যথাহঞ্চ তথা ত্বঞ্চ যথা ধাবল্যদুগ্ধয়োঃ।
ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্নিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ || ৫৬ ||

* * * *

ত্বৎকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্বযোষিতঃ।
যা যোষিৎ সা চ ভবতী যঃ পুমান্ সোহহমেব চ || ৬৮ ||
অহঞ্চ কলয়া বহ্নিস্ত্বং স্বাহা দাহিকা প্রিয়া।
ত্বয়া সহ সমর্থোহহং নালং দগ্ধুঞ্চ তাং বিনা || ৬৯ ||
অহং দীপ্তিমতাং সূর্যঃ কলয়া তং প্রভাত্মিকা।
সঙ্গতশ্চ ত্বয়া ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্ || ৭০ ||
অহঞ্চ কলয়া চন্দ্রস্ত্বঞ্চ শোভা চ রোহিণী।
মনোহরস্ত্বয়া সার্ধং ত্বাং বিনা চ ন সুন্দরি || ৭১ ||
অহমিন্দ্রশ্চ কলয়া স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ ত্বং সতি।
ত্বয়া সার্ধং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা || ৭২ ||

অহং ধর্মশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ মূর্তিশ্চ ধর্মিণী।
নাহং শক্তো ধর্মকৃত্যে ত্বাঞ্চ ধর্মকৃত্যে ধর্মক্রিয়াং বিনা || ৭৩ ||
অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা।
ত্বয়া সার্ধঞ্চ ফলোদোহপ্যসমর্থস্ত্বয়া বিনা || ৭৪ ||
কলয়া পিতৃলোকহহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতি।
ত্বয়ালং কব্যদানে চ সদা নালং ত্বয়া বিনা || ৭৫ ||
ত্বঞ্চ সম্পৎস্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ।
লক্ষ্মীযুক্তস্ত্বয়া লক্ষ্ম্যা নিশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা || ৭৬ ||
অহং পুমাংস্ত্বং প্রকৃতির্ন স্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা।
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্তুং মৃদা বিনা || ৭৭ ||
অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা।
ত্বাং শদ্যরত্নাধারাঞ্চ বিভর্মি মূর্দ্ধ্নি সুন্দরি || ৭৮ ||
ত্বঞ্চ শান্তিশ্চ কান্তিশ্চ মূর্তির্মূর্তিমতী সতি।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা ক্ষুত্তৃষ্ণা চ পরা দয়া || ৭৯ ||
নিদ্রা শুদ্ধা চ তন্দ্রা চ মূর্ছা চ সন্ততিঃ ক্রিয়া।
মুক্তিরূপা ভক্তিরূপা দেহিনাং দুঃখরূপিণী || ৮০ ||

মমাধারা সদা ত্বঞ্চ তবাত্মাহং সমৌ প্রকৃতিপুরুষৌ।
ন হি সৃষ্টির্ভবেদ্দেবি দ্বয়োরেকতরং বিনা ॥ ৮১ ॥
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ৬৭ অধ্যায়ঃ।*

"যেমন দুগ্ধ ও ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি, সেইখানে তুমি। তোমাতে আমাতে কখনও ভেদ হইবে না, ইহা নিশ্চিত। এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী তোমার কলাংশের অংশকলা; যাহাই স্ত্রী, তাহাই তুমি; যাহাই পুরুষ, তাহাই আমি। কলা দ্বারা আমি বহ্নি, তুমি প্রিয়া দাহিকা স্বাহা; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দগ্ধ করিতে সমর্থ হই, তুমি না থাকিলে হই না। আমি দীপ্তিমান্‌দিগের মধ্যে সূর্য, তুমি কলাংশে প্রভা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দীপ্তিমান্ হই, তুমি না থাকিলে হই না। কলা দ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি শোভা ও রোহিণী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি মনোহর; হে সুন্দরি! তুমি না থাকিলে নই। হে সতি! আমি কলা দ্বারা ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলক্ষ্মী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দেবরাজ, না থাকিলে আমি হতশ্রী। আমি কলা দ্বারা ধর্ম, তুমি ধর্মিণীমূর্তি; ধর্মক্রিয়ার স্বরূপা তুমি ব্যতীত আমি ধর্মকার্যে ক্ষমবান্ হই না। কলা দ্বারা আমি যজ্ঞ, তুমি আপনার অংশে দক্ষিণা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ হই, তুমি না থাকিলে তাহাতে অসমর্থ। কলা দ্বারা আমি পিতৃলোক, হে সতি! তুমি আপনার অংশে স্বধা ; তোমা ব্যতীত পিণ্ডদান বৃথা। তুমি সম্পৎস্বরূপা, তুমি সঙ্গে থাকিলেই আমি প্রভু; তুমি লক্ষ্মী, তোমার সহিত আমি লক্ষ্মীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃশ্রীক। আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি ; তোমা ব্যতীত আমি স্রষ্টা নহি ; মৃত্তিকা ব্যতীত কুম্ভকার যেমন ঘট করিতে পারে না, তোমা ব্যতীত আমি তেমনই সৃষ্টি করিতে পারি না। আমি কলা দ্বারা শেষ, তুমি আপনার অংশে বসুন্ধরা ; হে সুন্দরি! শস্যরত্নাধার স্বরূপ তোমাকে আমি মস্তকে বহন করি। হে সতি! তুমি শান্তি, কান্তি, মূর্তি, মূর্তিমতী, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুত্তৃষ্ণা এবং তুমি পর দয়া, শুদ্ধা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মূর্ছা, সন্ততি, ক্রিয়া, মূর্তিরূপা, ভক্তিরূপা, এবং জীবের দুঃখরূপিণী। তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা; যেখানে তুমি, সেইখানে আমি, তুল্য প্রকৃতি পুরুষ; হে দেবি! দুইএর একের অভাবে সৃষ্টি হয় না।"

* বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে ইহা উদ্ধৃত করা গেল। মূলে কিছু গোলযোগ আছে বোধ হয়।

এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাতে যাহা পাই, তাহা ঠিক সাঙ্খ্যের প্রকৃতিবাদ নহে। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি তন্ত্রে শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃতিবাদ এবং শক্তিবাদে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ সাঙ্খ্যপ্রবচনকার স্ফাটিক পাত্রে জবাপুষ্পের ছায়ার উপমা বুঝাইয়াছেন। স্ফাটিক পাত্র এবং জবাপুষ্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্; তবে পুষ্পের ছায়া স্ফাটিকে পড়ে, এই পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু শক্তির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এই যে, আত্মাই শক্তির আধার। যেমন আধার হইতে আধেয় ভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনই আত্মা ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। এই শক্তিবাদ যে কেবল তন্ত্রেই আছে, এমত নহে। বৈষ্ণব পৌরাণিকেরাও সাঙ্খ্যের পরকৃতিকে বৈষ্ণবী শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ‖ ১৫ ‖
অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্ধর্মোহসৌ সৎক্রিয়া ত্বিয়ম্ ‖ ১৬ ‖
স্রষ্টা বিষ্ণুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীর্ভূমির্ভূধরো অরিঃ।
সন্তোষো ভগবান্ লক্ষ্মীস্তুষ্টির্মৈত্রেয়! শাশ্বতী ‖ ১৭ ‖
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্ কামো যজ্ঞোহসৌ দক্ষিণা তু সা।
আদ্যাহুতিরসৌ দেবী পুরোডাশো জনার্দনঃ ‖ ১৮ ‖
পত্নীশালা মুনে! লক্ষ্মীঃ প্রাগ্বংশো মধুসূদনঃ।
চিতির্লক্ষ্মীর্হবির্যুপ ইধমা শ্রীর্ভগবান্ কুশঃ ‖ ১৯ ‖
সামস্বরূপো ভগবান্ উদ্গীতি কমলালয়া।
স্বাহা লক্ষ্মীর্জগন্নাথো বাসুদেবো হুতাশনঃ ‖ ২০ ‖
শঙ্করো ভগবান্ শৌরির্ভূতির্গৌরী দ্বিজোত্তম।
মৈত্রেয়! কেশবঃ সূর্যস্তৎপ্রভা কমলালয়া ‖ ২১ ‖
বিষ্ণুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাশ্বততুষ্টিদা।
দ্যৌঃ শ্রীঃ সর্বাত্মকো বিষ্ণুরবকাশোহতিবিস্তরঃ ‖ ২২ ‖
শশাঙ্কঃ শ্রীধরঃ কান্তিঃ শ্রীস্তস্যৈবানপায়িনী।
ধৃতির্লক্ষ্মীর্জগচ্চেষ্টা বায়ুঃ সর্বত্রগো হরিঃ ‖ ২৩ ‖

জলধির্দ্বিজ! গোবিন্দস্তদ্বেলা শ্রীর্মহামতে!
লক্ষ্মীস্বরূপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্রো মধুসূদনঃ || ২৪ ||
যমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্ ধূমোর্ণা কমলালয়া।
ঋদ্ধিঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেশ্বর || ২৫ ||
গৌরী লক্ষ্মীর্মহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্।
শ্রীর্দেবসেনা বিপেন্দ্র! দেবসেনাপতির্হরিঃ || ২৬ ||

অবষ্টম্ভো গদাপাণিঃ শক্তির্লক্ষ্মীর্দ্বিজোত্তম!।
কাষ্ঠা লক্ষ্মীর্নিমেষোহসৌ মুহূর্তোসৌ কলা তু সা।
জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃ প্রদীপোহসৌ সর্বঃ সর্বেশ্বরো হরিঃ || ২৭ ||
লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুর্দ্রুমসংস্থিতঃ || ২৮ ||
বিভাবরী শ্রীর্দিবসো দেবশ্চক্রগদাধরঃ।
বরপ্রদো বরো বিষ্ণুর্বধূঃ পদ্মবনালয় || ২৯ ||
নদস্বরূপো ভগবান্ শ্রীর্নদীরুপসংস্থিতিঃ।
ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া || ৩০ ||
তৃষ্ণা লক্ষ্মীর্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ।
রতিরাগৌ চ ধর্মজ্ঞ! লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ || ৩১ ||
কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে।
দেবতির্যঙ্মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান্ হরিঃ।
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয়! নানয়োর্বিদ্যতে পরম্ || ৩২ ||"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে
অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

"বিষ্ণুর শ্রী সেই জগন্মাতা অক্ষয় এবং নিত্য। হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণু সর্বগত, ইনিও সেইরূপ। ইনি বাক্য, বিষ্ণু অর্থ; ইনি নীতি, হরি নয়; ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু বোধ; ইনি ধর্ম, ইনি সৎক্রিয়া; বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি; শ্রী ভূমি, হরি ভূধর; ভগবান্ সন্তোষ, হে মৈত্রেয়! লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম; তিনি যজ্ঞ, ইনি দক্ষিণা; জনার্দন পুরোডাশ, দেবী আদ্যাহুতি; হে মুনে; লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন প্রাগ্বংশ; হরি যূপ, লক্ষ্মী চিতি; ভগবান্ কুশ, শ্রী ইধমা; ভগবান্ সাম, কমলালয়া উদ্গাতি; লক্ষ্মী স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব অগ্নি; ভগবান্ শৌরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্তম! লক্ষ্মী গৌরী;

হে মৈত্রেয়! কেশব সূর্য, কমলালয়া তাঁহার প্রভা; বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা নিত্যতুষ্টিদা স্বধা; শ্রী স্বর্গ, সর্বাত্মক বিষ্ণু অতিবিস্তৃত আকাশস্বরূপ; শ্রীধর চন্দ্র, শ্রী তাঁহার অক্ষয় কান্তি; লক্ষ্মী জগচ্চেষ্টা ধৃতি, বিষ্ণুসর্বত্রগ বায়ু; হে দ্বিজ! গোবিন্দ জলধি, হে মহামতে! শ্রী তাঁহার বেলা; লক্ষ্মী ইন্দ্রাণী স্বরূপা, মধুসূদন দেবেন্দ্র; চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধূমোর্ণা; শ্রী ঋদ্ধি, শ্রীধর স্বয়ং দেবধনেশ্বর; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগা লক্ষ্মী হে গৌরী; হে বিপেন্দ্র! শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি; গদাধর পুরুষকার, হে দ্বিজোত্তম! লক্ষ্মী শক্তি; লক্ষ্মী কাষ্ঠা, ইনি নিমেষ; ইনি মুহূর্ত, তিনি কলা; লক্ষ্মী আলোক, সর্বেশ্বর হরি সর্বপ্রদীপ; জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু দ্রুমরূপে সংস্থিত; শ্রী বিভাবরী, দেবচক্রগদাধর দিবস; বিষ্ণু বরপ্রদ বর, পদ্মবনালয়া বধূ; ভগবান্ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপা; পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা; লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী নারায়ণ পরম লোভ; হে ধর্ম্মজ্ঞ! লক্ষ্মী রতি, গোবিন্দ রাগ; অধিক উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দেব তির্যক্ মনুষ্যাদিতে পুংনামবিশিষ্ট হরি, এবং স্ত্রীনামবিশিষ্টা লক্ষ্মী। হে মৈত্রেয়! এই দুই ভিন্ন আর কিছুই নাই।”

বেদান্তের যাহা মায়াবাদ সাঙ্খ্যে তাহা প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতি হইতে শক্তিবাদ। এই কয়টি শ্লোকে শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মিলিত হইল। বোধ হয়, ইহাই স্মরণ রাখিয়া ব্রহ্মবৈবর্তকার লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন যে, তুমি না থাকিলে, আমি কৃষ্ণ, এবং তুমি থাকিলে আমি শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণকথিত এই শ্রী লইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। পাঠক দেখিবেন, বিষ্ণুপুরাণে যাহা শ্রী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা সম্বন্ধে ঠিক তাহাই কথিত হইয়াছে। রাধা সেই শ্রী। পরিচ্ছেদের উপর আমি শিরোনাম দিয়াছি, “শ্রীরাধা”। রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির স্ফূর্তি, এবং শক্তিরই বিকাশ উভয়ের বিহার।

যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তৎকথিত ‘রাধাতত্ত্ব’ কি, তাহা বোধ করি এতক্ষণে পাঠককে বুঝাইতে পারিলাম। কিন্তু আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ‘রাধাতত্ত্ব’ ছিল কি? বোধ হয় ছিল; কিন্তু এ প্রকার নহে। বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেক প্রকার দেওয়া হইয়াছে। তাহার দুইটি পূর্বে ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

“রেফো হি কোটিজন্মাঘং কর্মভোগং শুভাশুভম্।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ || ১০৬ ||

ধকার আয়ুষো হানিমাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণস্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ || ১০৭ ||
রাকারো নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরম্ || ১০৮ ||
ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্যকালমেব চ।
দদাতি সার্ষ্টিং সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমম্ || ১০৯ ||"
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৩ অঃ।

ইহার একটিও রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নয়। রাধ্ ধাতু আরাধনার্থে, পূজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা। বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে এ ব্যুৎপত্তি কোথাও নাই। যিনি এই রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি গোপন করিয়া কতকগুলা অবৈয়াকরণিক কল কৌশলের দ্বারা ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ভ্রান্তির প্রতিপোষণার্থ মিথ্যা করিয়া সামবেদের দোহাই দিয়াছেন,* তিনি কখনও 'রাধা' শব্দের সৃষ্টিকারক নহেন। যিনি রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির অনুযায়িক হইয়া রাধারূপক রচনা করেন নাই, তিনি কখনও রাধার সৃষ্টিকর্তা নহেন। সেই জন্য বিবেচনা করি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্তেই রাধার প্রথম সৃষ্টি। এবং সেখানে রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নাই।

রাধা শব্দের আর একটি অর্থ আছে—বিশাখানক্ষত্রের# একটি নাম রাধা। কৃত্তিকা হইতে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র। পূর্বে কৃত্তিকা হইতে বৎসর গণনা হইত। কৃত্তিকা হইতে রাশি গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। অতএব রাসমণ্ডলের মধ্যবর্তিনী হউন বা না হউন, রাধা রাশিমণ্ডলের বা রাসমণ্ডলের মধ্যবর্তী বটেন। এই 'রাসমণ্ডলমধ্যবর্তিনী' রাধার সঙ্গে 'রাসমণ্ডলে রাধার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আসল ব্রহ্মবৈবর্তের অভাবে স্থির করা অসাধ্য।

* রাধাশব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ সামবেদ নিরূপিতা || ১৩ অঃ, ১৫৩।

রাধা বিশাখা পুষ্যে তু সিধ্যতিযৌ শ্রবিষ্ঠয়া-অমরকোষ।

একাদশ পরিচ্ছেদ—বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি

ভাগবতে বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধীয় আর কয়েকটা কথা আছে।

১ম, নন্দ এক দিন স্নান করিতে যমুনায় নামিলে, বরুণের অনুচর আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া আসেন। শাদা কথায় নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

২য়, একটা সাপ আসিয়া এক দিন নন্দকে ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে নন্দকে মুক্ত করিয়া সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। সর্পটি বিদ্যাধর। কৃষ্ণস্পর্শে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করে। শাদা কথায় কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৩য়, শঙ্খচূড় নামে একটা অসুর আসিয়া ব্রজাঙ্গনয়দিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণ বলরাম তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে মুক্ত করেন এবং শঙ্খচূড়কে বধ করেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শঙ্খচূড়ের কথা ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্বে বলিয়াছি।

৪র্থ, এই তিনটা কথা বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকৃত অরিষ্টাসুর ও কেশী অসুরের বধবৃত্তান্ত হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে এবং মহাভারতে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় তাহার প্রসঙ্গও আছে। অরিষ্ট বৃষরূপী এবং কেশী অশ্বরূপী। শিশুপাল ইহাদিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন।

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দিলে অরিষ্টবধ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষ এই কেশিবধবৃত্তান্ত অথর্বসংহিতায় আছে বলিয়াছি। সেখানে কেশীকে কৃষ্ণকেশী বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকেশী অর্থে যার কাল চুল। ঋগ্বেদসংহিতাতেও একটি কেশিসূক্ত আছে (দশম মণ্ডল, ১৩৬ সূক্ত)। এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্ হইতে এমন বুঝা যায় যে, হয়ত মুনিই কেশী—দেবতা। মুনিগণ লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন। ঐ দুই ঋকে মুনিগণেরই প্রশংসা করা হইতেছে। Muir সাহেবেও সেইরূপ বুঝিয়াছেন। কিন্তু প্রথম ঋকে, অন্যপ্রকার বুঝান হইয়াছে। প্রথম ঋক্ রমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন:—

"কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনি ভূলোক ও দ্যুলোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতি, ইহার নাম কেশী।"

তাহা হইলে, জগদ্ব্যঞ্জক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই কৃষ্ণকেশী। কৃষ্ণ তাহারই নিধনকর্তা, অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত করিয়াছিলেন।

এইখানে বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি। এক্ষণে আলোচ্য যে, আমরা ইহার ভিতর পাইলাম কি? ঐতিহাসিক কথা কিছুই পাইলাম না বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক কথা অতিপ্রাকৃত উপন্যাসে পরিপূর্ণ। তাহার ভিতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি দুর্লভ। আমরা প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে—চৌরবাদ এবং পরদারবাদ—সে সকলই অমূলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা এত সবিস্তারে ব্রজলীলার সমালোচনা করিয়াছি। ঐতিহাসিক তত্ত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু এই,—অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বসুদেব আপন পত্নী রোহিণী এবং পুত্রদ্বয় রাম ও কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত করেন। তিনি শৈশবে রূপলাবণ্যে এবং শিশুসুলভ গুণসকলে সর্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের অনিষ্টকারী পশু প্রভৃতি হনন করিয়া গোপালগণকে সর্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি শৈশবাবধিই সর্বজন এবং সর্ব্বজীবে কারুণ্যপরিপূর্ণ—সকলের উপকার করিতেন। গোপালগণ প্রতি এবং গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্মতত্ত্বও তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্বও যে পাইয়াছি, ইহাই সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে ইহাও বলিতে পারি যে, ইহার বেশি আর কিছু নয়।

তৃতীয় খণ্ড

মথুরা-দ্বারকা

কৃষ্ণচরিত্র

কৃষ্ণচরিত্র - তৃতীয় খণ্ড

মথুরা—দ্বারকা

যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা।
ধর্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ||

শান্তিপর্ব্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ—কংসবধ

এদিকে কংসের নিকট সংবাদ পঁহুছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম অতিশয় বলশালী হইয়াছেন। পূতনা হইতে অরিষ্ট পর্যন্ত কংসানুচর সকলকে নিহত করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ গিয়া কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ-রাম বসুদেবের পুত্র। দেবকীর অষ্টমগর্ভজা বলিয়া যে কন্যাকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দ—যশোদার কন্যা। বসুদেব সন্তান পরিবর্তিত করিয়া কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কংস ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বসুদেবকে তিরস্কৃত করিলেন, এবং তাঁহার বধে উদ্যত হইলেন; এবং রাম-কৃষ্ণকে আনিবার জন্য অক্রুরনামা এক জন যাদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। এ দিকে কংস আপনার বিখ্যাত বলবান্ মল্লদিগের দ্বারা রাম-কৃষ্ণের বধসাধনের অভিপ্রায়ে ধনুর্মখ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। রামকৃষ্ণ অক্রূর কর্তৃক তথায় আনীত হইয়া* রঙ্গভূমিতে প্রবেশপূর্বক কংসের শিক্ষিত হস্তী কুবলয়াপীড়কে ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ মল্ল চাণুর ও মুষ্ঠিককে নিহত করিলেন। ইহা দেখিয়া কংস নন্দকে লৌহময় নিগড়ে অবরুদ্ধ করিবার এবং বসুদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ করিয়া কৃষ্ণ-বলরামকে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন যে মঞ্চে মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য অন্যান্য যাদবের সহিত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লম্ফপ্রদান-পূর্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া কংসকে ধরিলেন এবং তাঁহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রঙ্গভূমে নিপাতিত ও তাঁহাকে নিহত করিলেন। পরে বসুদেবকে দেবকী প্রভৃতি গুরুজনকে যথাবিহিত বন্দনা করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। নিজে রাজা হইলেন না।

হরিবংশ ও পুরাণ সকলে এইরূপ কংসবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। কংসবধ ঐতিহাসিক ঘটনা বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ক এই বিবরণ ঐতিহাসিকতাশূন্য। ইহাতে বিশ্বাস করিতে গেলে, অতিপ্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হয়। প্রথমতঃ দেবর্ষি নারদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। তার পর সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না, কংসের ভয় সেই দৈববাণীস্মৃতি হইতে উৎপন্ন। তাহা ছাড়া, দুইটি গোপবালক আসিয়া বিনা যুদ্ধে সভামধ্যে মথুরাধিপতিকে বিনষ্ট করিবে, ইহা ত সহজে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব দেখা যাউক যে, সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতে এই বিষয় কি আছে। মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজে নিজের পূর্ববৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিতেছেন:—

* পথিমধ্যে কুব্জা-ঘটিত ব্যাপারটা আছে। বিষ্ণুপুরাণে নিন্দনীয় কথা কিছু নাই। কুব্জা আপনাকে সুন্দরী হইতে দেখিয়া কৃষ্ণকে নিজ মন্দিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কৃষ্ণ হাসিয়াই অস্থির। বিষ্ণুপুরাণে এই পর্যন্ত। কৃষ্ণের এ ব্যবহার মানবোচিত ও সজ্জনোচিত। কিন্তু ভাগবতকার ও ব্রহ্মবৈবর্তকার তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন, কুব্জার হঠাৎ ভক্তির হঠাৎ পুরস্কার দিয়াছেন, শেষ যাত্রায় কুব্জাপাটরাণী!

আমরা এইখান হইতে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার কারণ, ভাগবতে ঐতিহাসিক কথা কিছুই পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহা বিষ্ণুপুরাণেও আছে। তদতিরিক্ত যাহা পাওয়া যায়, তাহা অতিপ্রকৃত উপন্যাস মাত্র। তবে ভাগবতকথিত বাল্যলীলা অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া, আমরা ভাগবতের সে অংশের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে পারি।

"কিয়ৎকাল অতীত হইল কংস* যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করতঃ সর্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুক—কন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম।"

ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন হইতে আনীত হওয়ার কথা কিছুমাত্র নাই। বরং এমন বুঝাইতেছে যে, কংসবধের পূর্ব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাস করিতেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবেরা জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা না করিয়া জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ করিলেন। ইহাতে বলরাম ভিন্ন আর কেহ তাঁহার সহায় ছিল কি না, ইহা প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারিতেছে যে, অন্যান্য যাদবগণ প্রকাশ্যে তাঁহাদের সাহায্য করুন বা না করুন, কংসকে কেহ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন নাই। কংস তাঁহাদের সকলের উপর অত্যাচার করিত, এ জন্য বরং, বোধ হয়, তাঁহারাই রাম-কৃষ্ণের বলাধিক্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে নেতৃত্বে সংস্থাপন করিয়া কংসের বধসাধন করিয়াছিলেন। এইটুকু ভিন্ন আর কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় না।

আর ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহা পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকেই যাদবদিগের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কেন না, মহাভারতেও উগ্রসেনকে যাদবদিগের অধিপতি স্বরূপ বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে বধ করিতে পারে, সেই তাহার রাজ্যভোগী হয়। কংসের বিজেতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কেন না, ধর্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজা হইয়াছিল। ধর্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি শৈশবাবধিই ধর্মাত্মা। অতএব যাহার রাজ্য, তাহাকেই তিনি রাজ্য প্রধান করিলেন। আমরা পরে দেখিব যে, তিনি প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, যাহাতে পরিহিত, তাহাই ধর্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এইজন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন—ধর্মার্থ মাত্র। বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়া ছিলেন, এমন কথা গ্রন্থে লিখিত আছে। এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাই এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্মাত্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মানুষ।

* কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু বলিতে বাধ্য, এই অনুবাদে আছে "দানবরাজ কংস।" মূলে তাহা নাই, যথা-

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কংসো নির্মথ্য যাদবান্।

সুতরাং "দানবরাজ" শব্দ তুলিয়া দিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শিক্ষা

পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ বলরাম কাশীতে সান্দীপনি ঋষির নিকট শিক্ষার্থে গমন করিলেন, এবং চতুঃষষ্টিদিবসমধ্যে শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায় না। নন্দালয়ে তাঁহার কোন প্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ নন্দ জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্যদিগের বেদে অধিকার ছিল। বৈশ্যালয়ে তাঁহাদিগের কোনও প্রকার বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া বিচিত্র বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিনি নন্দালয় হইতে মথুরায় পুনরানীত হইয়াছিলেন। পূর্ব-পরিচ্ছেদে মহাভারত হইতে যে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা হইতে এরূপ অনুমানই সঙ্গত যে, কংসবধের অনেক পূর্ব হইতেই তিনি মথুরায় বাস করিতেছিলেন, এবং মহাভারতের সভাপর্বে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় দেখা যায় যে, শিশুপাল তাহাকে কংসের অন্নভোজী বলিতেছে—

"যস্য চানেন ধর্মজ্ঞ ভুক্তমন্নং বলীয়সঃ।
স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতন্ন মহাদ্ভুতং ||"

মহাভারতম্, সভাপর্ব, ৪০ অধ্যায়ঃ।

অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনীত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোপীদিগের সঙ্গে গ্রথিত কৈশোরলীলা যে উপন্যাস মাত্র, ইহা তাহার অন্যতর প্রমাণ।

মথুরাবাসকালেও তাঁহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহারও কোন বিশিষ্ট বিবরণ নাই। কেবল সান্দীপনি মুনির নিকট চতুঃষষ্টি দিবস অস্ত্রশিক্ষার কথাই আছে। যাঁহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? ফলতঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও মানবধর্মাবলম্বী এবং মানুষী শক্তি দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি এবং এক্ষণেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইব। মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম করিতে গেলে, শিক্ষার দ্বারা সেই মানুষী শক্তিকে অনুশীলিত এবং স্ফূরিত করিতে হয়। যদি মানুষী শক্তি সেই স্বতঃস্ফূরিত হইয়া সর্বকার্যসাধনক্ষম হয়, তাহা হইলে সে ঐশী শক্তি-মানুষী শক্তি নহে। কৃষ্ণের যে মানুষী শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা এই সান্দীপনিবৃত্তান্ত ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তিনি সমগ্র বেদ

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বে অর্ঘাভিহরণ-পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে ভীষ্ম একটি হেতু এই নির্দেশ করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী। তাদৃশ বেদবেদাঙ্গজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্লভ।

"বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানাং বলং চাপ্যধিকং তথা।
নৃণাং লোকে হি কোহন্যোহস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে ||

মহাভারতম্, সভাপর্ব, ৩৮ অধ্যায়ঃ।

মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞতা সম্বন্ধে এইরূপ আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বেদজ্ঞতা স্বতঃলব্ধও নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি আঙ্গিরস-বংশীয় ঘোর ঋষির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সে সময় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্যা বলিত। শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ কোন সময়ে না কোন সময়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে তপস্যা অর্থে যাহা বুঝি, বেদের অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, তপস্যার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমরা বুঝি, তপস্যা অর্থে বনে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পানাহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা। কিন্তু দেবতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেবও তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শতপথব্রাহ্মণে আছে যে, স্বয়ং পরব্রহ্ম সিসৃক্ষু হইলে তপস্যার দ্বারাই সৃষ্টি করিলেন, যথা—

সোহকাময়ত। বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্ব ইদং সর্বমসৃজত।* অর্থ,—"তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইব। তিনি তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

এ সকল স্থানে তপস্যা অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয় যে, চিত্ত সমাহিত করিয়া আপনার শক্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফুরণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে কথিত আছে যে, কৃষ্ণ দশ বৎসর হিমালয় পর্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাভারতের ঐশিক পর্বে লিখিত আছে যে, অশ্বত্থামাপ্রযুক্ত ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের দ্বারা উত্তরার গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে, কৃষ্ণ সেই মৃতশিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, এবং তখন অশ্বত্থামাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার তপোবল দেখিবে।

আদর্শ মনুষ্যের শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে। ফলও সেইরূপ দেখি। কিন্তু সেই প্রাচীন কালের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহা কিছুই জানিতে পারা গেল না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

* ২ বল্লী, অনুবাক।

কৃষ্ণচরিত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—জরাসন্ধ

সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরার্ধে এক এক জন সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার প্রাধান্য অন্য রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বা করদ, কেহ বা আজ্ঞানুবর্তী, এবং যুদ্ধকালে সকলেই সহায় হইত। ঐতিহাসিক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, অশোক, মহাপ্রতাপশালী গুপ্তবংশীয়েরা, হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য এবং আধুনিক সময় পাঠান ও মোগল—ইঁহারা এইরূপ সম্রাট্ ছিলেন। হিন্দুরাজ্যকালে অধিকাংশ সময়ই এই আধিপত্য মগদাধিপতিরই ছিল। আমরা যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও মগদাধিপতি উত্তর—ভারতে সম্রাট্। এই সম্রাট্ বিখ্যাত জরাসন্ধ। তাঁহার বল ও প্রতাপ মহাভারতে, হরিবংশে ও পুরাণ সকলে অতিশয় বিস্তারের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ একত্র হইয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা উপস্থিত ছিল, লেখা আছে। একা জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা লিখিত হইয়াছে।

কংস এই জরাসন্ধের জামাতা। কংস তাঁহার দুই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কংসবধের পর তাঁহার বিধবা কন্যাদ্বয় জরাসন্ধের নিকট গিয়া পতিহন্তার দমনার্থ রোদন করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ মহাসৈন্য লইয়া আসিয়া মথুরা অবরোধ করিলেন। জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যের তুলনায় যাদবদিগের সৈন্য অতি অল্প। তথাপি কৃষ্ণের সেনাপতিত্বগুণে যাদবেরা জরাসন্ধকে বিমুখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের বলক্ষয় করা তাঁহাদের অসাধ্য। কেন না, জরাসন্ধের সৈন্য অগণ্য। অতএব জরাসন্ধ পুনঃপুনঃ আসিয়া মথুরা অবরোধ করিতে লাগিল। যদিও সে পুনঃপুনঃ বিমুখীকৃত হইল, তথাপি এই পুনঃপুনঃ আক্রমণে যাদবদিগের গুরুতর অশুভ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। যাদবদিগের ক্ষুদ্র সৈন্য পুনঃপুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিলে তাঁহারা সৈন্যশূন্য হইবার উপক্রম হইলেন। কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার ন্যায় জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যের ক্ষয়বৃদ্ধি কিছু জানিতে পারা গেল না। এইরূপ সপ্তদশ বার আক্রান্ত হওয়ার পর, যাদবেরা কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে মথুরা ত্যাগ করিয়া দুরাক্রম্য প্রদেশে দুর্গনির্মাণপূর্বক বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন। অতএব সাগরদ্বীপ দ্বারকায় যাদবদিগের জন্য পুরী নির্মাণ হইতে লাগিল এবং দুরারোহ রৈবতক পর্বতে দ্বারকা রক্ষার্থে দুর্গশ্রেণী সংস্থাপিত হইল। কিন্তু

তাঁহারা দ্বারকা যাইবার পূর্বেই জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিতে আসিলেন।

এই সময়ে জরাসন্ধের উত্তেজনায় আর এক প্রবল শত্রু কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য উপস্থিত হইল। অনেক গ্রন্থেই দেখা যায় যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে যবনদিগের রাজত্ব ছিল। এক্ষণকার পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রাচীন গ্রীকদিগকেই ভারতবর্ষীয়েরা যবন বলিতেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ কি না, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। বোধ হয়, শক, হূণ, গ্রীক প্রভৃতি অহিন্দু সভ্য জাতিমাত্রকেই যবন বলিতেন। যাহাই হউক, ঐ সময়ে, কালযবন নামে একজন নামে একজন যবন রাজা ভারতবর্ষে অতি প্রবলপ্রতাপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পরমসমররহস্যবিৎ কৃষ্ণ তাঁহার সহিত সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কেন না, ক্ষুদ্র যাদবসেনা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিমুখ করিলেও, সংখ্যায় বড় অল্প হইয়া যাইবে। হতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহারা জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে সক্ষম হইতে না পারে। আর ইহাও পশ্চাৎ দেখিব যে, সর্বভূতে দয়াময় কৃষ্ণ প্রাণিহত্যা পক্ষে ধর্ম প্রয়োজন ব্যতীত অনুরাগ প্রকাশ করেন না। যুদ্ধ অনেক সময়েই ধর্মানুমোদিত, সে সময়ে যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলে, ধর্মের হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এখানেও কালযবন এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধ। আত্মরক্ষার্থে এবং স্বজনরক্ষার্থে, প্রজাগণের রক্ষার্থে যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধর্ম। কিন্তু যদি যুদ্ধ করিতেই হইল, তবে যত অল্প মনুষ্যের প্রাণহানি করিয়া কার্য সম্পন্ন করা যায়, ধার্মিকের তাহাই কর্তব্য। আমরা মহাভারতের সভাপর্বে জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে দেখিব যে, যাহাতে অন্য কোন মনুষ্যের জীবন হানি না হইয়া জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সদুপায় উদ্ভূত করিয়াছিলেন। কালযবনের যুদ্ধেও তাহাই করিলেন। তিনি সসৈন্যে কালযবনের সম্মুখীন না হইয়া কালযবনের বধার্থ কৌশল অবলম্বন করিলেন। একাকী কালযবনের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কালযবন তাঁহাকে চিনিতে পারিল। কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলে, কৃষ্ণ ধরা না দিয়া পলায়ন করিলেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃষ্ণ যেমন বেদে বা যুদ্ধবিদ্যায় সুপণ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্রূপ সুপারগ। আদর্শ মনুষ্যের এইরূপ হওয়া উচিত, আমি "ধর্মতত্ত্বে" দেখাইয়াছি। অতএব কালযবন কৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ কালযবন কর্তৃক অনুসৃত হইয়া এক গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ

করিলেন। কথিত আছে, সেখানে মুচুকুন্দ নামে এক ঋষি নিদ্রিত ছিলেন। কালযবন গুহান্ধকারমধ্যে কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, সেই ঋষিকেই কৃষ্ণভ্রমে পদাঘাত করিল। পদাঘাতে উন্নিদ্র হইয়া ঋষি কালযবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কালযবন ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এই অতিপ্রকৃত ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। স্থূল কথা এই বুঝি যে, কৃষ্ণ কৌশলাবলম্বনপূর্বক কালযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দূরে লইয়া গিয়া, গোপন স্থানে তাহার সঙ্গে দ্বৈরথ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। কালযবন নিহত হইলে, তাহার সৈন্য সকল ভঙ্গ দিয়া মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার পর জরাসন্ধের অষ্টাদশ আক্রমণ,—সে বারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল।

উপরে যেরূপ বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হরিবংশে ও বিষ্ণুদিপুরাণে আছে। মহাভারতে জরাসন্ধের যেরূপ পরিচয় কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের কাছে দিয়াছেন, তাহাতে এই অষ্টাদশ বার যুদ্ধের কোন কথাই নাই। জরাসন্ধের সঙ্গে যে যাদবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, এমন কথাও স্পষ্টতঃ নাই। যাহা আছে, তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, জরাসন্ধ মথুরা একবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু হংস নামক তাঁহার অনুগত কোন বীর বলদেব কর্তৃক নিহত হওয়ায় জরাসন্ধ দুঃখিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই স্থান আমরা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"কিয়ৎকাল অতীত হইল, কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করতঃ সর্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুককন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধানার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংসভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্র দ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রাম জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক নামক দুই বীর তাহার অনুগত আছে; উহারা অস্ত্রাঘাতে কদাচ নিহত হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই দুই

বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদিগের অভিমত হইল এমত নহে, অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন।

হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্বক লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করতঃ যমুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ দিকে তৎ-সহচর হংসও পরম প্রণয়াস্পদ ডিম্বকে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই দুই বীর পুরুষের নিধনবার্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহ্লাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দিনান্তর পতিবিয়োগ-দুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমন পূর্বক আমার পতিহন্তাকে সংহার কর’ বলিয়া বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করতঃ সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি—তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথিদিগের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্বত দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনের অধিক এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণ সকল আছে। যুদ্ধদুর্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সর্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন্! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের একশত পুত্র, তাহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেষ্ণ ও তাঁহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র,

যুদ্ধবিশারদ শাম্ব—আমরা এই সাত জন রথী; কৃতকর্মা, অনাবৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও কুন্তি, এই সাত জন মহারথ, এবং অন্ধকভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ়কলেবর দশ জন মহাবীর,—ইঁহারা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।”

এই জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায় প্রধানতঃ মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়া আমার বিশ্বাস। দুএকটা কথা প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই মৌলিক। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের বিরোধ-বিষয়ে উপরি উক্ত বৃত্তান্তই প্রামাণিক বলিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, পূর্বে বুঝাইয়াছি যে, হরিবংশ এবং পুরাণ সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মৌলিকাংশ অনেক প্রাচীন। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে জরাসন্ধকৃত অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ এবং অষ্টাদশ বার তাহার পরাভব, এ সমস্তই মিথ্যা গল্প। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই হইতে পারে যে, একবারমাত্র সে মথুরা আক্রমণে আসিয়াছিল এবং নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ দেখিলেন যে, চতুর্দিকে সমতল ভূমির মধ্যবর্তী মথুরা নগরীতে বাস করিয়া জরাসন্ধের অসংখ্যসৈন্যকৃত পুনঃপুনঃ অবরোধ নিষ্ফল করা অসম্ভব। অতএব যেখানে দুর্গনির্মাণপূর্বক দুর্গাশ্রয়ে ক্ষুদ্র সেনা রক্ষা করিয়া জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে পারিবেন, সেইখানে রাজধানী তুলিয়া লইয়া গেলেন। দেখিয়া জরাসন্ধ আর সে দিকে ঘেঁষিলেন না। জয়-পরাজয়ের কথা ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে কেবল ইহাই বুঝা যায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদর্শী, তিনি পরম রাজনীতিজ্ঞ এবং অনর্থক মনুষ্যহত্যার নিতান্ত বিরোধী। আদর্শ মনুষ্যের সমস্ত গুণ তাঁহাতে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের বিবাহ

কৃষ্ণের প্রথম ভার্যা রুক্মিণী। ইনি বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভীষ্মকের কন্যা। তিনি অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মকের নিকট রুক্মিণীকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রুক্মিণীও কৃষ্ণের অনুরক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্মক কৃষ্ণশত্রু জরাসন্ধের পরামর্শে রুক্মিণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি কৃষ্ণদ্বেষক শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করিয়া দিনাবধারণপূর্বক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যাদবগণের নিমন্ত্রণ হইল না। কৃষ্ণ স্থির করিলেন, যাদবদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকের রাজধানীতে যাইবেন এবং রুক্মিণীকে তাঁহার বন্ধুবর্গের অসম্মতিতেও গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবেন।

কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। বিবাহের দিন রুক্মিণী দেবারাধনা করিয়া দেবমন্দির হইতে বাহির হইলে পর, কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া রথে তুলিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্রগণ এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীষ্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিয়াই এইরূপ একটা কাণ্ড উপস্থিত হইবে বুঝিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। সৈন্য লইয়া সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া গিয়া যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন।

ইহাকে 'হরণ' বলে। হরণ অর্থে কন্যার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না। কন্যার যদি পাত্র অভিমত হয়, এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি অত্যাচার? রুক্মিণী-হরণেও সে দোষ ঘটে নাই, কেন না, রুক্মিণী কৃষ্ণে অনুরক্তা, এবং পরে দেখাইব যে, কৃষ্ণানুমোদিত অর্জুনকৃত সুভদ্রাহরণেও সে দোষ ঘটে নাই। তবে এরূপ কন্যাহরণে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহার বিশেষ বিচার আবশ্যক, এ কথা আমরা স্বীকার করি। আমরা সে বিচার সুভদ্রাহরণের সময় করিব। কে না, কৃষ্ণ নিজেই সে বিচার সেই সময় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথা বলিব না।

তবে ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। সে কালে ক্ষত্রিয়রাজগণের বিবাহের দুইটি পদ্ধতি প্রশস্ত ছিল;—এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও এক বিবাহে দুই রকম ঘটিয়া যাইত, যথা—কাশিরাজকন্যা অম্বিকাদির বিবাহে। ঐ বিবাহে স্বয়ংবর হয়। কিন্তু আদর্শ ক্ষত্রিয় দেবব্রত ভীষ্ম, স্বয়ংবর না মানিয়া, তিনটি কন্যাই কাড়িয়া লইয়া গেলেন। আর কন্যার স্বয়ংবরই হউক, আর

হরণই হউক, কন্যা একজন লাভ করিলে, উদ্ধতস্বভাব রণপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ একটা যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করিতেন। ইতিহাসে দ্রৌপদীস্বয়ংবরে এবং কাব্যে ইন্দুমতীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্যা হৃতা হয় নাই, তথাপি যুদ্ধ উপস্থিত। মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্মিণী যে হৃতা হইয়াছিলেন, এমন কথাটা পাওয়া যায় না।

শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন:—

রুক্মিণ্যামস্য মূঢ়স্য প্রার্থনাসীন্মুমূর্ষতঃ।
ন চ তাং প্রাপ্তবান্ মূঢ়ঃশূদ্রো বেদশ্রুতীমিব||
শিশুপালবধপর্বাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ১৫ শ্লোকঃ।

শিশুপাল উত্তর করিলেন:—

মৎপূর্বাং রুক্মিণীং কৃষ্ণ সংসৎসু পরিকীর্তয়ন্।
বিশেষতঃ পার্থিবেষু ব্রীড়াং ন কুরুষে কথম্ ||
মন্যমানো হি কঃ সৎসু পুরুষঃ পরিকীর্তয়েৎ।
অন্যপূর্বাং স্ত্রিয়ং জাতু ত্বদন্যো মধুসূদন ||
শিশুপালবধপর্বাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ১৮-১৯ শ্লোকঃ।

ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারিব যে, রুক্মিণী হৃতা হইয়াছিলেন, বা তজ্জন্য কোন যুদ্ধ হইয়াছিল। তার পর উদ্যোগপর্বে আর এক স্থানে আছে,—

যো রুক্মিণীমেকরথেণ ভোজান্ উৎসাদ্য রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহ্য।
উবাহ ভার্যাং যশসা জ্বলন্তীং যস্যাং জজ্ঞে রৌক্মিণেয়ো মহাত্মা||

ইহাতে যুদ্ধের কথা আছে, কিন্তু হরণের কথা নাই।

আর এক স্থানে রুক্মিণীহরণবৃত্তান্ত আছে। উদ্যোগপর্বে সৈন্যনির্যাণ সময়ে রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী পাণ্ডবদিগের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদুপলক্ষে কথিত হইতেছে:—

"বাহুবলগর্বিত রুক্মী পূর্বে ধীমান্ বাসুদেবের রুক্মিণীহরণ সহ্য করিতে না পারিয়া, 'আমি কৃষ্ণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না', এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্বক প্রবৃদ্ধ ভাগীরথীর ন্যায় বেগবতী বিচিত্র আয়ুধধারিণী চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু যে স্থানে বাসুদেবকর্তৃক

পরাজিত হইয়াছিলেন, তথায় ভোজকট নামক প্রভূত সৈন্য ও গজবাজিসম্পন্ন সুবিখ্যাত এক নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সত্বরে পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কবচ, ধনু, তলবার, খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়া আদিত্যসঙ্কাশ ধ্বজের সহিত পাণ্ডবসৈন্যমণ্ডলী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।”

এই কথা উদ্যোগপর্বে ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে। ঐ অধ্যায়ের নাম রুক্মিপ্রত্যাখ্যান। মহাভারতের যে পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে, উদ্যোগপর্বে ১৮৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে।

“উদ্যোগপর্বনির্দিষ্টং সন্ধিবিগ্রহমিশ্রিতম্।
অধ্যায়ানাং শতং প্রোক্তং ষড়শীতির্মর্ষিণা ||
শ্লোকানাং ষট্‌সহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ।
শ্লোকাশ্চ নবতিঃ প্রোক্তাস্তথৈবাষ্টৌ মহাত্মনা ||”

মহাভারতম্, আদিপর্ব।

এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়া যায়। অতএব ১১ অধ্যায় পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হওয়ার পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উদ্যোগপর্বে ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব প্রায় এক হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহস্র শ্লোক কোন্‌গুলি? প্রথমেই দেখিতে হয় যে, উগ্যোগপর্বান্তর্গত কোন্ বৃত্তান্তগুলি পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। এই রুক্মিসমাগম বা রুক্মিপ্রত্যাখ্যান পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। অতএব ঐ ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা বিচারসঙ্গত। এই রুক্মিপ্রত্যাখ্যান পর্বাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। রুক্মী সসৈন্যে আসিলেন এবং অর্জুন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ দুর্যোধন কর্তৃকও পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই। এই দুইটি লক্ষণ একত্রিত করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত, কাজেই রুক্মিণীহরণ বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। ইহার অন্যতর প্রমাণ এই যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, মহাভারতের যুদ্ধের পূর্বেই রুক্মী বলরাম কর্তৃক অক্ষক্রীড়াজনিত বিবাদে নিহত হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকে শিশুপাল কামনা করিয়াছিলেন, ইহা সত্য এবং তিনি রুক্মিণীকে বিবাহ করিতে পান নাই—কৃষ্ণ

তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য। বিবাহের পর একটা যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু 'হরণ' কথাটা মৌলিক মহাভারতে কোথাও নাই। হরিবংশে ও পুরাণে আছে।

শিশুপাল ভীষ্মকে তিরস্কারের সময় কাশিরাজের কন্যাহরণ জন্য তাঁহাকে গালি দিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে তিরস্কারের সময় রুক্মিণীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই। অতএব বোধ হয় না যে, রুক্মিণী হৃতা হইয়াছিলেন। পূর্বোদ্ধৃত কথোপকথনে ইহাই সত্য বোধ হয় যে, শিশুপাল রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্মক রুক্মিণীকে কৃষ্ণকেই সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর তাঁহার পুত্র রুক্মী শিশুপালের পক্ষ হইয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন। রুক্মী অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে দ্যূতোপলক্ষে বলরামের সঙ্গে কলহ উপস্থিত করিয়া নিজেই নিহত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—নরকবধাদি

কথিত হইয়াছে, নরকাসুর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষে তাহার রাজধানী। সে অত্যন্ত দুর্বিনীত ছিল। ইন্দ্র স্বয়ং দ্বারকায় আসিয়া তাহার নামে কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। অন্যান্য দুষ্কর্মের মধ্যে নরক ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতি আদিত্যদিগের মাতা অদিতির কুণ্ডল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরকবধে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রাগ্‌জোতিষপুরে গিয়া নরককে বধ করিলেন। নরকের ষোল হাজার কন্যা ছিল, তাহাদিগের সকলকে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা পৃথিবী নরকাপহৃত অদিতিকুণ্ডল লইয়া আসিয়া কৃষ্ণকে উপহার দিলেন; এবং বলিয়া গেলেন যে, কৃষ্ণ যখন বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধারজন্য বরাহের যে স্পর্শ, সেই স্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া নরককে প্রসব করিয়াছিলেন।

সমস্তই অতিপ্রকৃত এবং সমস্তই অতি মিথ্যা। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেন নাই, প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেদে আছে। কৃষ্ণের সময়ে, নরক প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন না—ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনহস্তে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দ্রের দ্বারকা গমন, পৃথিবীর গর্ভাধান এবং একজনের ষোড়শ সহস্র কন্যা ইত্যাদি সকলই অতিপ্রকৃত উপন্যাস মাত্র। কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী থাকাও এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং মিথ্যা গল্প, ইহা পাঠককে আর বলিতে হইবে না।

এই নরকাসুরবধ হইতে বিষ্ণুপুরাণের মতে পারিজাত হরণের সূত্রপাত। কৃষ্ণ দিতির কুণ্ডল লইয়া অদিতিকে দিবার জন্য সত্যভামা সমভিব্যাহারে ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে সত্যভামা পারিজাত কামনা করায় পারিজাত বৃক্ষ লইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ বাধিল। ইন্দ্র পরাস্ত হইলেন। হরিবংশে ইহা ভিন্নপ্রকারে লিখিত আছে। কিন্তু যখন আমরা বিষ্ণুপুরাণকে হরিবংশের পূর্বগামী গ্রন্থ বিবেচনা করি, তখন এখানে বিষ্ণুপুরাণেরই অনুবর্তী হইলাম। উভয় গ্রন্থকথিত বৃত্তান্তই অত্যদ্ভুত ও অতিপ্রকৃত। যখন আমরা ইন্দ্র, ইন্দ্রালয় এবং পারিজাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, তখন এই সমস্ত পারিজাতহরণবৃত্তান্তই আমাদের পরিহার্য।

ইহার পর বাণাসুরবধবৃত্তান্ত। তাহাও ঐরূপ অতিপ্রকৃত অদ্ভুতব্যাপার—পরিপূর্ণ, এজন্য তাহাও আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। তাহার পর পৌণ্ড্র বাসুদেববধ এবং বারাণসীদাহ। ইহার কতকটা ঐতিহাসিকতা আছে বোধ হয়।

পৌণ্ড্রদিগের রাজা ঐতিহাসিক, এবং পৌণ্ড্র জাতির কথা ঐতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক সময়েও বিবিধ দেশী বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামায়ণে তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, কিন্তু মহাভারতের সময়ে তাহারা আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমভাগবাসী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৌণ্ড্রেরা উপস্থিত ছিল। মহাভারতে তাহারা অনার্য জাতির মধ্যে গণিত হইয়াছে। দশকুমারচরিতেও তাহাদিগের কথা আছে এবং একজন চৈনিক পরিব্রাজক তাহাদিগকে বাঙ্গালা দেশে স্থাপিত দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধনেও গিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সময়ে যিনি পৌণ্ড্রদিগের রাজা ছিলেন, তাঁহারও নাম বাসুদেব। বাসুদেব শব্দের অনেক অর্থ হয়। যিনি বসুদেবের পুত্র, তিনি বাসুদেব। এবং যিনি সর্বনিবাস অর্থাৎ সর্বভূতের বাসস্থান, তিনিও বাসুদেব। অতএব যিনি ঈশ্বরের অবতার, তিনিই প্রকৃত বাসুদেব নামের অধিকারী। এই পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রচার করিলেন যে, দ্বারকানিবাসী বাসুদেব, জাল বাসুদেব; তিনি নিজেই প্রকৃত বাসুদেব—ঈশ্বরাবতার। তিনি কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাদি যে সকল চিহ্নে আমারই প্রকৃত অধিকার, তাহা আমাকেই দিবে। কৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া পৌণ্ড্ররাজ্যে গমন করিলেন এবং চক্রাদি অস্ত্র পৌণ্ড্রকের প্রতি ক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। বারাণসীর অধিপতিগণ পৌণ্ড্রেকের পক্ষ হইয়াছিল, এবং পৌণ্ড্রকের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া, যুদ্ধ করিতেছিল। এজন্য তিনি বারাণসী আক্রমণ করিয়া শত্রুগণকে নিহত করিলেন এবং বারাণসী দগ্ধ করিলেন।

এ স্থলে শত্রুকে নিহত করা অধর্ম নহে, কিন্তু নগরদাহ ধর্মানুমোদিত নহে। পরম ধর্মাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা এরূপ কার্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে যে, কাশিরাজ কৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মহাদেবের তপস্যা করিয়া কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত "কৃত্যা উৎপন্ন হউক," এই বর প্রার্থনা করিলেন। কৃত্যা অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরীরবিশিষ্টা অমোঘ কোন শক্তি উৎপন্ন হইয়া শত্রুর বধসাধন করে। মহাদেব প্রার্থিত বর দিলেন। কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া ভীষণ মূর্তিধারণপূর্বক কৃষ্ণের বধার্থ ধাবমান হইল। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাকে সংহার কর। বৈষ্ণবচক্রের প্রভাবে মাহেশ্বরী কৃত্যা বিধ্বস্তপ্রভাবা হইয়া পলায়ন করিল। চক্রও পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃত্যা বারাণসী নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রানলে সমস্ত পুরী

দগ্ধ হইয়া গেল। ইহা অতিশয় অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। হরিবংশে পৌণ্ড্রকবধের কথা আছে, কিন্তু বারাণসীদাহের কথা নাই। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএব বারাণসীদাহ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে কি জন্য বারাণসীদাহ করিতে কৃষ্ণ বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জানা যায় না।

যে সকল যুদ্ধের কথা কথা বলা গেল, তদ্ভিন্ন উদ্যোগপর্বে ৪৭ অধ্যায়ে অর্জুনবাক্যে কৃষ্ণকৃত গান্ধারজয়, পাণ্ড্যজয়, কলিঙ্গজয়, শাল্বজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে। ইহার মধ্যে শাল্বজয়বৃত্তান্ত মহাভারতের বনপর্বে আছে। ইহা ভিন্ন আর কয়টির কোন বিস্তারিত বিবরণ আমি কোন গ্রন্থে পাইলাম না। বোধ হয়, হরিবংশ ও পুরাণ সকল সংগ্রহের পূর্বে এই সকল যুদ্ধ-বিষয়ক কিম্বদন্তী বিলুপ্ত হইয়াছিল। হরিবংশে ও ভাগবতে অনেক নূতন কথা আছে, কিন্তু মহাভারতে বা বিষ্ণুপুরাণে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই বলিয়া আমি সে সকল পরিত্যাগ করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—দ্বারকাবাস-স্যমন্তক

দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজা ছিলেন না। যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে Oligarchy বলে, যাদবেরা দ্বারকায় তাহাই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর সকলে সমানস্পর্ধী। বয়োজ্যেষ্ঠকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য উগ্রসেনের রাজা নাম। কিন্তু এরূপ প্রধান ব্যক্তির কার্যতঃ বড় কর্তৃত্ব থাকিত না। যে বুদ্ধিবিক্রমে প্রধান, নেতৃত্ব তাহারই ঘটিত। কৃষ্ণ যাদবদিগের মধ্যে বলবীর্য বুদ্ধিবিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ, এই জন্যই তিনি যাদবদিগের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্মা প্রভৃতি অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণও তাঁহার বশীভূত ছিলেন। কৃষ্ণও সর্বদা তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনা করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদিগের রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বহুরাজ্যবিজেতা হইয়াও জ্ঞাতিবর্গকে না দিয়া আপনি কোন ঐশ্বর্যভোগ করিতেন না। তিনি সকলের প্রতি তুল্যপ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই হিতসাধন করিতেন। জ্ঞাতিদিগের প্রতি আদর্শ মনুষ্যের যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই সমান। তাঁহার বলবিক্রমের ভয়ে জ্ঞাতিরা তাঁহার বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি দ্বেষশূন্য ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা নারদের কাছে বলিয়াছিলেন, ভীষ্ম তাহা নারদের মুখে শুনিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। কথাগুলি সত্য হউক মিথ্যা হউক, লোকশিক্ষার্থে আমরা তাহা মহাভারতের শান্তিপর্ব হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্যের অর্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কটুবাক্যে শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বহ্নিলাভার্থী ব্যক্তি যেমন অরণি কাষ্ঠকে মথিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গের দুর্বাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। বলদেব বল, গদ সুকুমারতা এবং আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্য—প্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবলপরাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অধ্যবসায়শালী; তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় যাহারা সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন করিতেছি। আহুক ও অক্রূর আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে একজনকে স্নেহ করিলে, অন্যের ক্রোধোদ্দীপন হয়; সুতরাং আমি কাহারও প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দবশতঃ উহাদিগকে

পরিত্যাগ করাও সুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রূর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যূতকারী সহোদরদ্বয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।"

এই কথার উদাহরণস্বরূপ স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। সামন্তক মণির বৃত্তান্ত অতিপ্রকৃত পরিপূর্ণ। অতিপ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাকিবে, তাহাও কত দূর সত্য, বলা যায় না। যাহা হউক, স্থূল বৃত্তান্ত পাঠককে শুনাইতেছি।

সত্রাজিত নামে এক জন যাদব দ্বারকায় বাস করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্জ্বল সর্বজনলোভনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! মণির নাম স্যমন্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইহা যাদবাধিপতি উগ্রসেনেরই যোগ্য। কিন্তু জ্ঞাতিবিরোধ-ভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু সত্রাজিত মনে ভয় করিলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাহিবেন। চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে মণি তিনি নিজে ধারণ না করিয়া আপনার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই মণি ধারণ করিয়া এক দিন মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। বনমধ্যে একটা সিংহ তাঁহাকে হত করিয়া সেই মণি মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। জাম্ববান্ সিংহকে হত করিয়া সেই মণি গ্রহণ করে। জাম্ববান্ একটা ভল্লুক। কথিত আছে যে, সে ত্রেতাযুগে রামের বানরসেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল।

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মণি অন্তর্হিত জানিতে পারিয়া দ্বারকাবাসী লোকে এইরূপ সন্দেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন এই মণি লইবার ইচ্ছা ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে মারিয়া মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহ্য হওয়ায় তিনি মণির সন্ধানে বহির্গত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে সিংহের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। পরে সিংহের পদচিহ্নানুসরণ করিয়া ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পদচিহ্ন ধরিয়া গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাম্ববানের পুত্রপালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই স্যমন্তক মণি দেখিতে পাইলেন। পরে জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করিলেন। তখন জাম্ববান্ তাঁহাকে স্যমন্তক মণি দিল, এবং আপনার কন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণে সম্প্রদান

করিল। কৃষ্ণ মণি লইয়া দ্বারকায় আসিয়া মণি সত্রাজিতকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি পরস্ব কামনা করিতেন না। কিন্তু সত্রাজিত, কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্ব কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া কৃষ্ণের তুষ্টিসাধনার্থ আপনার কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। সত্যভামা সর্বজনপ্রার্থনীয় রূপবতী কন্যা ছিলেন। এজন্য তিন জন প্রধান যাদব, অর্থাৎ শতধন্বা, মহাবীর কৃতবর্মা এবং কৃষ্ণের পরম ভক্ত ও সুহৃৎ অক্রূর ঐ কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যভামা কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা হওয়ায় তাঁহারা আপনাদিগেক অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন এবং সত্রাজিতের বধের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। অক্রূর ও কৃতবর্মা শতধন্বাকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি সত্রাজিতকে বধ করিয়া তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে, আমরা তোমার সাহায্য করিব। শতধন্বা সম্মত হইয়া কদাচিৎ কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে, সত্রাজিতকে নিদ্রিত অবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি চুরি করিলেন।

সত্যভামা পিতৃবধে শোকাতুরা হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। কৃষ্ণ তখন দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, বলরামকে সঙ্গে লইয়া, শতধন্বার বধে উদ্যোগী হইলেন। শুনিয়া শতধন্বা কৃতবর্মা অক্রূরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ বলরামের সহিত শত্রুতা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন শতধন্বা অগত্যা অক্রূরকে মণি দিয়া দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণ পূর্বক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, রথ ঘোটককে ধরিতে পারিল না। শতধন্বার অশ্বিনীও পথক্লান্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শতধন্বা তখন পাদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। ন্যায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ তখন রথে বলরামকে রাখিয়া স্বয়ং পাদচারে শতধন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ দুই ক্রোশ গিয়া শতধন্বার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাঁহার নিকট পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বলরামকে এই কথা বলিলে বলরাম তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন। বলরাম বলিলেন, "ধিক্ তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি দ্বারকায় চলিয়া যাও; আমি আর দ্বারকায় যাইব না।" এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া বিদেহ নগরে গিয়া তিন বৎসর বাস করিলেন। এদিকে অক্রূরও দ্বারকা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে যাদবগণ তাঁহাকে অভয় দিয়া পুনর্বার দ্বারকায় আনাইলেন। কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিয়া অক্রূরকে বলিলেন যে, স্যমন্তক মণি তোমার

নিকট আছে, আমরা তাহা জানি। সে মণি তোমারই থাক্, কিন্তু সকলকে একবার দেখাও। অক্রূর ভাবিলেন, আমি যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে সন্ধান করিলে, আমার নিকট মণি বাহির হইবে। অতএব তিনি অস্বীকার না করিয়া মণি বাহির করিলেন। তাহা দেখিয়া বলরাম এবং সত্যভামা সেই মণি লইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ সেই মণি বলরাম বা সত্যভামা কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, অক্রূরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন।*

এই স্যমন্তকমণিবৃত্তান্তেও কৃষ্ণের ন্যায়পরতা, স্বার্থশূন্যতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা এবং কার্যদক্ষতা অতি পরিস্ফুট। কিন্তু উপন্যাসটা সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

* এইরূপ বিষ্ণুপুরাণে আছে। হরিবংশ বলেন, কৃষ্ণ আপনিই মণি ধারণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের বহুবিবাহ

এই সম্যন্তক মণির কথায় কৃষ্ণের বহুবিবাহের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িতেছে। তিনি রুক্মিণীকে পূর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক সম্যন্তক মণির প্রভাবে আর দুটি ভার্যা জাম্ববতী এবং সত্যভামা, লাভ করিলেন। ইহাই বিষ্ণুপুরাণ বলেন, হরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,—তিনি বলেন, দুইটি না, চারিটি। সত্রাজিতের তিনটি কন্যা ছিল,—সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রতিনী। তিনটিই তিনি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেন। কিন্তু দুই চারিটায় কিছু আসিয়া যায় না—মোট সংখ্যা নাকি ষোল হাজারের উপর। এইরূপ লোকপ্রবাদ। বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে আছে, "ভগবতোহপ্যত্র মর্ত্যলোকেহবতীর্ণস্য ষোড়শসহস্রাণ্যেকোত্তরশতা—ধিকানি স্ত্রীণামভবন্।"* কৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত এক স্ত্রী। কিন্তু ঐ পুরাণের ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম করিয়া পুরাণকার বলিতেছেন, রুক্মিণী ভিন্ন "অন্যাশ্চ ভার্যাঃ কৃষ্ণস্য বভূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।" তার পর, "ষোড়শাসন্ সহস্রাণি স্ত্রীণামন্যানি চক্রিণঃ।" তাহা হইলে, দাঁড়াইল ষোল হাজার সাত জন। ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরককন্যা। সেই আষাঢ়ে গল্প বলিয়া আমি ইতিপূর্বেই বাদ দিয়াছি।

গল্পটা কত বড় আষাঢ়ে, আর এক রকম করিয়া বুঝাই। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ঐ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে, কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র, ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জন্মিত। এ স্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীরা পুত্রবতী হইতেন।

এই নরকাসুরের ষোল হাজার কন্যার আষাঢ়ে গল্প ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তদ্ভিন্ন আট জন "প্রধানা" মহিষীর কথা পাওয়া যাইতেছে। এক জন রুক্মিণী। বিষ্ণুপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন আট জনের, যথা—

"কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্নজিতী তথা।
দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী ||
মদ্ররাজসুতা চান্যা সুশীলা শীলমণ্ডনা।
সাত্রাজিতী সত্যাভামা লক্ষ্মণা চারুহাসিনী ||"

১। কালিন্দী	৫। রোহিণী (ইনি কামরূপিণী)

২।	মিত্রবিন্দা	৬।	মদ্ররাজসুতা সুশীলা
৩।	নগ্নজিৎকন্যা সত্যা	৭।	সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা
৪।	জাম্ববতী	৮।	লক্ষ্মণা

* বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অং, ১৫ অ, ১৯।

রুক্মিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কৃষ্ণের পুত্রগণের নামকীর্তন হইতেছে:—

প্রদ্যুম্নাদা হরেঃ পুত্রা রুক্মিণ্যাঃ কথিতাস্তব।
ভানুং ভৈমরিকঞ্চৈব সত্যাভামা ব্যজায়ত ‖ ১‖
দীপ্তিমান্ তাম্রপক্ষাদ্যা রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ।
বভূবুর্জাম্বুবত্যাঞ্চ শাম্বাদ্যা বাহুশালিনঃ ‖ ২‖
তনয়া ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্নজিত্যাং মহাবলাঃ।
সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্ত শৈব্যায়াস্ত্বভবন্ সুতাঃ ‖ ৩‖
বৃকদ্যাস্ত সুতা মাদ্র্যাং গাত্রবৎপ্রমুখান্ সুতান্।
অবাপ লক্ষ্মণা পুত্রাঃ কালিন্দ্যাঞ্চ শ্রুতাদয়ঃ ‖ ৪‖

এই তালিকায় পাওয়া গেল, রুক্মিণী ছাড়া,

১।	সত্যভামা (৭)	৫।	শৈব্যা (২)
২।	রোহিণী (৫)	৬।	মাদ্রী (৬)
৩।	জাম্ববতী (৪)	৭।	লক্ষ্মণা (৮)
৪।	নাগ্নজিতী (৩)	৮।	কালিন্দী (১)

কিন্তু ৪র্থ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, "তাসাঞ্চ রুক্মিণী-সত্যভামাজাম্ববতী-জালহাসিনীপ্রমুখা অষ্টৌ পত্ন্যঃ প্রধানাঃ।" এখানে আবার সব নাম পাওয়া গেল না, নূতন নাম "জালহাসিনী" একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিষ্ণুপুরাণে। হরিবংশে আরও গোলযোগ।

হরিবংশে আছে;—

মহিষীঃ সপ্ত কল্যাণীস্ততোহন্যা মধুসূদনঃ।
উপযেমে মহাবাহুর্গুণোপেতাঃ কুলোদ্গতাঃ ‖
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্নজিতীং তথা।
সুতাং জাম্ববতশ্চাপি রোহিনীং কামরূপিণীম্ ‖
মদ্ররাজসুতাঞ্চাপি সুশীলাং ভদ্রলোচনাম্।

সাত্রাজিতীং সত্যভামাং লক্ষ্মণাং জালহাসিনীম্।
শৈব্যস্য চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসাং সমাং ||
১১৮ অধ্যায়ে, ৪০-৪৩ শ্লোকঃ।

এখানে পাওয়া যাইতেছে যে, লক্ষ্মণাই জালহাসিনী। তাহা ধরিয়াও পাই,—

১।	কালিন্দী	৫।	রোহিণী
২।	মিত্রবিন্দী	৬।	মাদ্রী সুশীলা
৩।	সত্যা	৭।	সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা
৪।	জাম্ববৎ-সুতা	৮।	জালহাসিনী লক্ষ্মণা
৯)	শৈব্যা		

ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি-রুক্মিণী ছাড়া নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তালিকা। হরিবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর একটি তালিকা আছে, যথা—

অষ্টৌ মহিষ্যঃ পুত্রিণ্য ইতি প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ।
সর্বা বীরপ্রজাশ্চৈব তাস্বপত্যানি মে শৃণু ||
রুক্মিণী সত্যভামা চ দেবী নাগ্নজিতী তথা।
সুদত্তা চ তথা শৈব্যা লক্ষ্মণ জালহাসিনী ||
মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী জাম্ববত্যথ পৌরবী।
সুভীমা চ তথা মাদ্রী * * *

ইহাতে পাওয়া গেল, রুক্মিণী ছাড়া,

(১)	সত্যভামা	(৬)	মিত্রবিন্দা
(২)	নাগ্নজিতী	(৭)	কালিন্দী
(৩)	সুদত্তা	(৮)	জাম্ববতী
(৪)	শৈব্যা	(৯)	পৌরবী
(৫)	লক্ষ্মণা জালহাসিনী	(১০)	সুভীমা
(১১)	মাদ্রী		

হরিবংশকার ঋষি ঠাকুর, আট জন বলিয়া রুক্মিণী সমেত বার জনের নাম দিলেন। তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সন্তানগণের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আবার বাহির হইল—

(১২)	সুদেবা।	(১৪)	কৌশিকী
(১৩)	উপাসঙ্গ	(১৫)	সুতসোমা

(১৬) যৌধিষ্ঠিরী।*

এছাড়া পূর্বে সত্রাজিতের আর দুই কন্যা ব্রতিনী এবং প্রস্বাপিনীর কথা বলিয়াছেন। এ ছাড়া মহাভারতের নূতন দুইটি নাম পাওয়া যায়—গান্ধারী ও হৈমবতী।# সকল নামগুলি একত্র করিলে, প্রধানা মহিষী কতকগুলি হয় দেখা যাউক। মহাভারতে আছে,—

* ইঁহারাও প্রধানা অষ্টের ভিতর গণিত হইয়াছেন। 'তাসামপত্যান্যষ্টানাং ভগবন্ প্রব্রবীতে মে।' ইহার উত্তরে এ সকল মহিষীর অপত্য কথিত হইতেছে।

রুক্মিণী ত্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীত্যপি।
দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্ ||
মৌসলপর্ব, ৭ অধ্যায়।

(১) রুক্মিণী	(৪) শৈব্যা
(২) সত্যভামা	(৫) হৈমবতী
(৩) গান্ধারী	(৬) জাম্ববতী

মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু "অন্যা" শব্দটা আছে। তার পর বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে ১, ২, ৩, ছাড়া এই কয়েকটা নামও পাওয়া যায়।

(৭) কালিন্দী	(১০) রোহিণী
(৮) মিত্রবিন্দা	(১১) মাদ্রী
(৯) সত্যা নাগ্নজিতী	(১২) লক্ষ্মাণা জালহাসিনী

বিষ্ণুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাঁহার নাম উপরে লেখা আছে। তার পর হরিবংশের প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে, ইহা ছাড়া নূতন নাম নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায়।

(১৩) কালিন্দী	(১৪) রোহিণী
(১৫) সভীমা	

এবং ঐ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই,

(১৬) সুদেবা	(১৮) কৌশিকী	(২০) যৌধিষ্ঠিরী
(১৭) উপাসঙ্গ	(১৯) সুতসোমা	

এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা,

(২১) ব্রতনী।	(২২) প্রস্বাপিনী।

আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসকারদিগের খুব হাত চলিয়াছিল, এ কথা স্পষ্ট। ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে। এই জন্য ঐ ১০ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। তবু থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর নাম মহাভারতের মৌসলপর্ব ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্ব যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পরে দেখাইব। এজন্য এই দুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। বাকি থাকে ১০ জন।

জাম্বরতীর নাম বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে লেখা আছে,—

“দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিনী।”

হরিবংশে এইরূপ,—

“সুতা জাম্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিণী।”

ইহার অর্থে যদি বুঝা যায়, জাম্ববৎসুতাই রোহিণী, তাহা হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় না, এবং সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জাম্ববতী ও রোহিণী একই। বাকি থাকিল ৮ জন।

সত্যভামা ও সত্যাও এক। তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

সত্রাজিতবধের কথার উত্তরে

“কৃষ্ণঃ সত্যভামামমর্ষতাম্রলোচনঃ প্রাহ, সত্যে, মমৈষাবহাসনা।”

অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্রোধারক্ত লোচনে সত্যভামাকে বলিলেন, “সত্যে! ইহা আমারই অবহাসনা।” পুনশ্চ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিতেছেন,—

“সত্যে! যথা ত্বমিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসকৃৎপ্রিয়ম্।”

আবশ্যক হইলে, আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা যথেষ্ট।

অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্যা সত্যভামারই নাম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন আট জন পাই। যথা—

১।	রুক্মিণী	৫।	কালিন্দী
২।	সত্যভামা	৬।	মিত্রবিন্দা
৩।	জাম্ববতী	৭।	মাদ্রী
৪।	শৈব্যা	৮।	জালহাসিনী লক্ষ্মণা

ইহার মধ্যে পাঁচ জন—শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা ও মাদ্রী সুশীলা—ইঁহারা তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র। ইঁহাদের কখনও কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। ইঁহাদের কবে বিবাহ হইল, কেন বিবাহ হইল, কেহ কিছু বলে না। কৃষ্ণজীবনে ইঁহাদের কোন সংস্পর্শ নাই। ইঁহাদের পুত্রের তালিকা কৃষ্ণপুত্রের তালিকার মধ্যে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে তখনও কর্মক্ষেত্রে দেখি না। ইঁহারা কাহার কন্যা, কোন্ দেশসম্ভূতা, তাহার কোন কথা কোথাও নাই। কেবল, সুশীলা মদ্ররাজকন্যা, ইহাই আছে। কৃষ্ণের সমসাময়িক মদ্ররাজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সপ্তদশ দিন, পরস্পরের শত্রুসেনা মধ্যে অবস্থিত। অনেক বার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে বলিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে শুনিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকেও শুনিতে হইয়াছে। এক পলক জন্য কিছুতেই প্রকাশ নাই যে, কৃষ্ণ শল্যের জামাতা বা ভগিনীপতি, বা তাদৃশ কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে বলিয়াছেন, 'অর্জুন ও বাসুদেবকে এখনই বিনাশ কর'। কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে শল্যবধে নিযুক্ত করিয়া তাহার যমস্বরূপ হইলেন। কৃষ্ণ যে মাদ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয়। শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা এবং লক্ষ্মণার কুলশীল, দেশ এবং বিবাহবৃত্তান্ত কিছুই কেহ জানে না। তাঁহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয় না।

কেন না, কেবল মাদ্রী নয়, জাম্ববতী, রোহিণী ও সত্যভামাকেও ঐরূপ দেখি। জাম্ববতীর সঙ্গে কালিন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাঁহার পুত্র শাম্বের নাম, আর পাঁচ জন যাদবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শাম্ব কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল এক লক্ষ্মণাহরণে। লক্ষ্মণা দুর্যোধনের কন্যা। মহাভারত যেমন পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত, তেমনি কৌরবদিগেরও জীবনবৃত্ত। লক্ষ্মণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে লক্ষ্মণাহরণ থাকিত। তাহা নাই। লক্ষ্মণাহরণ ভিন্ন যদুবংশধ্বংসেও শাম্বের নায়কতা দেখা যায়। তিনিই পেটে মুসল জড়াইয়া মেয়ে সাজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বলিয়াছি যে, এই মৌসলপর্ব প্রক্ষিপ্ত। মুসল-ঘটিত বৃত্তান্তটা অতিপ্রকৃত, এজন্য পরিত্যাজ্য। জাম্ববতীর বিবাহের পরে সুভদ্রার বিবাহ—অনেক পরে। সুভদ্রার পৌত্র পরিক্ষিৎ তখন ৩৬ বৎসরের, তখন যদুবংশধ্বংস।

সুতরাং যদুবংশধ্বংসের সময় শাম্ব প্রাচীন। প্রাচীন ব্যক্তির গর্ভিণী সাজিয়া ঋষিদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব। জাম্ববতী নিজে ভল্লুককন্যা, ভল্লুকী। ভল্লুকী কৃষ্ণভার্যা বা কোন মানুষের ভার্যা হইতে পারে না। এই জন্য রোহিণীকে কামরূপিণী বলা হইয়াছে। কামরূপিণী কেন না, ভল্লুকী হইয়াও মানবরূপিণী হইতে পারিতেন। কামরূপিণী ভল্লুকীতে আমি বিশ্বাসবান্ নহি, এবং কৃষ্ণ ভল্লুককন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না।

সত্যভামার পুত্র ছিল শুনি, কিন্তু তাঁহারা কোন কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। তাঁহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ। যবে সত্যভামা নিজে রুক্মিণীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে। তাঁহার বিবাহবৃত্তান্তও সবিস্তারে আলোচনা করা গিয়াছে।

মহাভারতের বনপর্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্বাধ্যায়ে সত্যভামাকে পাওয়া যায়। ঐ পর্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত; মহাভারতের বনপর্বের সমালোচনাকালে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। ঐখানে দ্রৌপদীসত্যভামা সংবাদ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্বাধ্যায় আছে, তাহাও প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিরূপ আচরণ কর্তব্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমাত্র। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক।

তার পর উদ্যোগপর্বেও সত্যভামাকে দেখিতে পাই—যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ে। সে স্থানও প্রক্ষিপ্ত, যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ের সমালোচনা কালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বরণ হইয়া উপপ্লব্য নগরে আসিয়াছিলেন—যুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন না, তাহা মহাভারত পড়িলেই জানা যায়। যুদ্ধপর্ব সকলে এবং তৎপরবর্তী পর্ব সকলে কোথাও আর সত্যভামার কথা নাই।

কেবল কৃষ্ণের মানবলীলাসম্বরণের পর, মৌসলপর্বে সত্যভামার নাম আছে। কিন্তু মৌসলপর্বও প্রক্ষিপ্ত, তাহাও পরে দেখাইব।

ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহে মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রক্ষিপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভামা সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ।

তার পর বিষ্ণুপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণে ইঁহার বিবাহবৃত্তান্ত স্যমন্তক মণির উপাখ্যানমধ্যে আছে। যে আষাঢ়ে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভল্লুকসুতার পরিণয়, ইঁহার

সঙ্গে পরিণয় সেই আষাঢ়ে গল্পে। তার পর কথিত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য দ্বেষবিশিষ্ট হইয়া শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাজিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, জতুগৃহদাহপ্রবাদ জন্য পাণ্ডবদিগের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভামা তাঁহার নিকট নালিশ করিয়া পাঠাইলেন। কথাটা মিথ্যা। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে যান নাই—গেলে মহাভারতে থাকিত। তাহা নাই। এই সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ।

তার পর, বিষ্ণুপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্তান্তে পাই। সেটা অনৈসর্গিক অলীক ব্যাপার; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাঁহাকে বিষ্ণুপুরাণে কোথাও পাই না। সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ।

মহাভারতে আদিপর্বে সম্ভব-পর্বাধ্যায়ে সপ্তষট্টি অধ্যায়ের নাম 'অংশাবতরণ'। মহাভারতের নায়কনায়িকাগণ কে কোন্ দেব দেবী অসুর রাক্ষসের অংশে জন্মিয়াছিল, তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। শেষ ভাগে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ, বলরাম শেষ নাগের অংশ প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচীর অংশ, কুন্তী ও মাদ্রী সিদ্ধি ও ধৃতির অংশ। কৃষ্ণমহিষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী অপ্সরাগণের অংশ এবং রুক্মিণী লক্ষ্মী দেবীর অংশ। আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর নাম নাই। সন্দেহের এই পঞ্চম কারণ। সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভামা সম্বন্ধে নহে। রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের সকল প্রধানা মহিষীদিগের প্রতি বর্তে। নরকের ষোড়শ সহস্র কন্যার অনৈসর্গিক কথাটা ছাড়িয়া দিলে, রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী ছিল না, ইহাই মহাভারতের এই অংশের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

ভল্লুকদৌহিত্র শাম্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা বাদ দিলে, রুক্মিণী ভিন্ন আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর পুত্র পৌত্র কাহাকেও কোন কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্মিণীবংশেই রাজা হইল—আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না।

এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না। এমন হইতেও পারে, ছিল। তখনকার এই রীতিই ছিল। পঞ্চ পাণ্ডবের সকলেরই একাধিক মহিষী ছিল। আদর্শ ধার্মিক ভীষ্ম, কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাশিরাজার তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনভিমত, এ কথাটাও কোথাও নাই; আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতে অধর্ম। ইহা নিশ্চিত বটে যে, সচরাচর অকারণে

পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্নী কুষ্ঠগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্ন যে, সে কোন মতেই সংসারধর্মের সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দারান্তপরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধর্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। আদালতে যে গৌরববৃদ্ধি হয়, তাহার উদাহরণ আমরা সভ্যতর সমাজে দেখিতে পাইতেছি। যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তা বুঝিতে পারি না। ইউরোপ যিহুদার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারান্তর গ্রহণ করিতে নাই। যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে, বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বর্জনরূপ অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেন্‌রীকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না। ইউরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এই কারণে অনেক পত্নীহত্যা, পতিহত্যা হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য, ঊর্ধাধঃ চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ত্ব একটা কথা।

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই, ইহা দেখিয়াছি। যদি করিয়া থাকেন, তবে কেন করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। যে যে তাঁহাকে স্যমন্তক মণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি একটি কন্যা উপহার দিল, ইহা পিতামহীর উপকথা। আর নরকরাজার ষোল হাজার মেয়ে, ইহা প্রপিতামহীর উপকথা। আমরা শুনিয়া খুসী—বিশ্বাস করিতে পারি না।

চতুর্থ খণ্ড

ইন্দ্রপ্রস্থ

কৃষ্ণচরিত্র

ইন্দ্রপ্রস্থ

অকুণ্ঠং সর্বকার্যেষু ধর্মকার্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য চ যদ্রূপং তস্মৈ কার্যাত্মনে নমঃ ||
শান্তিপর্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ—দ্রৌপদীস্বয়ংবর

মহাভারতের কৃষ্ণকথা যাহা আছে, তাহার কোন্ অংশ মৌলিক এবং বিশ্বাসযোগ্য, তাহার নির্বাচন জন্য প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমি পাঠককে সেই সকল স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

মহাভারতের কৃষ্ণকে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই। আমার বিবেচনায় এই অংশের মৌলিকতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। লাসেন্ সাহেব, দ্রৌপদীকে পাঞ্চালের পঞ্চ জাতির একীকরণস্বরূপ পাঞ্চালী বলিয়া, দ্রৌপদীর মানবীত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্নি হইতে দ্রুপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ঔরসকন্যা থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে অর্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তার পর, তাঁহার পাঁচ স্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।*

কৃষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখি। সেখানে তাঁহার দেবত্ব কিছুই সূচিত হয় নাই। অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তিনি ও অন্যান্য যাদবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া পাঞ্চালে আসিয়াছিলেন, তবে অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্যভেধে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবেরা কেহই সে চেষ্টা করে নাই।

পাণ্ডবেরা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া নহে। দুর্যোধন তাঁহাদিগের প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক্ষণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে এখানে উপস্থিত।

এই সমবেত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-মণ্ডল মধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছদ্মবেশযুক্ত পাণ্ডবদিগকে চিনিয়াছিলেন। ইহা যে তিনি দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এমন ইঙ্গিত মাত্র নাই। মনুষ্যবুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার উক্তিতেই ইহা প্রকাশ। তিনি বলদেবকে বলিতেছেন, “মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইঁহার নাম

বৃকোদর। ইত্যাদি। ইহার পরে সাক্ষাৎ হইলে যখন তাঁহাকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি প্রকারে তুমি আমাদিগকে চিনিলে?" তাহাতে তিনি উত্তর

করিয়াছিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কি লুকান থাকে?" পাণ্ডবদিগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে পারা অতি কঠিন, আর কেহ যে চিনিতে পারে নাই, তাহা বিস্ময়কর নহে, কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন— স্বাভাবিক মানুষবুদ্ধিতেই চিনিয়াছিলেন— ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই, কিন্তু কৃষ্ণের কার্যে সর্বত্র দেখিতে পাই যে, তিনি মনুষ্যবুদ্ধিতে কার্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনুষ্য। এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখা যায় না। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তিনি বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষ্য।

* পূর্বে বলিয়াছি যে, মহাভারতের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ব্যাসদেব ১৫০ শ্লোকে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচিত করিয়াছেন। ঐ অনুক্রমণিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা আছে, কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, এমন কথা নাই। অর্জুনই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাই আছে।

"সমবায়ে ততো রাজ্ঞং কন্যাং ভর্তৃস্বয়ংবরাম্।
প্রাপ্তবানর্জুনঃ কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ||" ১২৫ ||

অনন্তর অর্জুন লক্ষ্য বিঁধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাঁহার বড় বিবাদ বাধিল। অর্জুন ভিক্ষুকব্রাহ্মণবেশধারী। একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে, ইহা তাঁহাদিগের সহ্য হইল না। তাঁহারা অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। যত দূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অর্জুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনি কি প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিবাদ মিটাইবার অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যধিক প্রভৃতি অদ্বিতীয় বীরেরা তাঁহার সহায় ছিল। অর্জুন তাঁহার আত্মীয়—পিতৃষ্বসার পুত্র। তিনি যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অর্জুনের সাহায্যে নামিলে, তখনই বিবাদ মিটাইয়া যাইতে পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধার্মিক, যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা

নাই যে, কৃষ্ণ ধর্মার্থ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম। আমরা বাঙ্গালি জাতি, আজি সাত শত বৎসর সেই অধর্মের ফলভোগ করিতেছি। কৃষ্ণ কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্মস্থাপনজন্য তাঁহার যুদ্ধে আপত্তি ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অধর্ম। কেবল কাশীরাম দাস বা কথকঠাকুরদের কথিত মহাভারতে যাঁহাদের অধিকার, তাঁহাদের বিশ্বাস, কৃষ্ণই সকল যুদ্ধের মূল; কিন্তু মূল মহাভারত বুদ্ধিপূর্বক পড়িলে এরূপ বিশ্বাস থাকে না। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই নিজেও ধর্মার্থ ভিন্ন যুদ্ধ করেন নাই।

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না। তিনি বিবদমান ভূপালবৃন্দকে বলিলেন, "ভূপালবৃন্দ! ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" 'ধর্মতঃ'! ধর্মের কথাটা ত এতক্ষণ কাহারও মনে পড়ে নাই। সে কালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ধর্মভীত ছিলেন, রুচিপূর্বক কখন অধর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু এ সময়ে রাগান্ধ হইয়া ধর্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্মাত্মা, ধর্মবুদ্ধিই যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি এ বিষয়ের ধর্ম কোন্ পক্ষে, তাহা ভুলেন নাই। ধর্মবিস্মৃতদিগের ধর্মস্মরণ করিয়া দেওয়া, ধর্মানভিজ্ঞদিগকে ধর্ম বুঝাইয়া দেওয়াই, তাঁহার কাজ।

ভূপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, "ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন, অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" শুনিয়া রাজারা নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। পাণ্ডবেরা আশ্রমে গেলেন।

এক্ষণে ইহা বুঝা যায় যে, যদি একজন বাজে লোক দৃপ্ত রাজগণকে ধর্মের কথাটা স্মরণ করিয়া দিত, তাহা হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। যিনি ধর্মের কথাটা স্মরণ করিয়া দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবান্বিত। তিনি জ্ঞান, ধর্ম ও বাহুবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন। সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধান্য। সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত না হইলে, কেহই তাদৃশ ফলদায়িনী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা ধর্মতত্ত্ব পরিস্ফুট হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

অর্জুন লক্ষ্য বিঁধিয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন। রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কি করা কর্তব্য ছিল? দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ফুরাইল, উৎসব যাহা ছিল, তাহা ফুরাইল, কৃষ্ণের পাঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেই হইত। অন্যান্য রাজগণ তাহাই করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাহা না করিয়া, বলদেবকে সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভার্গবকর্মশালায় ভিক্ষুকবেশধারী পাণ্ডবগণ বাস করিতেছিলেন, সেইখানে গিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল না—যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁহার পূর্বে কখন সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না, কেননা মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, "বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণবন্দন পূর্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।" বলদেবও ঐরূপ করিলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্বে পরস্পরের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্ণ-পাণ্ডবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। কেবল পিতৃস্বসার পুত্র বলিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাজটা সাধারণ-লৌকিক-ব্যবহার-অনুমোদিত হয় নাই। লোকের প্রথা আছে বটে যে, পিসিত বা মাসিত ভাই যদি একটা রাজা বা বড়লোক হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন সামান্য ভিক্ষুক মাত্র, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আলাপ করিয়া কৃষ্ণও যে কোন লৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয়পূর্বক যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং তার পর পাণ্ডবদিগের বিবাহসমাপ্তি পর্যন্ত পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে, তিনি "কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদুর্য মণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্ঘ বসন, রমণীর শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন।" এ সকল পাণ্ডবদিগের তখন ছিল না, কেন না, তখন তাঁহারা ভিক্ষুক এবং দুরবস্থাপন্ন। অথচ এসকলে তখন তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন, কেন না, তাঁহারা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহী হইয়াছেন।

সুতরাং যুধিষ্ঠির "কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহ্লাদ পূর্বক গ্রহণ করিলেন।" কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। তারপর তিনি পাণ্ডবদিগকে আর খোঁজেন নাই। পাণ্ডবেরা রাজ্যার্ধ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে নগরনির্মাণপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন। যে প্রকারে পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি দুরবস্থাগ্রস্তমাত্রেরই হিতানুসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য মূর্খেরা এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ সেই কৃষ্ণকে কুকর্মানুরত, দুরভিসন্ধিযুক্ত ক্রূর এবং পাপাচারী বলিয়া, স্থির করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত্ন না থাকিলে, এইরূপ ঘটাই সম্ভব। স্থূল কথা এই, যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার অন্যান্য সদ্বৃত্তির ন্যায় প্রীতিবৃত্তিও পূর্ণবিকশিত ও স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে ব্যবহার করিলেন তাহা অনেকেরই পূর্ববর্ধিত সখ্যস্থলে করা সম্ভব। যুধিষ্ঠির কুটুম্ব; যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব হইতে তাঁহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম—বেশী বলিবার অধিকার থাকিত না। কিন্তু যিনি অপরিচিত এবঞ্চ দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন কুটম্বকে খুঁজিয়া লইয়া, আপনার কার্য ক্ষতি করিয়া, তাহার উপকার করেন, তাঁহার প্রীতি আদর্শ প্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্যটি ক্ষুদ্র কার্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যেই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্য বদ্‌মায়েসেও চেষ্টাচরিত্র করিয়া করিতে পারে, এবং করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার ছোট কাজগুলিও ধর্মাত্মার পরিচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্মাত্মা। তাই, আমরা মহাভারতের আলোচনায়ও* কৃষ্ণকৃত ছোট বড় সকল কার্যের সমালোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা এ প্রণালীতে কখন কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তাহা না করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কেবল "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং ঐতিহাসিক, তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া, যাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছি। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ"# কথার ব্যাপারটা যে মিথ্যা, তাহা দ্রোণবধ—পর্বাধ্যায় সমালোচনাকালে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

বৈবাহিক পর্বে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা তামাসার কথা ব্যাসোক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা আমাদিগের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত না হইলেও তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। দ্রুপদরাজ, কন্যার পঞ্চ স্বামী হইবে শুনিয়া তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। ব্যাস তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। খণ্ডনোপলক্ষে তিনি দ্রুপদকে একটি উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার। উহার স্থূল তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটি রোরুদ্যমানা সুন্দরী দর্শন করেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "তুমি কেন কাঁদিতেছ?" তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে, "আইস, দেখাইতেছি।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল যে, এক যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছে। তাহারা ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান না করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে যুবা পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাদেব। ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তিনিও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। ইন্দ্র গর্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাঁহার মত আর চারিটি ইন্দ্র আছেন! শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "তোমরা গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও।" সেই ইন্দ্রেরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, "ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন"!!! সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্দ্রাদির ঔরসে পঞ্চ পাণ্ডব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব হুকুম দিলেন যে, "তুমি গিয়া ইহাদিগের পত্নী হও।" সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কাঁদিয়াছিল, তাহার আর খবর নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথা শুনিবামাত্রই আপনার মাথা হইতে দুইগাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। একগাছি কাঁচা, একগাছি পাকা। পাকা-গাছটি বলরাম হইলেন, কাঁচা-গাছটি কৃষ্ণ হইলেন!!!

*হরিবংশ ও পুরাণ সকলে বিশ্বাসযোগ্য কথা পাওয়া যায় না বলিয়া পূর্বে ইহা পারি নাই।

পরে দেখিব, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই বুলিটাই মহাভারতে নাই। ইহা কথকঠাকুরের সংস্কৃত।

বুদ্ধিমান্ পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানটি, আমরা যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়াছি, তদন্তর্গত। অর্থাৎ ইহা মূল মহাভারতের কোন অংশ নহে। প্রথমতঃ, উপাখ্যানটির রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার

সর্বনিম্নশ্রেণীর উপন্যাসলেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরূপ উপাখ্যানসৃষ্টির মহাপাপে পাপী হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ নাই। এই উপাখ্যানটির সমুদায় অংশ উঠাইয়া দিলে, মহাভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট, অথবা কোন প্রয়োজনই অসিদ্ধ থাকিবে না। দ্রুপদরাজের আপত্তিখণ্ডনজন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই; কেন না, ঐ আপত্তি ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপাখ্যান ঐ অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং সরল এবং আদিম মহাভারতের অন্তর্গত হইলে হইতে পারে। প্রথমোক্ত উপাখ্যানটি ইহার বিরোধী। দুইটিতে দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। সুতরাং একটি যে প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং যাহা উপরে বলিয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানটিই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের অন্যান্য অংশের বিরোধী। মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে যে, পাণ্ডবেরা ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদিগের ঔরসপুত্র মাত্র। এখানে সকলেই এক একজন ইন্দ্র। এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গর্দভ লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রেরা মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন "ইন্দ্রাদিই আসিয়া আমাদিগকে মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন।" জগদ্বিজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গর্দভের লেখনীপ্রসূত নহে, উহা নিশ্চিত।

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, তাহা উদাহরণের দ্বারা পাঠককেই বুঝাই। তাছাড়া একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বও ইহা দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়। যে বিষ্ণু, বেদে সূর্যের মূর্তিবিশেষ মাত্র, পুরাণেতিহাসের উচ্চস্তরে যিনি সর্বব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি, গোঁপ, কাঁচা চুল, পাকা চুল প্রভৃতি ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দুধর্মের অবনতির ইতিহাস পড়িতে পাই। তাই এই স্থানে ইহা উল্লেখ করিলাম। কোন কৃষ্ণদ্বেষী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান রচিত হইয়া মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও করা যাইতে পারে। কেন না, এখানে মহাদেবই সর্বনিয়ন্তা এবং

কৃষ্ণ নারায়ণের একটি কেশ মাত্র। মহাভারতের আলোচনায় কৃষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাই। এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করিবার কারণ পাই। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, এই বিবাদ আদিম মহাভারতের প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন শিবোপাসনা ও কৃষ্ণোপাসনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহাভারতপ্রচারের সময়ে বা তাহার পরবর্তী প্রথম কালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল না। সে সময়টা বেদের দেবতার প্রবলতার সময়। যত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাধিল—তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের দোহাই দিয়া আপনার দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা শিবমাহাত্ম্যসূচক রচনা সকল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিল।* তদুত্তরে বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু বা কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক সেইরূপ রচনা সকল গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন। অনুশাসন-পর্বে এই কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে, পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। প্রায় সকলগুলিতেই একটু একটু গর্দভের গাত্রসৌরভ আছে।

* সেইগুলি অবলম্বন করিয়া মূর প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ কৃষ্ণকে শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কৃষ্ণচরিত্র

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সুভদ্রাহরণ

দ্রৌপদীস্বয়ংবরের পর, সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সুভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের উপর, একটা জগদীশ্বরের নীতিশাস্ত্র আছে— তাহা সকল শতাব্দীতে, সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অভ্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এ দেশে অনেকেই একব্বরি গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জমীদারেরা এখনকার ছোট সরকারি গজে মাপিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাহার জ্বালায় আমরা ঐতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইতেছি, ইহা অনেক বার বলিয়াছি। আমরা এক্ষণে সেই একব্বরি গজ চালাইব।

কৃষ্ণভক্তেরা বলিতে পারেন, এরূপ একটা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর যে, এই সুভদ্রাহরণবৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত, কি প্রক্ষিপ্ত। যদি ইহা প্রক্ষিপ্ত এবং আধুনিক বলিয়া বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথা বলিলেই সব গোল মিটিল—এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, সুভদ্রাহরণ যে মূল মহাভারতের অংশ, ইহা যে প্রথম স্তরের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নাই। ইহার প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে আছে। ইহার রচনা অতি উচ্চশ্রেণীর কবির রচনা। দ্বিতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর অতি সুন্দর। তবে প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একটা প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচনা সরল ও স্বাভাবিক দ্বিতীয় স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অত্যুক্তির বড় বাহুল্য। সুভদ্রাহরণের রচনাও সরল ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও অত্যুক্তির তেমন বাহুল্য নাই। সুতরাং ইহা প্রথমস্তর-গত—দ্বিতীয় স্তরের নহে। আর আসল কথা এই যে, সুভদ্রাহরণ মহাভারত হইতে তুলিয়া লইলে, মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। সুভদ্রা হইতে অভিমন্যু, অভিমন্যু হইতে পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিৎ হইতে জনমেজয়। ভদ্রার্জুনের বংশই বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে সাম্রাজ্য শাসিত করিয়াছিল— দ্রৌপদীর বংশ নহে। বরং দ্রৌপদীস্বয়ংবর বাদ দেওয়া যায়, তবু সুভদ্রা নয়।

দ্রৌপদীর ন্যায় সুভদ্রাকেও সাহেবরা উড়াইয়া দিয়াছেন। লাসেন্ বলেন,— যাদবসম্প্রীতিরূপ যে মঙ্গল, তাহাই সুভদ্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষা

গুরুতর। তিনি কেন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার মানবীত্ব অস্বীকৃত করেন, তজ্জন্য যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনীশাখা ২৩ অধ্যায়ের ১৮ কণ্ডিকার ৪র্থ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিতে হইতেছে।

"হে অম্বে! হে অম্বিকে! হে অম্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্য নিদ্রিত হইয়াছে, আমি কাম্পিলাবাসিনী সুভদ্রা হইয়াও স্বয়ং ইহার সমীপে (পতীত্বে বরণ করণার্থ) সমাগত হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই।"*

"Kampila is a town in the country of the Panchalas. Subhadra, therefore, would seem to be the wife of the King of that district." &c.

* শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রয়ী কৃত অনুবাদ।

সায়নাচার্য কাম্পিলবাসিনীর এইরূপ অর্থ করেন— "কাম্পিলশব্দেন শ্ল্যাঘ্যো বস্ত্রবিশেষ উচ্যতে" কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়নাচার্যের অপেক্ষা সংস্কৃত বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করেন না, তাহা না-ই করুন, কিন্তু কাম্পিলবাসিনী কোন স্ত্রীর নাম সুভদ্রা ছিল বলিয়া কৃষ্ণভগিনীর নাম কেন সুভদ্রা হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তাঁহারই মহিষীকে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তাঁহাকেই বলিতে হইবে, "আমি কাম্পিলবাসিনী সুভদ্রা"। সুভদ্রা শব্দে সামশ্রয়ী মহাশয় এই অর্থ করেন,—কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী। মহীধর বলেন,—কাম্পিলনগরীর মহিলাগণ অতিশয় রূপলাবণ্যবতী। অতএব এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, "আমি সৌভাগ্যবতী ও রূপলাবণ্যবতী হইয়াও এই অশ্বের নিকট সমাগত হইয়াছি।" অতএব বুঝিতে পারি না যে, এই মন্ত্রের বলে কৃষ্ণভগিনী অর্জুনপত্নী সুভদ্রার পরিবর্তে কেন একজন পাঞ্চালী সুভদ্রাকে কল্পনা করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বহুপূর্ববর্তী রাজগণও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহাই মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতএব ইহাই সম্ভব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের এই যজুর্মন্ত্র কৃষ্ণ-পাণ্ডবের অপেক্ষা প্রাচীন। এখন যেমন লোকে আধুনিক লেখকদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুত্রকন্যার নামকরণ করিতেছে,* তেমনি সে কালেও বেদ হইতে লোকের পুত্রকন্যার নাম রাখা অসম্ভব নহে। এই মন্ত্র হইতেই কাশিরাজ আপনার তিনটি কন্যার নাম অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা রাখিয়া থাকিবেন, এবং এইরূপেই

কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রারও নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই মন্ত্রে এমন কিছু দেখি না যে, তজ্জন্য কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা কেহ ছিলেন না, এমন কথা অনুমান করা যায়। অতএব আমরা সুভদ্রাহরণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

এক্ষণে, সুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা অনুরোধ আছে। তিনি কাশীদাসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট, অথবা পিতামহীর মুখে, অথবা বাঙ্গালা নাটকাদিতে যে সুভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহপূর্বক ভুলিয়া যাউন। অর্জুনকে দেখিয়া সুভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, সত্যভামা মধ্যবর্তিনী দূতী হইলেন, অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সুভদ্রা তাঁহার সারথি হইয়া গগনমার্গে তাঁহার রথ চালাইতে লাগিলেন— সে সকল কথা ভুলিয়া যান। এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাঁহার সৃষ্টি কি তাঁহার পরবর্তী কথকদিগের সৃষ্টি, তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার সুভদ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, তাহার স্থূলমর্ম বলিতেছি।

দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে রাজ্য করিতেছিলেন, কোন কারণে অর্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগপূর্বক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য দেশপর্যটনানন্তর শেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবেরা তাঁহার বিশেষ সমাদর ও সৎকার করেন। অর্জুন কিছু দিন সেখানে অবস্থিতি করেন। একদা যাদবেরা রৈবতক পর্বতে একটা মহান্ উৎসব আরম্ভ করেন। সেখানে যদুবীরেরা ও যদুকুলাঙ্গনাগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সুভদ্রাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিকা। অর্জুন তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া অর্জুনকে বলিলেন, “সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে?” অর্জুন অপরাধ স্বীকার করিয়া, সুভদ্রা যাহাতে তাঁহার মহিষী হন, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন তাহা এই :—

* যথা- প্রমীলা, মৃণালিনী ইত্যাদি।

হে অর্জুন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের

প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবরকালে উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ, স্বয়ংবরকালে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে?”

এই পরামর্শের অনুবর্তী হইয়া অর্জুন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমতি আনিতে দূত প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা, সুভদ্রা যখন রৈবতক পর্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া রথে তুলিয়া অর্জুন প্রস্থান করিলেন।

এখন, আজিকালিকার দিনে যদি কেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ যদি অপর কাহাকে বলে, “মহাশয়! যখন আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করুন, ইহাই আমার পরামর্শ”, তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতিশাস্ত্রানুসারে (সে নীতিশাস্ত্রের কিছুমাত্র দোষ দিতেছি না,) কৃষ্ণার্জুন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া কৃষ্ণকে বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে সুভদ্রাহরণপর্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া, কিম্বা এমনই একটা কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়া যাইতাম। কিন্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায়, কাহারও মহিমা বাড়িতে পারে না এবং ধর্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না।

কিন্তু কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিলে, সেটা দোষ বলিয়া গণিতে হয় কেন? তিন কারণে। প্রথমতঃ, অপহৃতা কন্যার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ কন্যার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর অত্যাচার। তৃতীয়তঃ সমাজের উপর অত্যাচার। সমাজরক্ষার মূলসূত্র এই যে, কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত করা হইল। বিবাহার্থিকৃত কন্যাহরণকে নিন্দনীয় কার্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর চতুর্থ কারণ কিছু নাই।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, অপহৃতা কন্যার উপর কতদূর অত্যাচার

হইয়াছিল দেখা যাক। কৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে সুভদ্রার সর্বতোভাবে মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার কর্তব্য— তাহাই তাঁহার ধর্ম—ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাঁহার "Duty" এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল— সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল বলিলেও হয়— সৎপাত্রস্থ হওয়া। অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান "ডিউটি"— তিনি যাহাতে সৎপাত্রস্থা হয়েন, তাহাই করা। এখন, অর্জুনের ন্যায় সৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিতি ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, ইহা বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। অতএব তিনি যাহাতে অর্জুনের পত্নী হইবেন, ইহাই সুভদ্রার মঙ্গলার্থ কৃষ্ণের করা কর্তব্য। তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপূর্বক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই কর্তব্য সাধন হইতে পারিত কিনা, তাহা সন্দেহস্থল। যেখানে ভাবিফল চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে যে পথে সন্দেহ, সে পথে যাইতে নাই। যে পথে মঙ্গলসিদ্ধি নিশ্চিত, সেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ, সুভদ্রার চিরজীবনের পরম শুভ সুনিশ্চিত করিয়া দিয়া, তাহার প্রতি পরম ধর্মানুমত কার্যই করিয়াছিলেন— তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই।

এ কথার প্রতি দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও, আমার উপর বলপ্রয়োগ করিয়া সে কার্যে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরোহিত মহাশয় মনে করেন যে, আমি যদি আমার সর্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করি, তবে আমার পরম মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাঁহার এমন কোন অধিকার নাই যে, আমাকে মারপিট করিয়া সর্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করান। শুভ উদ্দেশ্যের সাধন জন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও নিন্দনীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ এই যে, "The end does not sanctify the means."

এ কথার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, সুভদ্রার যে অর্জুনের প্রতি অনিচ্ছা বা বিরক্তি ছিল, এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। প্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা বড় অল্প। হিন্দুর ঘরের কন্যা— কুমারী এবং বালিকা—পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বড় প্রকাশ করে না। বাস্তবিক, তাহাদের মনেও বোধ হয়, পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে পুষিয়া রাখিলে জন্মিতে পারে। এখন, যদি কোন কাজে আমার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর

হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির অভাবে বা লজ্জাবশতঃ বা উপায়াভাববশতঃ আমি সে কার্য স্বয়ং করিতেছি না, এমন হয়, আর যদি আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাণ করিলে সেই পরম মঙ্গলকর কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়োগ কি অধর্ম? মনে কর, একজন বড় ঘরের ছেলে দুরবস্থায় পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু বড় ঘর বলিয়া তাহাতে তেমন ইচ্ছা নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া চাকরিতে বসাইয়া দিলে আপত্তি করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়া বাঁচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া দুটো ধমক দিয়া তাহাকে দফ্‌তরখানাতে বসাইয়া দেওয়া কি তোমার অধর্মাচরণ বা পীড়ন করা হইবে? সুভদ্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, বুঝাইয়া বলিলে, কি "এসো গো" বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া লইয়া যাওয়ার ভাণ ভিন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়ান্তর ছিল না।

"আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই।" এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে, আমরা বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম। প্রথম উত্তরে আমরা ঐ আপত্তির কথাটা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছি। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্যে আমার পরম মঙ্গল, সে কার্যে আমার অনিচ্ছা থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল সময়ে খাটে না। যে রোগীর রোগপ্রভাবে প্রাণ যায়, কিন্তু ঔষধে রোগীর স্বভাবসুলভ বিরাগবশতঃ সে ঔষধ খাইবে না, তাহাকে বলপূর্বক ঔষধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে ইচ্ছাপূর্বক কাটাইবে না— জোর করিয়া কাটিবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে লেখাপড়া শিখিবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাতা প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত বিবাহে উদ্যত হয়, বলপূর্বক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মাতার অধিকার নাই? আজিও সভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে জোর করিয়া সৎপাত্রে কন্যাদান করার প্রথা আছে। যদি পনের বৎসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন সুপাত্রে আপত্তি উপস্থিত করে, তবে কোন্ পিতা মাতা জোর করিয়া তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে আপত্তি করিবেন? জোর করিয়া বালিকা কন্যা সৎপাত্রস্থ করিলে

তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? যদি না হন, তবে সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন?

এই গেল প্রথম আপত্তির দুই উত্তর। এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই।

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার করা গেল যে, কৃষ্ণ সুভদ্রার মঙ্গলকামনা করিয়াই, এই পরামর্শ দিয়াছিলেন— কিন্তু বলপূর্বক হরণ ভিন্ন কি তাঁহাকে অর্জুনমহিষী করিবার জন্য অন্য উপায় ছিল না? স্বয়ম্বরে যেন ভয় ছিল, যেন মূঢ়মতি বালিকা কেবল মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কোন অপাত্রে বরমাল্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপায়ান্তর কি ছিল না? কৃষ্ণ কি অর্জুন বাসুদেব প্রভৃতি কর্তৃপক্ষের কাছে কথা পাড়িয়া রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইতে পারিতেন। যাদবেরা কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাঁহার কথায় অমত করিত না। এবং অর্জুন সুপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না, তবে না হইল কেন?

এখনকার দিনকাল হইলে, এ কাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রার্জুনের বিবাহ চারি হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল, তখনকার বিবাহপ্রথা এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল না, সেই বিবাহপ্রথা না বুঝিলে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব না।

মনুতে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আর্য, (৪) প্রাজাপত্য, (৫) আসুর, (৬) গান্ধর্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। এই ক্রমান্বয়টা পাঠক মনে রাখিবেন।

এই অষ্টপ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্ কোন্ বিবাহে অধিকার, দেখা যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,

ষড়ানুপূর্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোহ বরান্।

ইহার টীকায় কুল্লূটভট্ট লেখেন, "ক্ষত্রিয়স্য অবরানুপরিতনানাসুরাদীংশ্চতুরঃ।" তবেই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, কেবল আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ, এই চারি প্রকার বিবাহ বৈধ। আর সকল অবৈধ।

কিন্তু ২৫ শ্লোকে আছে—

পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্তব্যৌ কদাচন॥

পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সকলেরই অকর্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্ধর্ব ও রাক্ষস, এই দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল।

তন্মধ্যে, বরকন্যার উভয়ে পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্ধর্ব বিবাহ। এখানে সুভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ "কামসম্ভব", সুতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণার্জুনের তাহা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে না। অতএব রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানুসারে এই রাক্ষস বিবাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ। মনুর ৩ অ, ২৪ শ্লোকে আছে—

চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ||

যে বিবাহ ধর্ম্ম্য ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগিনীপতির গৌরবার্থ নিজকুলের গৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অর্জুনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরম শাস্ত্রজ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা, অভ্রান্তবুদ্ধি এবং সর্বপক্ষের মানসম্ভ্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মনুর দোহাই দিলে চলিবে না। মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে মনুসংহিতা ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা ন্যায্য বটে, তত প্রাচীনকালে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে। তবে মনুসংহিতা পূর্বপ্রচলিত রীতি-নীতির সঙ্কলন মাত্র, ইহা পণ্ডিতদিগের মত। যদি তাহা হয়, তবে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে ঐরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। নাই পারুক—মহাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা যাউক। এই সুভদ্রাহরণ-পর্বাধ্যায়েই সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড় বেশী খুঁজিত হইবে না। আমরা পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃষ্ণ নিজেই সেই উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া যাদবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া রণসজ্জা করিতেছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত গণ্ডগোল করিবার আগে, কৃষ্ণ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুপ করিয়া আছেন। তখন বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া,

অর্জুন তাঁহাদের বংশের অপমান করিয়াছে বলিয়া রাগ প্রকাশ করিলেন, এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন—

"অর্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়া অর্থদ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যা লাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া বলপূর্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোচিত হইয়াছে, এবং কুলশীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্বক হরণ করিয়াছেন বলিয়া সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন, সন্দেহ নাই।"

এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন;—

১। অর্থ (বা শুল্ক) দিয়া বিবাহ করা যায় (আসুর)।

২। স্বয়ংবর

৩। পিতা মাতা কর্তৃক প্রদত্তা কন্যার সহিত বিবাহ (প্রাজাপত্য)।

৪। বলপূর্বক হরণ (রাক্ষস)।

ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের অকীর্তি ও অযশ, ইহা সর্ববাদিসম্মত। দ্বিতীয়ের ফল অনিশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমাত্র বিহিত বিবাহ। ইহা কৃষ্ণোক্তিতেই প্রকাশ আছে।*

* মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে যে বিবাহতত্ত্ব আছে, তাহার আমরা কোন উল্লেখ করিলাম না, কেন না, উহা প্রক্ষিপ্ত। সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভীষ্ম কর্তৃক নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভীষ্ম স্বয়ং কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং ভীষ্মের রাক্ষস বিবাহকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বলা সম্ভব নহে। ভীষ্মের চরিত্র এই যে, যাহা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত, তাহা তিনি প্রাণান্তেও করিতেন না। যে কবি তাঁহার চরিত্র সৃষ্ট করিয়াছেন, সে কবি কখনই তাঁহার মুখ দিয়া এ কথা বাহির করেন নাই।

ভরসা করি, এমন নির্বোধ কেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত করেন যে, আমি রাক্ষস বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। রাক্ষস বিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথা বলিয়া স্থান নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সে কালে যে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত

ছিল, কৃষ্ণ তাহার দায়ী নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, "রিফর্মরই" আদর্শ মনুষ্য, এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবারি ধরনের রিফর্মর্ হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারি ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না, সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না।

আমরা বলিয়াছি যে, বলপূর্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহা তিন কারণে নিন্দনীয়; (১) কন্যার প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রতি অত্যাচার, (৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। কন্যার প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাহার পিতৃকুলের প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কিনা, দেখা যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ করিতে হইবে। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া আসিয়াছে।

কন্যাহরণে তৎপিতৃকুলের উপর দুই কারণে অত্যাচার ঘটে। (১) তাঁহাদিগের কন্যা অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাত্রে হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। অর্জুন অপাত্রও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে। (২) তাঁহাদিগের নিজের অপমান। কিন্তু পূর্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাদবেরা অপমানিত হইয়াছেন বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার সেকথা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর যাদবেরা অর্জুনকে ফিরাইয়া আনিয়া সমারোহপূর্বক তাঁহার বিবাহকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা বলিবার আমাদের আর আবশ্যকতা নাই।

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজমধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল, কিন্তু যখন তাৎকালিক আর্যসমাজ ক্ষত্রিয়কৃত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হইল। যাহা সমাজসম্মত, তদ্দ্বারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই।

আমরা এই তত্ত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে। সুভদ্রাহরণের জন্য কৃষ্ণদ্বেষীরা কৃষ্ণকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জন্য কৃষ্ণপক্ষ সমর্থনের কোন আবশ্যকতা ছিল না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মাপকাটিটি আমরা ধার করিয়া আনিয়াছি, সে মাপকাটিতে মাপিলে,

আমাদিগের পূর্বপুরুষাগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশই বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। আমাদিগের সেই একব্বরি গজ বাহির করা চাই।

কৃষ্ণচরিত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—খাণ্ডবদাহ

সুভদ্রাহরণের পরে খাণ্ডবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের রাজধানীর নিকট খাণ্ডব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল কৃষ্ণার্জুন তাহা দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্তান্তটি এই। গল্পটা বড় আষাঢ়ে রকম।

পূর্বকালে শ্বেতকি নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বড় যাজ্ঞিক ছিলেন। চিরকালই যজ্ঞ করেন। তাঁহার যজ্ঞ করিতে করিতে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণেরা হয়রাণ হইয়া গেল। তাহারা আর পারে না— সাফ জবাব দিয়া সরিয়া পড়িল। রাজা তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিলেন— তাহারা বলিল, "এ রকম কাজ আমাদের দ্বারা হইতে পারে না— তুমি রুদ্রের কাছে যাও।" রাজা রুদ্রের কাছে গেলেন— রুদ্র বলিলেন, "আমরা যজ্ঞ করি না— এ কাজ ব্রাহ্মণের। দুর্বাসা এক জন ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি আমারই অংশ— আমি তাঁহাকে বলিয়া দিতেছি।" রুদ্রের অনুরোধে, দুর্বাসা রাজার যজ্ঞ করিলেন। ঘোরতর যজ্ঞ— বার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত অগ্নিতে ঘৃতধারা। ঘি খাইয়া অগ্নির Dyspepsia উপস্থিত। তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! বড় বিপদ, খাইয়া খাইয়া শরীরের বড় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন উপায় কি?" ব্রহ্মা যে রকম ডাক্তারি করিলেন তাহা Similia Similibus Curanter হিসাবে। তিনি বলিলেন, "ভাল , খাইয়া যদি পীড়া হইয়া থাকে, তবে আরও খাও। খাণ্ডব বনটা খাইয়া ফেল—পীড়া আরাম হইবে।" শুনিয়া অগ্নি খাণ্ডব বন খাইতে গেলেন। চারি দিকে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু বনে অনেক জীবজন্তু বাস করিত— হাতীরা শুঁড়ে করিয়া জল আনিল, সাপেরা ফণা করিয়া জল আনিল, এই রকম বনবাসী পশুপক্ষিগণ মিলিয়া আগুন নিবাইয়া দিল। আগুন সাত বার জ্বলিলেন, সাত বার তাহারা নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণার্জুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, তোমরা আমাকে খাওয়াইতে পার?" তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় দিয়া ছোট রকমের প্রার্থনা জানাইলেন— "খাণ্ডব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিয়া আমাকে নিবাইয়া দিয়াছে— খাইতে দেয় নাই।" তখন কৃষ্ণার্জুন অস্ত্র ধরিয়া বন পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অর্জুনের বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমরা কলিকালের লোক তাহা বুঝিতে পারি না। পারিলে, অতিবৃষ্টিতে ফসল রক্ষার একটা

উপায় করা যাইতে পারিত। যাই হোক—ইন্দ্র চটিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সব দেবতা অস্ত্র লইয়া তাঁহার সহায় হইলেন। কিন্তু অর্জুনকে আঁটিয়া উঠিবার যো নাই। ইন্দ্র পাহাড় ছুঁড়িয়া মারিলেন—অর্জুন বাণের চোটে পাহাড় কাটিয়া ফেলিলেন। (বিদ্যাটা এখনকার দিনে জানা থাকিলে রেইল্ওয়ে টনেল্ করিবার বড় সুবিধা হইত।) শেষ ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে উদ্যত— তখন দৈববাণী হইল যে, ইহারা নরনারায়ণ প্রাচীন ঋষি।* দৈববাণীটা বড় সুবিধা— কে বলিল, তার ঠিকানা নাই— কিন্তু বলিবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দৈববাণী শুনিয়া দেবতারা প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণার্জুন স্বচ্ছন্দে বন পোড়াইতে লাগিলেন। আগুনের ভয়ে পশুপক্ষী পলাইতেছিল, সকলকে তাঁহারা মারিয়া ফেলিলেন। তাহাদের মেদ মাংস খাইয়া অগ্নির মন্দাগ্নি ভাল হইল—বিষে বিষক্ষয় হইল—তিনি কৃষ্ণার্জুনকে বর দিলেন, পরাভূত দেবতারা আসিয়াও বর দিলেন। সকল পক্ষ খুসী হইয়া ঘরে গেলেন।

* পাঠক দেখিয়াছেন, এক স্থানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর কেশ; এখানে প্রাচীন ঋষি, আবার দেখিব, তিনি বিষ্ণুর অবতার। এ কথার সামঞ্জস্যচেষ্টায় বা খণ্ডনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রই আমাদের সমালোচ্য।

এরূপ আষাঢ়ে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাড়া করিয়া ঐতিহাসিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়—অন্য লাভ নাই। আর আমাদের যাহা সমালোচ্য—অর্থাৎ কৃষ্ণচরিত্র,—তাহার ভালমন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই। যদি ইহার কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য থাকে, তবে সেটুকু এই যে, পাণ্ডবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল, সেখানে অনেক হিংস্র পশু বাস করিত, কৃষ্ণার্জুন তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণার্জুন যদি তাই করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐতিহাসিক কীর্তি বা অকীর্তি কিছুই দেখি না। সুন্দরবনের আবাদকারীরা নিত্য তাহা করিয়া থাকে।

আমরা স্বীকার করি যে, এ ব্যাখ্যাটা নিতান্ত টাল্বয়স হুইলরি ধরণের হইল। কিন্তু আমরা যে এরূপ একটা তাৎপর্য সূচিত করিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ আছে। খাণ্ডবদাহটা অধিকাংশ তৃতীয় স্তরান্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু স্থূল ঘটনার কোন সূচনা যে আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এবং অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাণ্ডবদাহ হইতে সভাপর্বের উৎপত্তি। এই বনমধ্যে ময়দানব বাস করিত। সেও পুড়িয়া

মরিবার উপক্রম হইয়াছিল। সে অর্জুনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল ; অর্জুনও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার জন্য ময়দানব পাণ্ডবদিগের অত্যুৎকৃষ্ট সভা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সভা লইয়া সভাপর্বের কথা।

এখন সভাপর্ব অষ্টাদশ পর্বের এক পর্ব। মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে। ইহা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা এবং তদুপলক্ষে রাজসূয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই আপত্তি দেখা যায় না। যদি সভা ঐতিহাসিক হইল, তবে তাহার নির্মাতা এক জন অবশ্য থাকিবে। মনে কর, সেই কারিগর বা এঞ্জিনিয়রের নাম ময়। হয়ত সে অনার্যবংশীয়—এজন্য তাহাকে ময়দানব বলিত। এমন হইতে পারে যে, সে বিপন্ন হইয়া অর্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতাবশতঃ এই এঞ্জিনিয়রী কাজটুকু করিয়া দিয়াছিল। যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে সে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া অর্জুনকৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা কেবল খাণ্ডবদাহেই পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকারে ঢিল মারা। তবে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বই এইরূপ অন্ধকারেও ঢিল।

হয়ত, ময়দানবের কথাটা সমুদায়ই কবির সৃষ্টি। তা যাই হৌক, এই উপলক্ষে কবি যে ভাবে কৃষ্ণার্জুনের চরিত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। তাহা না লিখিয়া থাকা যায় না। ময়দানব প্রাণ পাইয়া অর্জুনকে বলিলেন, "আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?" অর্জুন কিছু প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল প্রীতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ময়দানব ছাড়ে না; কিছু কাজ না করিয়া যাইবে না। তখন অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন,—

"হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমার দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না।"

ইহাই নিষ্কাম ধর্ম ; খ্রীষ্টান ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেল যে ধর্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে, স্বর্গ বা ঈশ্বর-প্রীতি তাহার কাম্য। আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া

পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থ হইতে যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। অর্জুনবাক্যের অপরার্ধে এই নিষ্কাম ধর্ম আরও স্পষ্ট হইতেছে। ময় যদি কিছু কাজ করিতে পারিলে মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অর্জুন তাহাকে বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছুক। অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।"

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতে হয়, তবে সেও পরের কাজ। আপনার কাজ লওয়া হইবে না।

তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন—কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় "দানবকুলের বিশ্বকর্মা"—বা চীফ্ এঞ্জিনিয়র। কৃষ্ণও তাঁহাকে আপনার কাজ করিতে আদেশ করিলেন না। বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরের একটা সভা নির্মাণ কর। এমন সভা গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে।"

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে—অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, কৃষ্ণস্বজীবনে দুইটি কার্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্যসংস্থাপন। ধর্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নির্মাণ ধর্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম সূত্র। এইখানেই তাঁহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্মরাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল। ধর্মরাজ্যসংস্থাপন, জগতের কাজ ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভাসংস্থাপন তাঁহার নিজের কাজ।

গত অধ্যায়ে সমাজসংস্করণের কথাটা উঠিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি সমাজসংস্থাপন বা Social Reformer হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জীবন (Moral and Political Regeneration), ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্যসংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে সমাজসংস্কার আপনি ঘটিয়া উঠে—ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ মনুষ্য তাহা জানিতেন,—জানিতেন, গাছের পাট না করিয়া কেবল একটা ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না। আমরা তাহা জানি না-আমরা তাই সমাজসংস্করণকে একটা পৃথক জিনিস বলিয়া খাড়া করিয়া গণ্ডগোল উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক কারণ। সমাজসংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়—বিশেষ সংস্করণপদ্ধতিটা যদি ইংরেজি ধরনের হয়। আর যার কাজ নাই, হুজুক

তার বড় ভাল লাগে। সমাজসংস্করণ আর কিছুই হউক বা না হউক, একটা হুজুক বটে। হুজুক বড় আমোদের জিনিস। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজসংস্কার কিসের জোরে হইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্মের উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাজসংস্করণের পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না। তা না করিলে, কিছুতেই সমাজসংস্কার হইবে না। তাই আদর্শ মনুষ্য মালাবারি হইবার চেষ্টা করেন নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের মানবিকতা

কৃষ্ণচরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষী প্রকৃতিরই সমালোচনা করিতেছি। তিনি ঈশ্বর কি না, তাহা আমি কিছু বলিতেছি না। সে কথার সঙ্গে পাঠকের কোন সম্বন্ধ নাই। কেন না, আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে মত গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ করা না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধির ও চিত্তের উপর নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না। স্বর্গ জেলখানা নহে—তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, এ কথা আমি মনে করি না। ধর্ম এক বস্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌছিবার অনেক পথ আছে—কৃষ্ণভক্ত এবং খ্রীষ্টীয়ান উভয়েই সেখানে পৌঁছিতে পারে।[*] অতএব কেহ কৃষ্ণধর্ম গ্রহণ না করিলে, আমি তাঁহাকে পতিত মনে করিব না, এবং ভরসা করি যে, কৃষ্ণদ্বেষী বা প্রাচীন বৈষ্ণবের দল আমাকে নিরয়গামী বলিয়া ভাবিবেন না।

আমাদের এখন বলিবার কথা এই, আমরা তাঁহার মানুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোচন করিতেছি। আমরা তাঁহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি। ইহাতে তাঁহার মনুষ্যাতীত কোন প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশ মাত্র প্রতিষিদ্ধ হইল। বলিয়াছি, এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শমনুষ্য স্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাই হয়, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুষিক কার্য করিবেন। তিনি কখনও কোন লোকাতীত শক্তির দ্বারা কোন লৌকিক বা অলৌকিক কার্য নির্বাহ করিবেন না। কেন না, মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়া স্বকার্য সাধন করিলেন, তিনি আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারিলেন না। যে শক্তি মনুষ্যের নাই, তাহার অনুকরণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে?[#]

অতএব শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা অমানুষী কার্যসিদ্ধি সম্ভবে না। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্ষিপ্ত কি না, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে করিব। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন না।[!] কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, তাঁহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি আছে। কেহ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কাথর অনুমোদন করেন নাই, বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। বরং এক স্থানে তিনি স্পষ্টই

বলিয়াছেন, “আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।”!!

* “ধর্মর অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না।”-মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৭৪ অ।

“We forget that Christ incarnate was such as we are, and some of us are putting him where he can be no example to us at all. Let no fear losing the dear great truth of the divinity of Jesus make you lose the dear great truth of the humanity of Jesus. He took upon himself our nature; as a man of the like passions, he fought that terrible fight in the wildereness; year by year, as an innocent man, was he persecuted by narrow-hearted Jews; and his was a humanity whose virtue was pressed by all the needs of the multitude and yet kept its richness of nature; a humanity which, though given up to death on the cross, expressed all that is within the capacity of our own humanity; and if we really follow him we shall be holy even as he is holy.”

Sermon by Dr. Brookly, delivered at Trinity Church, Boston, March 29th, 1885.

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বলি।

! যে দুই এক স্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও যথাস্থানে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

!! অহং হি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকারতঃ।
দৈবং তু ন ময়া শক্যং কর্ম কর্তুং কথঞ্চন ||
উদ্দ্যোগপর্ব, ৭৮ অধ্যায়।

তিনি যত্নপূর্বক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে যে, আমি একটা দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত আচারের উপর চড়ে, কৃষ্ণে সে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। এই সকল কথার

উদারহণস্বরূপ তিনি খাণ্ডবদাহের পর যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যখন দ্বারকা যাত্রা করেন, তখন তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা অত্যন্ত মানুষিক।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব পরম প্রীত পাণ্ডবগণ কর্তৃক অভিপূজিত হইয়া কিয়দ্দিন খাণ্ডবগ্রস্থে বাস করিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃষ্বসা কুন্তী দেবীর চরণবন্দনা করিলেন। তখন বাসুদেব, সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া, অর্থযুক্ত যথার্থ হিতকর অল্পাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। ভদ্রভাষিণী ভদ্রাও তাঁহাকে জননী প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদায় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্ বাসুদেব পঞ্চপাণ্ডবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণ—পরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মালা জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য সমাধা করিয়া স্বপুর গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র স্থলপুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধনদানপূর্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথিনক্ষত্রযুক্ত মুহূর্তে গদা চক্র অসি শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্‌গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত শ্বেত চামর গ্রহণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

শত্রুবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও অর্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্ধ যোজন গমন করিয়া শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্বক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করতঃ অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবীর সহিত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান্ গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুহৃজ্জনপরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং ভ্রাতা পুত্র ও বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণও পরম আহ্লাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা, আহুক ও যশস্বিনী মাতাকে, পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদ্যুম্ন শাম্ব নিশঠ চারুদেষ্ণ গদ অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণপূর্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—জরাসন্ধবধের পরামর্শ

এ দিকে সভানির্মাণ হইল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। সকলেই সে বিষয়ে মত করিল কিন্তু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক—কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণও সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন।

রাজসূয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন:—

"আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত নহে। যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্বত্র পূজ্য, এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসুয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।"

কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্য। তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই যে—"আমি কি সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্বত্রই পূজ্য, এবং সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর?" যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের ভুজবলে একজন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে, রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপনা আপনি পায় না। দাম্ভিক ও দুরাত্মাগণ খুব বড় মাপকাঠিতে আপনাকে মাপিয়া আপনার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তিনি মনে মনে বুঝিতেছেন বটে যে, আমি খুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে তাঁহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্রিগণ ও ভীমার্জুনাদি অনুজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কেমন, আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?" তাঁহারা বলিয়াছেন—"হা, অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র।" ধৌম্য দ্বৈপায়নাদি ঋষিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন, আমি কি রাজসূয় পারি?" তাঁহারাও বলিয়াছিলেন, "পার। তুমি রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।" তথাপি সাবধান* যুধিষ্ঠিরের মন নিশ্চন্ত হইল না। অর্জুন হউন, ব্যাস হউন,—যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার কাছে এ কথার উত্তর না শুনিলে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ যায় না। তাই "মহাবাহু সর্বলোকোত্তম" কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, "কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন।" তাই তিনি কৃষ্ণকে আনিতে লোক

পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ আসিলে তাই তাঁহাকে পূর্বোদ্ধৃত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন।

"আমার অন্যান্য সুহৃদ্গণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন! এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম-ক্রোধ-বিবর্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।"

* পাণ্ডব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান্ সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, যুধিষ্ঠিরের প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা। ভীম দুঃসাহসী, "গোঁয়ার" অর্জুন আপনার বাহুবলের গৌরব-জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত, যুধিষ্ঠির সাবধান। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম বলিয়া পরিচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উত্থাপন করিলাম। এই সাবধানতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দ্যুতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে।

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ যাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার কার্যকলাপ দেখিতেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন।* আর এখন আমরা তাঁহাকে কি ভাবি। তাঁহারা জানিতেন, কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ-বিবর্জিত, সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্বদোষরহিত, সর্বলোকোত্তম, সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ,—আমরা জানি, তিনি লম্পট, ননীমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত এবং অন্যান্য দোষযুক্ত। যিনি ধর্মের চরমাদর্শ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে পরিচিত, তাঁহাকে যে জাতি এ পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্মলোপ হইবে, বিচিত্র কি?

যুধিষ্ঠির যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল; যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর কেহই যুধিষ্ঠিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহা বলিলেন। মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলিলেন, "তুমি রাজসূয়ের অধিকারী নও, কেন না, সম্রাট্ ভিন্ন রাজসূয়ের অধিকার হয় না, তুমি সম্রাট নও। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট্।

তাহাকে জয় না করিলে তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না।”

যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া বলিবেন, “এ কৃষ্ণের মতই কথাটা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পূর্বশত্রু, কৃষ্ণ নিজে তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই; এখন সুযোগ পাইয়া বলবান্ পাণ্ডবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শটা দিলেন।”

কিন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট্, কিন্তু তৈমুরলঙ্গ্ বা প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্রাট্। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত। জরাসন্ধ রাজসূয়যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, “বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্বতকন্দর-মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছে।” রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য ছিল। জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। পূর্বে যে যজ্ঞকালে কেহ কখনও নরবলি দিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না।# কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

“হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিপ্ত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করতঃ অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দশ জনের অপ্রতুল আছে; চতুর্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের ঐ ক্রূর কর্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।”

* যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া রাখিয়াছে, এমত নহে। মৌলিক মহাভারতে তাঁহার কিরূপ চরিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের আলোচ্য।

কেহ কদাচিৎ দিত-সামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন,

“আমরা কখন নরবলি দেখি নাই।” ধার্মিক ব্যক্তিরা এ ভয়ানক প্রথার দিক্ দিয়া যাইতেন না।

অতএব জরাসন্ধবধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের নিজের হিত নহে;—যুধিষ্ঠিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও প্রধানতঃ ঐ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমণ্ডলীর হিত-জরাসন্ধের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত-সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়; জরাসন্ধের বধে তাঁহার নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই ছিল না। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্মতঃ বাধ্য—সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে আমারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি আছে,—এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে করিবে—অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না;—যিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ স্বার্থপর এবং অধার্মিক, কেন না, তিনি আপনার মর্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করিয়া লোকের হিতসাধন করেন, তিনিই আদর্শ ধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই আদর্শ ধার্মিক।

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু ভীমের দৃপ্ত তেজস্বী ও অর্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে সম্মত হইলেন। ভীমার্জুন ও কৃষ্ণ এই তিন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার অগণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিন জন মাত্র জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শচরিত্রানুযায়ী। জরাসন্ধ দুরাত্মা, এজন্য সে দণ্ডনীয়, কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয়ত অপরাধীরও নিষ্কৃতি; কেন না জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশী, পাণ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম ছিল যে, দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না।* অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে, অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, তাঁহারা তিন জন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত করিবেন—তিন

জনের মধ্যে একজনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন, তাহা বুঝা যায় না। এমন নহে যে, গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। তাঁহারা শত্রুভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া, প্রাকার চৈত্য চূর্ণ করিয়া জরাসন্ধসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছদ্মবেশ কৃষ্ণার্জুনের অযোগ্য। ইহার পর আরও একটি কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জুনের অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্তী হইলে ভীমার্জুন "নিয়মস্থ" হইলেন। নিয়মস্থ হইলে কথা কহিতে নাই। তাঁহারা কোন কথাই কহিলেন না। সুতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইঁহারা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্বরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।" জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং অর্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

* কালযবন ক্ষত্রিয় ছিল না।

ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়—চাতুরী বটে। ধর্মাত্মার ইহা যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্যটা কি? যে কৃষ্ণার্জুনকে এত দিন আমরা ধর্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাঁহাদের এ অবনতি কেন? এ চাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি যে, হাঁ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, ইঁহারা এই খেলা খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রুনিপাত করিবেন বলিয়াই এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে, ইঁহারা ধর্মাত্মা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম, সেরূপ নহে।

যাঁহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই রহিয়াছে। নিশীথকালে, যখন জরাসন্ধকে নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাতুরীর উদ্দেশ্য। তাই ইঁহারা যাহাতে নিশীথকালে তাহার সাক্ষাৎ লাভ হয়, এমন একটা কৌশল করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না, বৃত্তান্ত এরূপ কোন কার্য তাঁহারা করেন নাই। নিশীথকালে তাঁহারা

জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই—আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথকালে যুদ্ধ করেন নাই—দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই—প্রকাশ্যে সমস্ত পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, এক জনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ আক্রমণ করেন নাই—জরাসন্ধকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন—এমন কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পূর্বে জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন, তত দূর পর্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কৃষ্ণ আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গের বেদনা উপশমের উপযোগী ঔষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন সাহায্য ছিল না, তথাপি "অন্যায় যুদ্ধ" বলিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে জরাসন্ধ ভীমকর্তৃক অতিশয় পীড্যমান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্যে তাঁহারা কেন চাতুরী করিলেন? এ উদ্দেশ্যশূন্য চাতুরী কি সম্ভব? অতি নির্বোধে, যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা করিলে করিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণার্জুন, আর যাহাই হউন, নির্বোধ নহেন, ইহা শত্রুপক্ষও স্বীকার করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত জরাসন্ধ-পর্বাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে আসিল। ইহা কি কেহ বসাইয়া দিয়াছে? এই কথাগুলি কি প্রক্ষিপ্ত? এই বৈ এ কথার আর কোন উত্তর নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত।

আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে কোন একটি পর্বাধ্যায়ে প্রক্ষিপ্ত। যদি একটি অধ্যায়, কি একটি পর্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্বাধ্যায়ের অংশবিশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভূরি ভূরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামায়ণাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি, শকুন্তলা মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক (অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রন্থেরও এত বিবিধ

পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের ভিতর এইরূপ এক একটা বা দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়—মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে, তাহার বিচিত্র কি?

কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী, সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ দিব, তাহা হইতে পারে না। কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত—কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া দিতে হইবে যে, প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন হইত উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি।

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায়, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে, কোন পুঁথিতে এমন কোন কথা আছে যে, সে কথা গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহা গ্রন্থকারের বা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌টি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, তাহা সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কপিতে দেখি যে, লেখা আছে যে, রাম ঊর্র্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে, এটা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। কিন্তু যদি দেখি যে, এমন লেখা আছে যে, ঊর্মিলাকে বিবাহ করায় লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তারপর রাম, লক্ষ্মণকে ঊর্মিলা ছাড়িয়া দিয়া মিট্‌মাট্‌ করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে, এ লিপিকার বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ—তখন বলিতে হইবে যে, এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দরসে রসিকের রচনা, ঐ পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন, আমি দেখাইয়াছি যে, জরাসন্ধবধপর্বাধ্যায়ের যে কয়টা কথা আমাদের এখন বিচার্য, তাহা ঐ পর্বাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর ইহাও স্পষ্ট যে, ঐ কথাগুলি এমন কথা নহে যে, তাহা লিপিকারের বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং ঐ কথাগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার আমাদের অধিকার আছে।

ইহাদের পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করিল, সেই বা এমন অসংলগ্ন কথা প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংসা আছে। আমি পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি যে, মহাভারতের তিন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় স্তর নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। এই দুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁহাদের রচনাপ্রণালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন

ভিন্ন প্রকৃতির, দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা, তাঁহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ আছে, যুদ্ধপর্বগুলিতে তাঁহার বিশেষ হাত আছে—ঐ পর্বগুলি অধিকাংশই তাঁহার প্রণীত, সেই সকল সমালোচনকালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই কবির রচনায় অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃষ্ণকে চতুরচূড়ামণি সাজাইতে বড় ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইঁহার নিকট আদরণীয়। এরূপ লোক এ কালেও বড় দুর্লভ নয়। এখনও বোধ হয়, অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন যে, কৌশলবিদ্ বুদ্ধিমান্ চতুরই তাঁহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়—তাহা হইতে আধুনিক Diplomacy বিদ্যার সৃষ্টি। বিস্মার্ক্ একদিন জগতের প্রধান মনুষ্য ছিলেন। থেমিষ্টক্লিসের সময় হইতে আজ পর্যন্ত যাঁহারা এই বিদ্যায় পটু, তাঁহারাই ইউরোপে মান্য—'Francis d' Assisi বা Imitation of Christ" গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কবিরও মনে সেইরূপ চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুষোত্তমকে কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি মিথ্যা কথার দ্বারা দ্রোণহত্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা। জয়দ্রথবধে সুদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণার্জুনের যুদ্ধে অর্জুনের রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুত কৌশলের তিনিই রচয়িতা। এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলবিষয়ক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা তাঁহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্তু জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে তাঁর হাত আরও দেখিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ

নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্নাতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, তাঁহারা জরাসন্ধের পূজা গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে।

তৎপরে সৌজন্য-বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি জানি, স্নাতকব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য* বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন সুশোভিত; ভূজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন। আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন বলুন।"

তদুত্তরে কৃষ্ণ স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে (মৌলিক মহাভারতে কোথাও দেখি না যে, কৃষ্ণ চঞ্চল বা রুষ্ট হইয়া কোন কথা বলিলেন, তাঁহার সকল রিপুই বশীভূত) বলিলেন, "হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতক-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাগ্বীর্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করা নির্ধারিত আছে।"

কথাগুলি শাস্ত্রোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য নহে, সত্যপ্রিয় ধর্মাত্মার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এইরূপ উত্তর কাজেই দিতে হয়। ছদ্মবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির সৃষ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য তিনিই দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুরচূড়ামণি সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর তাহার অঙ্গ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে,

ব্রাহ্মণ বলিয়া ছলনা করিবার কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা শত্রুভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট বলিতেছেন।

"বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! বীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্যভাবে এবং সুহৃদ্‌গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমরা স্বকার্যসাধনার্থ শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্যব্রত।"

* লিখিত আছে যে, মাল্য তাঁহারা একজন মালাকারের নিকট বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। যাঁহাদের এত ঐশ্বর্য যে, রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি জুটিবে না, ইহা অতি অসম্ভব। যাঁহারা কপটদ্যুতাপহৃত রাজ্যই ধর্মানুরোধে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা যে ডাকাতি করিয়া তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিবেন, উহা অতি অসম্ভব। এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত। দৃপ্ত ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ সাজে।

কোন গোল নাই—সব কথাগুলি স্পষ্ট। এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশের গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে, ছদ্মবেশের কোন মানে নাই। তারপর, পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকার। তাঁহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সে তাঁহারই যোগ্য। পূর্ব অধ্যায়ে এবং পর-অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ যে, দুই হাতের বর্ণন বলিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে।

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাঁহাদের শত্রুগৃহ বলিয়া নির্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন, "আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ?"

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা, তাহাই বলিলেন। তাঁহার নিজের সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপন করিলেন না। নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য কেহ তাঁহার শত্রু হইতে পারে না, কেন না, তিনি সর্বত্র সমদর্শী, শত্রুমিত্র সমান দেখেন। তিনি পাণ্ডবের সুহৃদ্ এবং কৌরবের শত্রু, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ

দেখিব যে, তিনি ধর্ম্মের পক্ষ, এবং অধর্ম্মের বিপক্ষ; তদ্ভিন্ন তাঁহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা এখানে দেখিব যে, কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁহাকে শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন না। তবে যে মনুষ্যজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্রু। কেন না, আদর্শ পুরুষ সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই তিনি জরাসন্ধের প্রশ্নের উত্তরে, জরাসন্ধ তাঁহার যে উপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়া সাধারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে, তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তাই, যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে, আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। শত্রুতাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ জরান্ধকে বলিতেছেন :—

"হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকে ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ।"

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা পুরু অক্ষরে লিখিলাম। এখন, পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও, কথাটা অতিশয় গুরুতর! যে ধর্ম্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম। "আমি ত কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি?" যিনি এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাত্মারাও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মরক্ষা ও পাপনিবারণব্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই বাক্যই তাঁহাদের জীবনচরিতের মূলসূত্র। শ্রীকৃষ্ণেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখিলে তাঁহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ কংস শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কার্য্য এই মূলসূত্রের সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই পুরাণকারেরা "পৃথিবীর ভারহরণ" বলিয়াছেন। খ্রীষ্টকৃত হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক, এই পাপনিবারণ ব্রতের নাম ধর্ম্মপ্রচার। ধর্ম্মপ্রচার এই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে; এক, বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা; দ্বিতীয়, কার্য্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্য্যসকলকে ধর্ম্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা। খ্রীষ্ট, শাক্যসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই

করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খ্রীষ্টকৃত ধর্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান; কৃষ্ণকৃত ধর্মপ্রচার কার্যপ্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য, কেন না, বাক্য সহজ, কার্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল মানুষ, তাঁহার দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, সে কথা এক্ষণে আমাদের বিচার্য নহে।

এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস-শিশুপালাদির বধের উল্লেখ করিলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি; কিন্তু পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনুষ্যের কাজ? যিনি সর্বভূতে সমদর্শী, তিনি পাপাত্মাকেও আত্মবৎ দেখিয়া, তাহারও হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাপীকে জগতে রাখিলে জগতের মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধসাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? পাপীকে পাপ হইত বিরত করিয়া, ধর্মে প্রবৃত্ত দিয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মঙ্গল এককালে সিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? যিশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য এইরূপে পাপীর উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ কথার উত্তর দুইটি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে ও ধর্মেরও অভাব নাই। তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। দুর্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধর্মপথ অবলম্বনপূর্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি সাধ্যমতে করিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বারা যাহা সাধ্য, তাহা আমি করিতে পারি; কিন্তু দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা কার্য করিতেন, তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য, তাহাতে যত্ন করিয়াও কখন কখন নিষ্ফল হইতেন। শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যাসে আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা তাহার তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংসবধের কথা পূর্বে বলিয়াছি।

পাইলেট্‌কে খ্রীষ্টিয়ান করা, খ্রীষ্টের পক্ষে যত দূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্মপথে আনয়ন করা কৃষ্ণের পক্ষে তত দূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্মবিষয়ক একটি লেক্‌চর শুনাইয়া দিল, যথা—

"দেখ, ধর্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধর্মার্থে উপঘাত

করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই।” ইত্যাদি।

এ সব স্থলে ধর্মোপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সৎপথে আনিবার জন্য উপায় ছিল কি না, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অতিমানুষকীর্তি একটা প্রচার করিলে, যা হয়, একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন, অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা কোন প্রকার বুজ্‌রুকি ভেল্‌কির দ্বারা ধর্মপ্রচার বা আপনার দেবত্বস্থাপন করেন নাই।

তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্মের রক্ষা অর্থাৎ নির্দোষী অথচ প্রপীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি জরাসন্ধকে অনেক বুঝাইয়া পরে বলিলেন, “আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।” অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, সুতরাং যুদ্ধই হইল। জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিচারে যথার্থ্য স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যিশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা স্বীকার্য। যিশু বা শাক্যের ব্যবসায়ই ধর্মপ্রচার। কৃষ্ণ ধর্মপ্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্মপ্রচার তাঁহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ পুরুষের আদর্শ—জীবননির্বাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। কথাটা এই রকম করিয়া বলাতে কেহই না মনে করেন যে, যিশু খ্রীষ্ট বা শাক্যসিংহের, বা ধর্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র লাঘব করিতে ইচ্ছা করি। যিশু এবং শাক্য উভয়কে আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি করি, এবং তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। ধর্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্মের অনুষ্ঠানে আমরা সর্বদা প্রবৃত্ত) আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার সে ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, তিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম আছে, সকলই তাঁহার অনুষ্ঠেয়। কোন কর্মই তাঁহার “ব্যবসায় নহে”, অর্থাৎ অন্য কর্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন, কিন্তু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ

ব্যবসায় অবলম্বনই তাঁহাদের বিধেয়, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা লোকহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত পাঠক "আদর্শ" শব্দটি "Ideal" শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দূষ্য হইবে না। এখন, একটা "Christian Ideal" আছে। খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ পুরুষ যিশু। আমরা বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সেই আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আদর্শ পুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। খ্রীষ্ট পতিতোদ্ধারী; কোন দুরাত্মাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন না। শাক্যসিংহ বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য ইঁহাদিগকে আমরা আদর্শ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত—নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই Christian Ideal কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ? সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে?

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে—হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? Hindu Ideal আছে না কি? যদি থাকে, তবে কে? কথাটা শিক্ষিত হিন্দুমণ্ডলীমধ্যে জিজ্ঞাসা হইলে অনেকেরই মস্তককণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কেহ হয়ত জটাবল্কলধারী শুভ্রশ্মশ্রুগুম্ফ বিভূষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, "ও ছাই ভস্ম নাই।" নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দুর্দশা হইবে কেন? কিন্তু একদিন ছিল। তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ট জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে? ইহার উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা পূর্বে বুঝাইয়াছি। রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শপ্রতিমার নিকটবর্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ—খ্রীষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষ্যত্ব কি, ধর্মতত্ত্বে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীষ্টে তাহা

নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যিশুকে যদি রোমক সম্রাট্ য়িহুদার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না—কেন না, রাজকার্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরি ভূরি বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসনকার্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। এইরূপ কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন—এই জরাসন্ধের বন্দিগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর, যদি য়িহুদীরা রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, যিশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যিশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। "কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য—"Christian Ideal" অপেক্ষা "Hindu Ideal" শ্রেষ্ঠ।

ঈদৃশ সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্যবিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। তাহা হইলে, ইতর কার্যগুলি অননুষ্ঠিত, অথবা অসামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোক চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ, যিশু বা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক ধর্ম প্রচার ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন করা অসম্ভব। কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী, ধর্মপ্রচারক; সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধাদির বধ আদর্শরাজপুরুষ ও দণ্ডপ্রণেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহাই Hindu Ideal । অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্ট ধর্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুধর্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আমরা বুঝিতে পারিব না।

কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না, ইহার ভিতর আর একটা বিস্ময়কর কথা আছে। কি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক বিপরীত ফল ফলিয়াছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নির্বিরোধী সন্ন্যাসী; এখনকার খ্রীষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন ঐহিক সুখরত সশস্ত্র যোদ্ধৃবর্গের বিস্তীর্ণ শিবির মাত্র। হিন্দুধর্মের আদর্শ পুরুষ সর্বকর্মকৃৎ—এখনকার হিন্দু সর্বকর্মে অকর্মা। এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,—লোকের চিত্ত হইতে উভয় দেশেই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ একদিন প্রবল ছিল—প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্মপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষগণের সর্বগুণবত্তা তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল—যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদিগের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে।

জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গতঃ এ তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এ কথাগুলি এক স্থানে না এক স্থানে আমাকে বলিতে হইত। আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—ভীম-জরাসন্ধের যুদ্ধ

আমরা এ পর্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র যত দূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে মহাভারতে কৃষ্ণকে কোথাও বিষ্ণু বলিয়া পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন বা বিষ্ণুজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তাঁহাকেও এ পর্যন্ত মনুষ্যশক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্য করিতে দেখি নাই। তিনি বিষ্ণুর অবতার হউন বা না হউন কৃষ্ণচরিত্রের স্থূল মর্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নহে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি।

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে দেখি; এবং কদাচ কখনও তাঁহাকে লোকাতীতা বৈষ্ণবী শক্তিতে কার্যও করিতে দেখি; এ পর্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী কি না?

যদি কেহ বলেন যে, এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইতিহাসে কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকটিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, এই উত্তর যথার্থ হইল না। কেন না, নিষ্প্রয়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখা যায়। এই জরাসন্ধবধ হইতেই দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

জরাসন্ধবধের পর কৃষ্ণ ও ভীমার্জুন জরাসন্ধের রথখানা লইয়া তাহাতে আরোহণপূর্বক নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবনির্মিত রথ, তাহাতে কিছুর অভাব নাই। তবু খামখাই কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্র গরুড় আসিয়া রথের চূড়ায় বসিলেন। গরুড় আসিয়া আর কোন কাজ করিলেন না, তাঁহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝ হইতে কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব সূচিত হয়। জরাসন্ধকে বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চড়িবার বেলা হইল!

আবার যুদ্ধের পূর্বে, অমনি একটা কথা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে স্থিরসংকল্প হইলে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হে রাজন! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে?" জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অথচ ইহার দুই ছত্র পূর্ব্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

ব্রহ্মার এই আদেশ কি, তাহা মহাভারতের কোথাও নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থে আছে। এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় না কি যে, এইগুলি আদিম মহাভারতে মূলের উপর পরবর্ত্তী লেখকের কারিগরি? আর কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখার ইহার উদ্দেশ্য? আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণবিষ্ণুতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই, কেন না, কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র; দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষ্ণোপাসক দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কবিকল্পনাটা তাঁহার জানা ছিল, তিনি অভাব পূরণ করিয়া দিলেন।

এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য ধন্যবাদ করিতেছেন, সেখানেও, কোথাও কিছু নাই, খামকা তাঁহারা কৃষ্ণকে "বিষ্ণো" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এখন ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখা যায় না যে, তিনি বিষ্ণু বা তদর্থক অন্য নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এখন দেখিতাম যে, ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, ইহাতে অসঙ্গত বা অনৈসর্গিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা হইল। যদি এমন দেখিতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ "বিষ্ণো!" সম্বোধনের উপযোগিতা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ করেন নাই—সর্ব্বলোকসমক্ষে ভীম তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্য্যের প্রবর্ত্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু কারাবাসী রাজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকস্মাৎ রাজগণ কর্তৃক এই বিষ্ণুত্ব আরোপ কখন ঐতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা ঐ গরুড় স্মরণ ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্ধবধের আর কোন অংশের সঙ্গে সঙ্গত

নহে। তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি—আর তিনটা কথাই মূলাতিরিক্ত। বোধ হয়, ইহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

যাঁহারা বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাঁহাদিগের এ কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার অনুবর্তী হইবার আর কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই। আর এই সমালোচনায় যাঁহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে, জরাসন্ধবধ মধ্যে কৃষ্ণের এই বিষ্ণুত্বসূচনা পরবর্তী কবি—প্রণতী ও প্রক্ষিপ্ত, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও কপটাচারবিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই এই জরাসন্ধ-পর্বাধ্যায়ে আছে, তাহাও ঐরূপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

বস্তুতঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ—বুঝা যাইবে যে, জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে পরবর্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। দুই কবির যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।

জরাসন্ধের পূর্ববৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের কংসবধজনিত যে বিরোধ, তাহারও পরিচয় দিলেন। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতও করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারতকার কি বলিতেছেন, শুনুন।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোহনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাত নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল।"

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন—আরও সবিস্তার বলিয়াছেন—আবার সে কথা কেন? প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারতপ্রণেতা অদ্ভুতরসে বড় রসিক নহেন—কৃষ্ণ অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিবেন না। সে অভাব এখন পূরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,—

"মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুত কর্মঠ বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণসমীপে

গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মথুরার সমীপবর্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল।"

এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে যে, বর্তমান জরাসন্ধবধ—পর্বাধ্যায়ের সমুদায় অংশই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রণীত, এবং কৃষ্ণাদি যথার্থই ছদ্মবেশে গিরিব্রজে আসিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ করি, হিন্দুদিগের পুরাণেতিহাস মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। এদিকে কিছু হইবে না।

অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া এ পর্বাধ্যায়ের উপসংহার করিব; সে সকল খুব সোজা কথা।

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ "যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রধর্মানুসারে বর্ম ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্বক" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। "তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ ঐত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বণিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল।" "চতুর্দশ দিবস যুদ্ধ হইল!" (যদি সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দশ দিবসে "বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে; অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ, ইঁহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।" (অর্থাৎ যে শত্রুকে ধর্মতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্তব্য নহে।) ভীম জরাসন্ধকে পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধর্মজ্ঞান কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না।

তখন কৃষ্ণার্জুন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই জরাসন্ধবধের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুই করিলেন না, দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা Annexationist ছিলেন না—পিতার অপরাধে পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাঁহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।"

কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কহিলেন, "রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্ষু ধার্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।"

যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

এই জরাসন্ধবধে কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা প্রকাশমান—কিন্তু পরবর্ত্তী লেখকদিগের দৌরাত্ম্যে ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালবধ। সেখানে আরও গণ্ডগোল।

নবম পরিচ্ছেদ—অর্ঘাভিহরণ

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। নানাদিক্‌দেশ হইতে আগত রাজগণ, ঋষিগণ, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকে রাজধানী পূরিয়া গেল। এই বৃহৎ কার্যের সুনির্বাহ জন্য পাণ্ডবেরা আত্মীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্যে নিযুক্ত করিলেন। দুঃশাসন ভোজ্য দ্রব্যের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জয় পরিচর্যায়, কৃপাচার্য রত্নরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, দুর্যোধন উপায়নপ্রতিগ্রহে, ইত্যাদি রূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ কার্যে নিযুক্ত হইলেন? দুঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। তিনি ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন।

কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার যোগ্য কি কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাহ্মণের পা ধোয়াই বড় মহৎ কাজ? তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কি পাচক ব্রাহ্মণঠাকুরদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের প্রচারিত এবং এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল কার্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাঁহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। যদি বনপর্বে দুর্বাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহ হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি রকম-সকম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগের আশ্রম হইতে অর্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী। গীতোক্ত ধর্ম যদি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম হয়, তবে

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ। সমদর্শিনঃ ‖ ৫ ‖ ১৭

তাঁহার মতে ব্রাহ্মণে, গোরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে। তাহা হইলে ইহা অসম্ভব যে, তিনি ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্যই এই ভৃত্যকার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরও পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? আর ইহাও বক্তব্য যে, এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা বিনয়ের বড়াই।

অন্যে বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণচরিত্র সময়োপযোগী। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি বড় প্রবল ছিল; কৃষ্ণ ধূর্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ব্রহ্মভক্তি দেখাইতেছিলেন।

আমি বলি, এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কেন না, আমরা এই শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ের অন্য অধ্যায়ে (চৌয়াল্লিশে) দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত না থাকিয়া তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কার্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত আছে, "মহাবাহু বাসুদেব শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্বক সমাপন পর্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন।" হয়ত দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা এ পরিচ্ছেদে এ কথার বেশী আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা বলিলাম। নানা হাতের কাজ বলিয়া এত অসঙ্গতি।

এই রাজসূয় যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা নিহত হয়েন। পাণ্ডবদিগের সংশ্লেষ মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই এক মাত্র অস্ত্র ধারণ বলিলেও হয়। খাণ্ডবদাহের যুদ্ধটা আমরা বড় মৌলিক বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে একটা গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। বলিতে গেলে, তেমন গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, জরাসন্ধবধের পূর্বে, কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা বা ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ অভিহিত বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা অমনি অস্ফুট রকম আছে। এই শিশুপালবধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্তৃক তিনি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের তাৎকালিক নেতা ভীষ্মই এই মতের প্রচারকর্তা।

এখন ঐতিহাসিক স্থূল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন্ সময়ে তিনি প্রথম ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন? তাঁহার জীবিতকালেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন? দেখিতে পাই বটে যে, এই শিশুপালবধে, এবং তৎপরবর্তী মহাভারতের অন্যান্য অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয়?

এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি, ক্রমশঃ উত্তর আপনিই পরিস্ফুট হইবে। তবে ইহা বক্তব্য যে, শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায় যদি মৌলিক মহাভারতের অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দিগের প্রধান ভীষ্ম, এবং এবং পাণ্ডবেরা। তাঁহার বিপক্ষদিগের এক জন নেতা শিশুপাল। শিশুপালবধ বৃত্তান্তের স্থূল মর্ম এই যে, ভীষ্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া উঠে। তখন কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়া যায়। যজ্ঞের বিঘ্ন বিনষ্ট হইলে যজ্ঞ নির্বিঘ্নে নির্বাহ হয়।

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ ঐতিহাসিকতা কিছুমাত্র আছে কি না, তাহার মীমাংসার পূর্বে বুঝিতে হয় যে, এই শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায় মৌলিক কি না? এ কথার উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপালবধের সঙ্গে মহাভারতের স্থূল ঘটনাগুলির কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে, এমন নহে। ইহা সত্য বটে যে, ইতিপূর্বে অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক জন রাজার কথা দেখিতে পাই। পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। পাণ্ডব-সভায় কৃষ্ণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপালবধের কথা আছে। আর রচনাবলী দেখিলেও শিশুপালবধপর্বাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের ন্যায়, নাটকাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ

আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

তা না পারি, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বোধ হয় যে, যেমন জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে দুই হাতের কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরাসন্ধবধের অপেক্ষা সে বৈচিত্র্য শিশুপালবধে বেশী। অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্থূলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্য পরবর্তী লেখকের অনেক হাত আছে।

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব।

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে স্রক্চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে "মালাচন্দন" বলে। ইহা এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্যাদা দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠীপতিকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, কুলীনের কাছে গোষ্ঠীপতি বংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্ন প্রকার ছিল। সভাস্থ সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ প্রদান করিতে হইত। বংশমর্যাদা দেখিয়া দেওয়া হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়া দেওয়া হইত।

যুধিষ্ঠিরের সভার অর্ঘ দিতে হইবে—কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথা বিচার্য। ভীষ্ম বলিলেন, "কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাকে অর্ঘ প্রদান কর।"

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীষ্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ "তেজঃ বল ও পরাক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ" বলিয়াই তাঁহাকে অর্ঘদান করিতে বলিলেন। ক্ষত্রগুণে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই অর্ঘ দিতে বলিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, ভীষ্ম কৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্রই দেখিতেছেন।

এই কথানুসারে কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহা শিশুপালের অসহ্য হইল। শিশুপাল ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগকে এককালীন তিরস্কার করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে বিকাইত। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তাঁহার বাগ্মিতা বড় বিশুদ্ধ অথচ তীব্র। কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি

অর্ঘ পান কেন? যদি স্থবির বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বসুদেবকে পূজা করিলে না কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীর্ষু বলিয়া কি তাঁর পূজা করিয়াছ? শ্বশুর দ্রুপদ থাকতে তাঁকে কেন? কৃষ্ণকে আচার্য* মনে করিয়াছ? দ্রোণাচার্য থাকিতে কৃষ্ণের অর্চনা কেন? ঋত্বিক্ বলিয়া কি তাঁহাকে অর্ঘ দাও? বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণ কেন?# ইত্যাদি।

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্যান্য বাগ্মীর ন্যায় গরম হইয়া উঠিলেন, তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন,—প্রথমে "প্রিয়াচিকীর্ষু" "অপ্রাপ্তলক্ষণ" ইত্যাদি চুট্‌কিতে ধরিয়া, শেষ "ধর্মভ্রষ্ট" "দুরাত্মা" প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে Climax—কৃষ্ণ ঘৃতভোজী কুক্কুর, দারপরগ্রহকারী ক্লীব! ইত্যাদি। গালির একশেষ করিলেন।

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরমযোগী, আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম—পরবর্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ইউরোপীয়দিগের মত ডাকিয়া বলিলেন না, "শিশুপাল! ক্ষমা বড় ধর্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।

কর্মকর্তা যুধিষ্ঠির আহূত রাজার ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গেলেন—যজ্ঞবাড়ীর কর্মকর্তার যেমন দস্তুর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুৎসাকারীকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া ভীষ্ম লৌহনির্মিত—তাঁহার সেটা বড় ভাল লাগিল না। বুড়া স্পষ্টই বলিল, "কৃষ্ণের অর্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত।"

* কৃষ্ণ, অভিমন্যু, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীর, এবং কদাপি স্বয়ং অর্জুনেরও যুদ্ধবিদ্যার আচার্য।

অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ, ইহা স্বীকৃত হইল।

! কৃষ্ণ অনপত্য নহেন-তবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরা জিতেন্দ্রিয়কে এইরূপ গালি দেয়।

তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চনার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির

সারভাগ উদ্ধৃত করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি বাক্যের তাৎপর্য এই যে, আর সকল মনুষ্যের, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে, সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি অর্ঘের যোগ্য। আবার তারই মাঝে কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীষ্ম বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই জন্য কৃষ্ণ সকলের অর্চনীয়। আমরা দুই রকম পৃথক্ পৃথক্ দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ভীষ্ম বলিলেন,

"এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন না।"

এ গেল মনুষ্যত্ববাদ—তার পরেই দেবত্ববাদ—

"অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চনীয় এমত নহে, সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব—

"কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য, বীর্য, কীর্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া"—

পরে সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ,

সেই ভূতসুখাবহ জগদর্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি।"

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম—

"কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গ—পারদর্শী ও সমধিক বলশালী। ফলতঃ মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য, লজ্জা, কীর্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলী কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্বগুণসম্পন্ন আচার্য, পিতা ও গুরুস্বরূপ পূজার্হকৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য তিনি ঋত্বিক্, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয়পাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চিত হইয়াছেন।*

পুনশ্চ দেবত্ববাদ,

কৃষ্ণচরিত্র

"কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন, কর্তা, এবং সর্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরমপূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত, সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্‌বিদিক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইত্যাদি।"

ভীষ্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ—(১) যিনি বলে সর্বশ্রেষ্ঠ, (২) তাঁহার তুল্য বেদবেদাঙ্গপারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে অনেক দেওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে অনেক দেওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা। যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা ব্যাস-প্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসিকী সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম যাঁহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতঃই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না—কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্যে ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ।

* প্রথম অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি-অনুশীলনধর্মের চরমাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ, এই ভীষ্মোক্তিতে তাহা পরিষ্কৃত হইতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ—শিশুপালবধ

ভীষ্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।" অর্থাৎ "ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও।"

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"কৃষ্ণ অর্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, 'আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমরসাগরে অবগাহন করিব।" চেদিরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্বতোভাবে কর্তব্য। রাজারা নির্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।"

রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, অনুমতি করুন।"

শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ। শিশুপালকে বধ না করিলে তিনি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন। শিশুপাল আবার ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলা গালিগালাজ করিলেন।

ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশি গালি দিলেন। "দুরাত্মা", "যাহাকে বালকেও ঘৃণা করে," "গোপাল," "দাস" ইত্যাদি। পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনর্বার তাহাকে ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমনি আদর্শ। ভীষ্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পূর্ববৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাসযোগ্য। সে কথা এই—

শিশুপালের জন্মকালে তাঁহার তিনটি চক্ষু ও চারিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি গর্দভের মত চীৎকার করিয়াছিলেন। এরূপ দুর্লক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাঁহার

মাতাপিতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিল। এমন সময়ে, দৈববাণী হইল। সে কালে যাঁহারা আষাঢ়ে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাঁহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। দৈববাণী বলিল, "বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া প্রতিপালন কর; যমেও ইহার কিছু করিতে পারিবে না। তবে যিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন।" কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা দৈববাণী, কে মারিবে নামটা বলিয়া দাও না?" এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নামটা বলিয়া দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইলে গল্পের Plot—interest হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, "যার কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খসিয়া যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়া যাইবে, সেই ইহাকে মারিবে।"

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুচিল না। কৃষ্ণকে শিশুপালের সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়; কেন না, উভয়েই এক সময়ে রুক্মিণীকে বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, এবং দৈববাণীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন' কথাতেও ঐরূপ বুঝায় কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে চেদিদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই শিশুপালের দুইটা হাত খসিয়া গেল, আর একটা চোখ মিলাইয়া গেল।

শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসীমা। পিসীমা কৃষ্ণকে জবরদস্তী করিয়া ধরিলেন, "বাছা! আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।" কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন।

যাহা অনৈসর্গিক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বোধ করি, পাঠকেরাও করেন না। কোন ইতিহাসে অনৈসর্গিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাঁহার পূর্বগামীদিগের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য বুঝে না, এবং কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে না পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। কাণা কাণাকে বুঝায়, হাতী কুলোর মত। অসুরবধের জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ তিনি যে অসুরের অপরাধ পাইয়া ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে অসুরবধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, তাঁহার কোন গুণই বুঝা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে,

তাঁহার সকল কার্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্রস্বরূপ রত্নভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ত্ব।

শিশুপালের গোটাকতক কটূক্তি কৃষ্ণ সহ্য করিয়াছিলেন, বলিয়াই যে কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে। শিশুপাল ইতিপূর্বে কৃষ্ণের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলে সে সময় পাইয়া, দ্বারকা দগ্ধ করিয়া পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে শিশুপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। বসুদেবের অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল। এটা তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা করিয়াছিলেন এমত নহে। জরাসন্ধও তাঁহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ হৌক, পরতঃ হৌক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাত সাধনে সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু যত দিন না জরাসন্ধ রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া পশুপতির নিকট বলি দিতে প্রস্তুত হইল, তত দিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না। এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া লোকক্ষয় হয় বলিয়া, নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকের গড় বাঁধিয়া রহিলেন। সেইরূপ যত দিন শিশুপাল কেবল তাঁহারই শত্রুতা করিয়াছিল, তত দিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করেন নাই। তারপর যখন সে পাণ্ডবের যজ্ঞের বিঘ্ন ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের বিঘ্ন করিতে উদ্যুক্ত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার আদর্শ, এজন্য কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন না, কিন্তু আদর্শ পুরুষ দণ্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন।

কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দুর্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে উদ্যোগপর্বের কথা, এখন বলিবার নয়। কর্ণ দুর্যোধন যে অবস্থায় তাঁহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সে অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যিশু ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই মার্জনা করিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিলেন না।

ভীষ্মে ও শিশুপালের আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীষ্ম বলিলেন, "শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।" শিশুপাল জ্বলিয়া উঠিয়া ভীষ্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, "তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইঁহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন।" ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—তিনি বলিলেন, "আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্য বোধ করি না।" শুনিয়া সমবেত রাজমণ্ডলী গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, "এই ভীষ্মকে পশুবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।" ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "যা হয় কর, আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম।"

বুড়াকে জোরেও আঁটিবার যো নাই, বিচারেও আঁটিবার যো নাই। ভীষ্ম তখন রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্থূল মর্ম এই;—"ভাল কৃষ্ণের পূজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ; তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না? যাঁহার মরণকণ্ডূতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না?"

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া কৃষ্ণ যুদ্ধে আহূত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না; এবং যুদ্ধেরও ধর্মতঃ প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকৃত পূর্বপরাধ সকল একটি একটি করিয়া বিবৃতি করিলেন। তার পর বলিলেন, "এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।"

এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিতৃষ্বসার অনুরোধেই তাহার এত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপূর্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয়ত পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে অনৈসর্গিকতা কিছুই নাই; বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, কৃষ্ণদ্বেষী; কৃষ্ণও বলবান্ মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, এমন অবস্থায় পিসী যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষমা করিলেও পিসীর অনুরোধ

স্মরণ রাখিবেন, ইহা খুব সম্ভব। আর পিতৃষ্বসার পুত্রকে বধ করা আপাতত নিন্দনীয় কার্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চাই। এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সঙ্গত।

তার পরেই আবার একটা অনৈসর্গিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্য আপনার চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবা মাত্র চক্র তাঁহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

বোধ করি, এ অনৈসর্গিক ব্যাপার কোন পাঠকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলেই সম্ভবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষ্ণের মনুষ্যশরীর ধারণের কি প্রয়োজন ছিল? চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ঞামত যাতায়াত করিতে পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষ্ণু তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসর্গিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না যে, তজ্জন্য তাঁহাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন যে, স্বীয় মানুষী শক্তিতে একটা মানুষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, ঐশী শক্তির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না—কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্যই সম্পন্ন করিতেন। এই অনৈসর্গিক চক্রাস্ত্র স্মরণবৃত্তান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষযুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্র শিশুপালবধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা—

"পূর্বে রাজসূয় যজ্ঞে, চেদিরাজ ও করূষক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্বপ্রকার উদ্যোগবিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদিরাজতনয় সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন; এবং করূষরাজপ্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্জন

করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিরে পরিত্যাগপূর্বক ক্ষুদ্র মৃগেন্দ্র ন্যায় পলায়ন করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণসংহারপূর্বক পাণ্ডবগণের যশ বা মান বর্দ্ধন করিলেন।”—১২ অধ্যায়।

এখানে ত চক্রের কোন কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই, কৃষ্ণকে রথারূঢ় হইয়া রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষযুদ্ধেই শিশুপাল ও তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে এক গ্রন্থে একই ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই—একটি নৈসর্গিক, অপরটি অনৈসর্গিক, সেখানে অনৈসর্গিক বর্ণনায় অগ্রাহ্য করিয়া নৈসর্গিককে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে।

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থূল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজসূয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষবিশিষ্ট। তবে অর্জুনাদি যুদ্ধক্ষম পাণ্ডবেরা থাকিতে, তিনি যজ্ঞঘ্নদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে যে কার্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞরক্ষা ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম (Duty)। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবের বনবাস

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। সভাপর্বে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাঁহার নাম হইয়াছে।

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং সভামধ্যে বস্ত্রহরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহিত্যে বড় দুর্লভ। কিন্তু কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে- ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরূপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি:—

"গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়!"

এবং সে সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বলিবার, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তার পর বনপর্ব। বনপর্বে তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিভোজেরা সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল—কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, যুধিষ্ঠিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দুর্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, যুধিষ্ঠির বহুতর স্তব-স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে থামাইলেন। যে কবি লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, এ কথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর এখনকার হোঁৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, "আমি থাকিলে এতটা হয়!—আমি বাড়ী ছিলাম না।" তখন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে লাগিলেন। তাহাতে শাল্ববধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী। সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়; শাল্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাঁদাকাটি। শাল্ব একটা মায়া বসুদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়া মূর্ছিত। এ জগদীশ্বরের চিত্র নহে, কোন

মানুষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংহাধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারে কোন প্রসঙ্গও নাই। ভরসা করি, কোন পাঠক এ সকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না।

তার পরে দুর্বাসার সশিষ্য ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসর্গিক ব্যাপার। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সে কথা থাকিলেও তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। সুতরাং তাহা আমাদের সমালোচনীয় নহে।

তার পর বনপর্বের শেষের দিকে মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্বাধ্যায়ে কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আবার দেখিতে আসিয়াছিলেন—এবার একা নহে; ছোট ঠাকুরাণীটি সঙ্গে। মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্বাধ্যায় একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুই নাই। সমস্তটাই, প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্বাধ্যায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কি না, তাহা আমাদের বিচার করিবারও কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না, কৃষ্ণ এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন, উত্তরে কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়া ঋষি ঠাকুরের আষাঢ়ে গল্প সকল শুনিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয় কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সত্যভামাতে কিছু কথা হইল। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে দ্রৌপদী সত্যভামার সংবাদ গণিত হইয়াছে; কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

তাহার পর বিরাটপর্ব। বিরাটপর্বে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই—কেবল শেষে উত্তরার বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্যোগপর্বে আছে। উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণের অনেক কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

পঞ্চম খণ্ড

উপপ্লব্য

কৃষ্ণচরিত্র

উপপ্লব্য

সর্ব্বভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধানায় চ।
অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ ||
শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ—মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ

এক্ষণে উদ্যোগপর্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্বদাই করিতেছে। সেই অপরাধের দমন সমাজে একটি মুখ্য কার্য। রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র আইন আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই।

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে দুইটি মত আছে। এক মত এই যে :—দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে—আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটি পরস্পর বিরোধী—কাজেই দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে একেবারে পরিহার্য, এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহা সামঞ্জস্যে অদ্যাপি পৌঁছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খ্রীষ্টধর্ম বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে, সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ।

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগপর্বমধ্যে প্রধান তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই তাহার মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উদ্যোগপর্বের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ কার্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, তিনি বলপ্রয়োগপূর্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে, যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা প্রযোজ্য, তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি উদ্ধারে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্য সমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে, আইন-আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্মসঙ্গত কি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে

এই সকল কূট তর্ক উঠিয়া থাকে। কার্যতঃ প্রায় দেখিতে পাই যে, যে বলবান্, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায়। যে দুর্বল, যে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান্, অথচ ক্ষমাবান্, তাহার কি করা কর্তব্য, অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্যোগপর্বের আরম্ভেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি।

ভরসা করি, পাঠকেরা সকলেই জানেন যে, পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য দুর্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন। তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন; যদি অজ্ঞাতবাসের ঐ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাঁহারা রাজ্য পুনর্বার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্বার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাঁহারা দুর্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া, বিরাটরাজের পুরীমধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন; ঐ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাঁহার দুর্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ অধিকারী। কিন্তু দুর্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা। যদি না দেয়, তবে কি করা কর্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্তব্য কি না?

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাটরাজের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবেরা আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন হইলে, পাণ্ডব-রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।" তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া, তারপর বলিলেন, "এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।"

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। কেন না, হিত, ধর্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্বার বুঝাইয়া বলিতেছেন, "ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির

অধর্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন।” আমরা পূর্বে বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না—বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজবিধ্বংসের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

তারপর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্মিকতা এবং ইঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনাপূর্বক ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্ধ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এতদূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অর্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিতস্রোত বৃদ্ধি করিবেন না।

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন যে, সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জিত, তাহা অর্থই নহে। সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে, সাত্যকি গাত্রোত্থান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সে কালেও “Parliamentary procedure” ছিল) প্রতিবক্তৃতা করিলেন। সাত্যকি নিজে মহাবলবান্ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের মধ্যে অর্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লীব কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্যূতক্রীড়ার জন্য বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যেটুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন

যে, যদি কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নির্মূল করাই কর্তব্য।

তারপর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃতা। দ্রুপদও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন যে, দুর্যোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক।

পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্বার বক্তৃতা করিলেন। দ্রুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুজন, এই জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, "কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্যাদালঙ্ঘনপূর্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব।" গুরুজনকে ইহার পর আর কি ভর্ৎসনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, "যদি দুর্যোধন সন্ধি না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন," অর্থাৎ "এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন।

আমরা দেখিলাম যে, কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি, তজ্জন্য অর্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কৌরব পাণ্ডবদিগের মধ্যে পক্ষপাতশূন্য, উভয়ের সহিত তাঁহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্যোধনও তাই করিলেন। দুই জনে এক দিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকসমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন

করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দুর্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্যোধন সহাস্য বদনে কহিলেন, 'হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃদ; তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচর প্রতিপালন করুন।'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত।' এই বলিয়া ভগবান্ যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন—'হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্বুদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর, তাহাই অবলম্বন করি।'

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দন জনার্দন সমরপরাঙ্মুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাঁহারে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্যোধন অর্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাঙ্মুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।"

উদ্যোগপর্বের এই অংশ সমালোচনা করিয়া আমরা এই কয়টি কথা বুঝিতে পারি।

প্রথম—যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধর্মার্থসংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সর্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তারপর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে।

আমরা দেখিব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু, এবং যিনি একাই সর্বত্র সমদর্শী, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা, অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডবপক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

তারপর, নিরস্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জুন যুদ্ধের কোন্ কার্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য অতি হেয় কার্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহঙ্কারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্বদোষশূন্য এবং সর্বগুণান্বিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সঞ্জয়যান

উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে দ্রুপদের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। কেন না, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রবেধ্য ভূমিও প্রত্যর্পণ করা দুর্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জুন ও কৃষ্ণকে* ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। "তোমাদের রাজ্যও আমরা অধর্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্তু তোমরা তজ্জন্য যুদ্ধও করিও না, সে কাজটা ভাল নহে," এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নির্লজ্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সঞ্জয় পাণ্ডবসভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার স্থূলমর্ম এই যে, "যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর্ম, তোমরা সেই অধর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অতএব তোমরা বড় অধার্মিক!" যুধিষ্ঠির, তদুত্তরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয়, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় এবং প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক এই সকলও অধর্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক, মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্মপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে, যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার স্বধর্ম পরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্তব্য। মহাপ্রভুর শিনির নপ্তা এবং চেদি, অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয়বংশীয়গণ বাসুদেবের বুদ্ধিপ্রভাবেই শত্রু দমনপূর্বক সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবলপরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ত্রাতা ও কর্তা বলিয়া কাশীশ্বর বভ্রু উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন; গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারিদান করে, তদ্রূপ বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া

থাকেন। কর্মনিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুতম, আমি কদাচ ইঁহার কথার অন্যথাচরণ করিব না।”

বাসুদেব কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণদিগের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইবে, তাহার আশ্চর্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্মসাধনোদ্যত উৎসাহসম্পন্ন স্বজন-পরিচালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্মিক বলিয়া নির্দেশ করিলে?”

* বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্বপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্যোগপর্বে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডদিগের অন্যান্য সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, “বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?” (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, “সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্ শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া দ্বৈরথযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবার্থ যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার কার্য অনুক্ষণ স্মরণ করতঃ আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কৃষ্ণ যাঁহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।” আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন কিন্তু “কেশবও অধৃষ্য, লোকত্রয়ের অধিপতি এবং মহাত্মা। যিনি সর্বলোকে একমাত্র বরেণ্য, কোন্ মনুষ্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিবে?” এইরূপ অনেক কথা আছে।

এই পর্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে বড় প্রয়োজনীয়। আমরা বলিয়াছি, তাঁহার জীবনের কাজ দুইটি—ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন এবং ধর্মপ্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধর্মরাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্মের কথা প্রধানতঃ ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত গীতা-পর্বাধ্যায়েই আছে। এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম

কথিত হইয়াছে, তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম যে কৃষ্ণ-প্রচারিত, কি গীতিকার-প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতা-পর্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত ধর্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধর্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে, মহাভারতকায় যে ধর্মব্যখ্যা যে স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম, যদি পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধর্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে ভিন্নপ্রকৃতির ধর্ম, তবে বলিব, এই ধর্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে গীতায় যে ধর্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে, গীতোক্ত ধর্ম যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত বটে।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণ এখানে সঞ্জয়কে কি বলিতেছেন।

"শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্মবশতঃ কেহ বা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জল পান করিবামাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; সুতরাং কর্মই সর্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হয়।

"দেখ, দেবগণ কর্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কর্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া মাসার্ধ উদিত হইতেছেন,

হুতাশন কর্মবলে প্রজাগণের কর্মসংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; স্রোতস্বতী সকল কর্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছেন; অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্মবলে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জন ও প্রিয়বস্তু সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালনপূর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন।"

কর্মবাদ কৃষ্ণের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই কর্ম। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম, যাহাকে পাশ্চাত্ত্যেরা Duty, বলেন—সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্মে "কর্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি, কর্ম শব্দের পূর্বপ্রচলিত অর্থ পরিবর্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

অনুষ্ঠেয় কর্মের যথাবিহিত নির্বাহের অর্থাৎ ডিউটির সম্পাদনের নামান্তর স্বধর্মপালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মপালনে অর্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধর্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা,

"হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয়জ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্ত্যশ্বরথচালনে সুনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া ভীমসেনকে সান্ত্বনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্মরক্ষা ও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইঁহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রতিপালনপূর্বক স্বকর্ম সংসাধন করিয়া

দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়সাধন বিবেচনা করিতে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্মরক্ষা হয়, কি যুদ্ধ না করিলে ধর্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।"

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বর্ণের ধর্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যেরূপ ধর্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ মহাভারতে অন্যত্রও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধর্ম, এবং মহাভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম—সে ধর্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত, এমন নহে—যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার দুই একটা কথা উদ্ধৃত করিব।

ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম কিছুই নাই। উহার নাম "Conquest," "Glory," "Extension of Empire" ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ। শুধু এক "Glorie" শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রুষিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড্রীক তিন বার ইউরোপে সমরানল জ্বালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপাসু রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই বোধ হয় যে, এইরূপ "Glorie" ও তস্করতাতে প্রভেদ আর কিছুই নাই—কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর।* কিন্তু এ কথাটা বলা বড় দায়, কেন না, দিগ্বিজয়ের এমনই একটা মোহ আছে যে, আর্য ক্ষত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময় ধর্মাধর্ম ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল Diogenes মহাবীর আলেকজণ্ডরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এক জন বড় দস্যু মাত্র।" ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই বলিতেছেন,—তাঁহার মতে ছোট চোর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন,

* তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা যায়, সেখানে নাকি ভিন্ন কথা হইতে পারে। সেরূপ কার্যের বিচারে আমি সক্ষম নহি-কেন না, রাজনীতিজ্ঞ নহি।

"তস্কর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে সর্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয়। সুতরাং দুর্যোধনের কার্যও একপ্রকার তস্করকার্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।"

এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজি নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism। উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্মপালন। কৃষ্ণ বলিতছেন, "এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।"

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন, "তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তৎকালে (যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্মোপদেশ প্রদান কর নাই।" কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ দোষকীর্তনকালে বড় স্পষ্টবক্তা। সত্যই সর্বকালে তাঁহার নিকট প্রিয়।

সঞ্জয়কে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ স্বয়ং হস্তিনা নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, "যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে, সুমহৎ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।"

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দুষ্কর কর্মে স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্যশক্তিতে দুষ্কর কর্ম, কেন না, এক্ষণে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত্র হইয়া শত্রুপুরীমধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—যানসন্ধি

এইখানে সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা যায়, কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় গমন করিলেন বটে। কিন্তু সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায় ও ভগবদ্‌যান-পর্বাধ্যায়ের মধ্যে আর তিনটি পর্বাধ্যায় আছে; "প্রজাগর", "সনৎসুজাত", এবং "যানসন্ধি"। প্রথম দুইটি প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই—অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম ও নীতিকথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং ঐ দুই পর্বাধ্যায়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা বলিলেন, এবং তচ্ছ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই কথিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক সময়ে নিষ্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আছে।

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অর্জুনবাক্য সঞ্জয়—মুখে শুনিয়া, আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্তন কর।"

তদুত্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বলিয়া, এক আষাঢ়ে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন যে, তিনি পাটিপি পাটিপি,—অর্থাৎ চোরের মত; পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরমধ্যে অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া কৃষ্ণার্জুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন, কৃষ্ণার্জুন মদ খাইয়া উন্মত্ত। অর্জুন, দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছেন। কথাবার্তা নূতন কিছুই হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু দম্ভের কথা বলিলেন,—বলিলেন, "আমি যখন সহায়, তখন অর্জুন সকলকে মারিয়া ফেলিবে।"

তার পর অর্জুন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, "অনন্তর মহাবীর কিরীটী তাঁহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।" এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে, বুঝি ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জুন যাহা বলিলেন, তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিক্ দিয়া ঊনষষ্টিতম অধ্যায়

যায় নাই। ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলেন। ষষ্টিতম অধ্যায়ে দুর্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিন্তু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একষষ্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয়া বক্তৃতা করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। দ্বিষষ্টিতমে দুর্যোধনে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। ত্রিষষ্টিতমে ভীষ্মের বক্তৃতা। চতুঃষষ্টিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অর্জুন কি বলিলেন? তখন সঞ্জয় সেই অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র যোড়া দিয়া অর্জুনবাক্য বলিতে লাগিলেন। বোধ করি, কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। এই অধ্যায়গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে—পরবর্তী এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে, ইহা কেবল অপ্রাসঙ্গিক এবং অসলংগ্ন এমন নহে, পূর্বোক্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সকল বৃত্তান্তের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে বা পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই। বোধ হয়, কোন রসিক লেখক, অসুরনিপাতন শৌরি এবং সুরনিপাতিনী সুরা, উভয়েরই ভক্ত; একত্র উভয় উপাস্যকে দেখিবার জন্য অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততিতম পর্যন্ত চারি অধ্যায়ে। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্বে যাঁহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে আমাদের প্রয়োজন কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে এমন কিছু নাই যে, তাহার বলে আমাদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব সঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ—চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচ্য।

এইখানে যানসন্ধি পর্বাধ্যায় সমাপ্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার প্রস্তাব

শ্রীকৃষ্ণ, পূর্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদী, সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্য ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কবি ও ইতিহাসবেত্তা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে বলাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, কৃষ্ণের পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, “হে মহারাজ, ব্রহ্মচর্যাদি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদায় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষাচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অরাতিনিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন।”

গীতাতেও অর্জুনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখা যায়। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা পূর্বে বুঝান গিয়াছে। পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে বলিতেছেন, “মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগপূর্বক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগপূর্বক কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না।

গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে।* অর্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন,

“উর্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্যসিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু দৈব কর্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।”

এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্বে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেন। কেন না, তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্মসাধনে প্রবৃত্ত। ঐশী

শক্তির দ্বারা কর্মসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিস্ময়কর। তিনি বলিতেছেন—

"অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।"

এই উক্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের অত্যন্ত সুসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্ না শুনাক্, ইহা যে প্রকৃত ধর্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত ইহাও আমি জরাসন্ধবধের সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে বুঝাইয়াছি।

* সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে || ২ || ৪৮

দ্রৌপদীর এই বক্তৃতার উপসংহারকালে এক অপূর্ব কবিত্ব-কৌশল আছে। তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা শুনিয়া কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্বগন্ধাধিবাসিত, সর্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগসদৃশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দীননয়নে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দন! দুরাত্মা দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভীমার্জুন দীনের ন্যায় সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুরে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত ও পাংশুলুণ্ঠিত না দেখিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পূর্বক ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা উপশমিত হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার ধর্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

"নিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, দ্রবীভূত হুতাশনের ন্যায় অত্যুষ্ণ নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাসুদেব তাঁহারে সান্ত্বনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে! তুমি অতি অল্প দিন মধ্যেই কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের জ্ঞাতি বান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে। যদি হিমবান্ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষৎসমূহের সহিত নিপতিত হয়, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাষ্প সংবরণ কর, আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকাল মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে।"

এই উক্তি শোণিতপিপাসুর হিংসাপ্রবৃত্তিজনিত বা ক্রুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। যিনি সর্বত্রগামী সর্বকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতেছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যদুক্তি মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে, দুর্যোধন রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণপূর্বক সন্ধি স্থাপন করিত কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরব-সভায় গমনের জন্য উদ্যোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার মুখবিনির্গত গীতোক্ত অমৃতময় ধর্ম। তিনি নিজেই অর্জুনকে শিখাইয়াছেন যে,

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্মা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

সেই নীতির বশবর্তী হইয়া, আদর্শযোগী ভবিষ্যৎ জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের চেষ্টায় কৌরব-সভায় চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—যাত্রা

যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্যোপযোগী এবং কালোচিত। তিনি "রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহূর্তে কৌরব-সভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক স্নান ও বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন; এবং বৃষলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূর্বক" যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্যকর্মপরায়ণ যে বৈদিক ধর্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, ধর্মাত্মা, এবং অস্বার্থপর হইয়া সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, এজন্য অন্য বর্ণের নিকট, পূজা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য। কৃষ্ণও সেই জন্য তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপ পূজা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, পথিমধ্যে ঋষিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি।

"মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথের উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহর্ষিরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! সমুদায় লোকের কুশল? ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন্ কার্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? "তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেক বার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদায় ক্ষত্রিয়, সভাসদ্ ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতেছি। আমরা কৌরবসভামধ্যে আপনার মুখবিনির্গত ধর্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর

প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন, আমরা সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

"এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনারে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব।"

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্বগামী বিষ্ণুর অবতারান্তর বলিয়া খ্যাত। পুরাণের দশাবতারবাদ কত দূর সঙ্গত তাহা আমরা গ্রন্থান্তরে বিচার করিব।

এই হস্তিনাযাত্রার বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও পূজ্য ছিলেন। হস্তিনাযাত্রার বর্ণনা আরও কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

"দেবকীনন্দন সর্বশস্যপরিপূর্ণ অতি রম্য সুখাস্পদ পরম পবিত্রশালিভবন এবং অতি মনোহর ও হৃদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপশু সন্দর্শন করতঃ বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্যপ্রহৃষ্ট অনুদ্বিগ্ন ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে তাহারা বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

"এদিকে ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে অরাতিনিপাতন মধুসূদন বৃকস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্বক যথাবিধি শৌচ সমাপনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পরিচর্যা ও গাত্র হইতে সমুদায় যোক্ত্রাদি মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারে জনগণকে কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ! অদ্য যুধিষ্ঠিরের কার্যানুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল। অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্মাবলম্বী আর্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অরাতিকুলকালান্তক মহাত্মা হৃষীকেশের সমীপে আগমনপূর্বক বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও আশীর্বাদ

করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিলেন। ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অর্চনপূর্বক তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন।

ইহা নিতান্তই মানুষচরিত্র, কিন্তু আদর্শ মনুষ্যের চরিত্র।

দেখা যাইতেছে যে, দেবতা বলিয়া কেহ তাঁহাকে পূজা করিতেছে, এমন কথা নাই। তবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পূজা পাইবার সম্ভাবনা, তাহাই তিনি পাইতেছেন, এবং আদর্শ মনুষ্যের লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—হস্তিনায় প্রথম দিবস

কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া, যুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী রকম উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। নানারত্নসমাকীর্ণ সভা সকল নির্মাণ করাইলেন, এবং তাঁহাকে উপঢৌকন দিবার জন্য অনেক হস্ত্যশ্বরথ, দাস, "অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী," মেষ, অশ্বতরী, মণিমাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

বিদুর দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধার্মিক, তেমনই বুদ্ধিমান্। কিন্তু রত্নাদি দিয়া কৃষ্ণকে ঠকাইতে পারিবে না। তিনি যে জন্য আসিতেছেন, তাহা সম্পাদন কর; তাহা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—অর্থপ্রলোভিত হইয়া তোমার বশ হইবেন না।"

ধৃতরাষ্ট্র ধূর্ত, এবং বিদুর সরল; দুর্যোধন দুষ্ট। তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ পূজনীয় বটে, কিন্তু তাঁহার পূজা করা হইবে না। যুদ্ধ ত ছাড়িব না; তবে তাঁর সমাদরে কাজ কি? লোকে মনে করিবে, আমরা ভয়েই বা তাঁহার খোশামোদ করিতেছি। আমি তদপেক্ষা সৎ পরামর্শ স্থির করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিব। পাণ্ডবের বল বুদ্ধি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ আটক থাকিলে পাণ্ডবেরা আমার বশীভূত থাকিবে।"

এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কৃষ্ণ দূত হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম দুর্যোধনকে কতকগুলো কটূক্তি করিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন।

নাগরিকেরা, এবং কৌরবেরা বহু সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আনীত করিলেন। তাঁহার জন্য যে সকল সভা নির্মিত ও রত্নজাত রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া কুরুসভায় উপবেশনপূর্বক, যে যেমন যোগ্য, তাহার সঙ্গে সেইরূপ সৎসম্ভাষণ করিলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু এক দীনভবনে চলিলেন।

বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের এক রকম ভাই। উভয়েরই ব্যাসদেবের ঔরসে জন্ম। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র; বিদুর তাহা নহে। তিনি, বিচিত্রবীর্যের দাসী এক বৈশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ ধরিলেও, তাঁহার জাতি নির্ণয় হয় না। কেন না, ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম।* তিনি সামান্য ব্যক্তি কিন্তু পরম ধার্মিক। কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ

করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া, তাঁহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য, আজিও এ দেশে "বিদুরের খুদ," এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাণ্ডবমাতা কুন্তী, কৃষ্ণের পিতৃষ্বসা, সেইখানে বাস করিতেন। বনগমনকালে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করিতে গেলেন। কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধুর দুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা অমূল্য। যে ব্যক্তি মনুষ্য-চরিত্রের সর্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূল্যত্ব বুঝিবে না। মূর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

* মহাভারতীয় নায়কদিগের সকলেরই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের প্রপিতামহী, সত্যবতী, দাসকন্যা। ভীষ্মের মার জাতি লুকাইবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজন্য তিনি গঙ্গানন্দন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই ধীবরনন্দিনীর কানীনপুত্র। অতএব পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ যে, এখনকার দিনে, তাঁহারা সর্বজাতির অপাংক্তেয় হইতেন। পাণ্ডুর পুত্রগণ, কুন্তীর গর্ভজাত বটে, কিন্তু বাপের বেটা নহেন; পাণ্ডু নিজে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম। তাঁহারা ইন্দ্রাদির ঔরস পুত্র বলিয়া পরিচিত। এদিকে দ্রোণাচার্যের পিতা ভরদ্বাজ ঋষি, কিন্তু মা একটা কলসী; কলসীর গর্ভধারণ যাঁহাদের বিশ্বাস না হইবে, তাঁহারা দ্রোণের মাতৃকুল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইবেন। পাণ্ডবদিগের পিতা সম্বন্ধে যত গোলযোগ, কর্ণ সম্বন্ধেও তত-বেশীর ভাগ তিনি কানীন। দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বাপ মা কে, কেহ বলিতে পারে না; তাঁহারা যজ্ঞোদ্ভূত।

এ সময়ে কিন্তু, বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের কথা বলিতেছি না। অনেক ঋষির ধর্মপত্নীও ক্ষত্রিয়কন্যা ছিলেন; যথা, অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা, ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী শান্তা, ঋচীকভার্যা, জমদগ্নির ভার্যা (কেহ কেহ বলেন পরশুরামের ভার্যা) রেণুকা ইত্যাদি। এমনও কথা আছে যে, পরশুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিলে, ব্রাহ্মণদিগের ঔরসে পরবর্তী ক্ষত্রিয়েরা জন্মিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী, ক্ষত্রিয় যযাতির ধর্মপত্নী। আহারাদি সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, পরস্পরের অন্নভোজন করিতেন।

"পাণ্ডবগণ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না। বীরব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।"

"রাজ্যলাভ বা বনবাস"* এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে না। বুঝিলে, এত দুঃখ থাকিত না। যে দিন বুঝিবে, সে দিন আর দুঃখ থাকিবে না। হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কি না, মেম সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না হয় সভা করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়া পাখির মত কিচির মিচির করি।

কৃষ্ণ কুন্তীকে আরও বলিলেন, "আপনি তাহাদিগকে শত্রুবিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন।"

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সন্ধি হইবে না—যুদ্ধ হইবে। তথাপি সন্ধি স্থাপন জন্য হস্তিনায় আসিয়াছেন; কেন না, যে কর্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য সাধন করিতে হয়। ইহাকেই তিনি গীতায় কর্মযোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সন্ধি মনুষ্যের হিতকর; এই জন্য সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অর্জুনের প্রধান উৎসাহদাতা ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধর্ম। অতএব যে কর্মযোগ তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী। তাঁহার আদর্শ চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই এত প্রয়াস পাইতেছি।

কৃষ্ণ, কুন্তীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনর্বার কৌরব-সভায় গমন করিলেন। সেখানে গেলে, দুর্যোধন তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। দুর্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে লৌকিক নীতিটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "দূতগণ কার্যসমাধানান্তে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য হইলেই

আপনার পূজা গ্রহণ করিব।” দুর্যোধন তবুও ছাড়ে না; আবার পীড়াপীড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন,

“লোকে হয় প্রীতিপূর্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি সহকারে আমারে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই; আমিও বিপদ্‌গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব?”

* মিলটনের ক্ষুদ্রচেতা সয়তান্ বলিয়াছিল যে, স্বর্গে দাসত্বের অপেক্ষা বরং নরকে রাজত্ব শ্রেয়ঃ। আমি জানি যে, আমার এমন পাঠক অনেক আছেন, যাঁহারা এই ক্ষুদ্রোক্তির সঙ্গে উপরিলিখিত মহতী বাণীর কোন প্রভেদ দেখিবেন না। তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে আশাশূন্য লঘুচেতা, পরের প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারে না। মহাত্মা, কর্তব্যানুরোধে তাহা পারেন, কিন্তু মহাত্মা জানেন যে, মহাদুঃখ বা মহাসুখ ব্যতীত, তাঁহার বহুবিস্তারাকাঙ্ক্ষিণী চিত্তবৃত্তি সকল স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একটা সামান্য কর্ম; কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবন, সচরাচর কতকগুলা সামান্য কর্মের সমবায় মাত্র। সামান্য কর্মের জন্য একটা নীতি আছে অথবা থাকা উচিত। বৃহৎ কর্ম সকলের নীতির যে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কর্ম সকলের নীতিরও সেই ভিত্তি। সে ভিত্তি ধর্ম। তবে উন্নতচরিত্র মনুষ্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রচেতার এই প্রভেদ যে, ক্ষুদ্রচেতা ধর্মে পরাঙ্মুখ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবর্তী হইতে সক্ষম হয়েন না, কেন না, নীতির ভিত্তি তিনি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুদ্র বিষয়েও নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন যে, এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতএব দুর্যোধনকে সরল ও সত্য উত্তর দিলেন, স্পষ্ট কথা পরুষ হইলেও তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্মানুমত হয়, সেখানেও তাহা পরুষ বলিয়া আমরা পরাঙ্মুখ। এই ধর্মবিরুদ্ধ লজ্জা অনেক সময়ে আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধর্মে বিপন্নও করে।

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা হইতে উঠিয়া বিদুরের ভবনে গমন করিলেন।

বিদুরের সঙ্গে রাত্রিতে তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। বিদুর তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার হস্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে; কেন না, দুর্যোধন কোন মতেই সন্ধি স্থাপন করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্মলাভ হয়।”

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। সিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ পড়ে না। কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন,

"যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নবান্ না হন, পণ্ডিতগণ তাঁহারে নৃশংস বলিয়া কীর্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। * * * * যদি তিনি (দুর্যোধন) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই; প্রত্যুত আত্মীয়কে সদুপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আনৃণ্য লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জাতিভেদ সময়ে সৎপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যক্তি কখনও আত্মীয় নহে।"

ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরস্ত্রীলুব্ধ পাপিষ্ঠ গোপ; এ দেশের লোকের কাহারও বা সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে, তিনি মনুষ্যহত্যার জন্য অবতীর্ণ, কাহারও বিশ্বাস, তিনি "চক্রী"—অর্থাৎ স্বাভিলাষসিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। তিনি যে এ সকল নহেন—তিনি যে তৎপরিবর্তে লোকহিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ধর্মোপদেষ্টার শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মনুষ্য—ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধৃত করিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস

পরদিন প্রাতে স্বয়ং দুর্যোধন ও শকুনি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিদুরভবন হইতে কৌরবসভায় লইয়া গেলেন। অতি মহতী সভা হইল। নারদাদি দেবর্ষি, এবং জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাগ্মিতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। ঋষিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছুতে কিছু হইল না। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমার সাধ্য নহে, দুর্যোধনকে বল।" দুর্যোধনকে কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অনেক প্রকার বুঝাইলেন। সন্ধি স্থাপন দূরে থাক, দুর্যোধন কৃষ্ণকে কড়া কড়া শুনাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। দুর্যোধনের দুশ্চরিত্র ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধন উঠিয়া গেলেন।

তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মূলসূত্র, তদনুসারে কার্য করিতে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। রাজশাসনের মূলসূত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ দুষ্কৃতকারীকে দণ্ডিত করিবে। অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ হত্যাকারীর বধ বিহিত। যাহাকে বদ্ধ না করিল তাহার পাপাচরণে বহুসহস্র প্রাণীর প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বদ্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইউরোপীয় সমস্ত রাজা ও রাজমন্ত্রী পরামর্শ করিয়া এই জন্য খ্রীঃ ১৮১৫ অব্দে নাপোলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জন্য মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দুর্যোধনকে বাঁধিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করুন। তিনি নিজে, সমস্ত যদুবংশের রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে উদাহরণও দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ পরামর্শ গৃহীত হইল না।

এদিকে দুর্যোধন রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিবার জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি কৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত ও প্রিয়; অস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনের শিষ্য, এবং প্রায় অর্জুনতুল্য বীর। ইঙ্গিতজ্ঞ মহাবুদ্ধিমান্ সাত্যকি এই মন্ত্রণা জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যতর যাদববীর কৃতবর্মাকে সসৈন্য পুরদ্বারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে এই মন্ত্রণা জানাইলেন। এবং সভামধ্যে প্রকাশ্যে ইহা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

"যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইরূপ জনার্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন।" ইত্যাদি।

পরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি। তিনি বলশালী, সুতরাং ক্রোধশূন্য এবং ক্ষমাশীল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

"শুনিতেছি, দুর্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্বক নিগৃহীত করিবেন। কিন্তু আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইঁহাদিগকে আক্রমণ করি, কি ইঁহারা আমাকে আক্রমণ করেন। আমার এরূপ সামর্থ্য আছে, যে আমি একাকী ইঁহাদিগকে সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই নিন্দিত পাপজনক কর্ম করিব না। আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কৃতকার্য করিতেছেন। আমি অদ্যই ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদিগের অনুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতে পারি। তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না। কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্যোধনের ইচ্ছানুসারে কার্য করুক।"*

এই কথার পর ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ডাকাইয়া আনাইলেন, এবং তাঁহাকে অতিশয় কটূক্তি করিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন,

"তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয়; এই নিমিত্তই অসাধ্য, অযশস্কর, সাধুবিগর্হিত, পাপাচরণে সমুৎসুক হইয়াছ। কুলপাংশুল মূঢ়ের ন্যায় দুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুর্ধর্ষ জনার্দনকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের দুরাক্রম্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব, অসুর ও উরগগণ যাঁহার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; তুমি কি, সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বৎস! হস্তদ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না; পাণিতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না; মস্তক দ্বারা কখন মেদিনী ধারণ করা যায় না; এবং বলদ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।"

* কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ প্রশংসিত, এ জন্য সচরাচর আমি মূলের সহিত অনুবাদ না মিলাইয়াই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণের

এই উক্তিতে কিছু অসঙ্গতি ঐ অনুবাদে দেখা যায়, যথা, যে কার্যের জন্য পাপভাগী হইতে হয় না এক স্থানে বলিয়াছেন, সেই কার্যকে কয় ছত্র পরে পাপবুদ্ধিজনিত বলিতেছেন। এজন্য মূলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম। মূলে তত অসঙ্গতি দেখা যায় না। মূল উদ্ধৃত করিতেছি

রাজন্নেতে যদি ক্রুদ্ধা মাং নিগৃহ্নীয়ুরোজসা।
এতে বা মামহং বৈনাননুজানীহি পার্থিব ||
এতান্ হি সর্বান্ সংরদ্ধান্নিন্তুমহম্যুৎসহে।
ন চাহং নিন্দিতং কর্ম কুর্যাং পাপং কথঞ্চন ||
পাণ্ডবার্থে হি লুভ্যন্তঃ স্বার্থান্ হাস্যন্তি তে সুতাঃ।
এতে চেদেবমিচ্ছন্তি কৃতকার্যো যুধিষ্ঠিরঃ ||
অদ্যৈব হ্যহমেনাংশ্চ যে চৈনাননু ভারত।
নিগৃহ্য রাজন্ পার্থেভ্যো দদ্যাং কিং দুষ্কৃতঃ ভবেৎ ||
ইদন্তু ন প্রবর্তেয়ং নিন্দিতং কর্ম ভারত।
সন্নিধৌ তে মহারাজ ক্রোধজং পাপবুদ্ধিজম্ ||
এষ দুর্যোধনো রাজন্ যথেচ্ছতি তথাস্তু তৎ।
অহন্ত সর্বাংস্তনয়াননুজানামি তে নৃপ ||

"কিং দুষ্কৃতং ভবেৎ" ইতি বাক্যের অর্থ ঠিক "পাপভাগী হইতে হয় না," এমত নহে। কথার ভাব ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, "দুর্যোধন আমাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি যদি তাহাকে এখন বাঁধিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে কি এমন মন্দ কাজ হয়?" দুর্যোধনকে বদ্ধ করা মন্দ কাজ হয় না, কেন না, অনেকের হিতের জন্য একজনকে পরিত্যাগ করা শ্রেয় বলিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, ইহাকে বদ্ধ কর। তবে কৃষ্ণ এক্ষণে স্বয়ং এ কাজ করিলে ক্রোধবশতঃই তিনি ইহা করিতেছেন, ইহা বুঝাইবে। কেন না, এতক্ষণ তিনি নিজে তাহাকে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ যাহাতে প্রবর্তিত করে, তাহা পাপবুদ্ধিজনিত, সুতরাং আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিন্দিত ও পরিহার্য কর্ম।

তারপর বিদুরও দুর্যোধনকে ঐরূপ ভর্ৎসনা করিলেন। বিদুরের বাক্যাবসানে, বাসুদেব উচ্চহাস্য করিলেন, পরে সাত্যকি ও কৃতবর্মার হস্ত ধারণপূর্বক কুরুসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই পর্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্যান-বৃত্তান্ত, সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক; কোন গোলযোগ নাই। অতিপ্রকৃত কিছুই নাই ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্তু অঙ্গুলিকণ্ডূয়ন-নিপীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতি গোষ্ঠী ইহা কদাচ সহ্য করিতে পারে না। এমন একটা মহদ্ব্যাপারের ভিতর একটা অনৈসর্গিক অদ্ভুত কাণ্ড না প্রবিষ্ট করাইলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষা হয় কৈ? বোধ করি, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা, কৃষ্ণের হাস্য ও নিষ্ক্রান্তির মধ্যে একটা বিশ্বরূপ প্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ভগবদ্গীতা-পর্বাধ্যায়ে তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার বিশ্বরূপপ্রদর্শন বর্ণিত আছে। সেই বিশ্বরূপ-বর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ! গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া দুর্লভ। আর ভগবদ্যান-পর্বাধ্যায়ে এই বিশ্বরূপবর্ণনা যাঁহার রচিত, কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। ভগবদ্গীতার একাদশে পড়ি যে, ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন, "তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্বে নিরীক্ষণ করে নাই।" কিন্তু তৎপূর্বেই এখানে দুর্যোধনাদি কৌরবসভাস্থ সকল লোকেই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ করিল। ভগবান্ গীতার একাদশে, আরও বলিতেছেন, "তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না।" কিন্তু কুকবির হাতে পড়িয়া, এখানে বিশ্বরূপ যার তার প্রত্যক্ষীভূত হইল। গীতায় আরও কথিত হইয়াছে, "অনন্যসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমাদের এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমারে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।" কিন্তু এখানে দুষ্কৃতকারী পাপাত্মা ভক্তিশূন্য শত্রুগণও তাহা নিরীক্ষণ করিল।

নিষ্প্রয়োজনে কোন কর্ম মূর্খও করে না, যিনি বিশ্বরূপী, তাঁহার ত কথাই নাই। এখানে বিশ্বরূপ প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। দুর্যোধনাদি বলপ্রয়োগের পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন উদ্যম করে নাই। পিতা ও পিতৃব্য কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দুর্যোধন নিরুত্তর হইয়াছিল। বলপ্রকাশের কোন উদ্যম করিলেও, সে বল নিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। তিনি স্বয়ং এতাদৃশ বলশালী যে, বল দ্বারা কেহ তাঁহার নিগ্রহ করিতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্র ইহা বলিলেন, বিদুর বলিলেন, এবং কৃষ্ণ নিজেও বলিলেন। কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন শঙ্কা ছিল না, কেন না, সাত্যকি কৃতবর্মা প্রভৃতি

মহাবলপরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশীয়েরা তাঁহার সাহায্য জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগের সৈন্যও রাজদ্বারে যোজিত ছিল। দুর্যোধনের সৈন্য উপস্থিত থাকার কথা কিছু দেখা যায় না। অতএব বলদ্বারা নিগ্রহের চেষ্টা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ কাপুরুষ নহেন। যিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব বিশ্বরূপ প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। এ অবস্থায় ক্রুদ্ধ বা দাম্ভিক ব্যক্তি ভিন্ন শত্রুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে না। যিনি বিশ্বরূপ, তিনি ক্রোধশূন্য এবং দম্ভশূন্য।

অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাটা কুকবির প্রণীত অলীক উপন্যাস বলিয়া ত্যাগ করাই বিধেয়। আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই।

কুরুসভা হইতে কৃষ্ণ কুন্তীসম্ভাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপপ্লব্য নগরে, যেখানে পাণ্ডবেরা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন।

যাহারা কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে। তবে কর্ণকে কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চলিলেন কেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বলিব। সে কথায় কৃষ্ণচরিত্র পরিস্ফুট হয়। সাম ও দণ্ডনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখিয়াছি। এক্ষণে ভেদ নীতিতে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিব। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ বটে, কেন না, তাঁহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বুদ্ধি, সকলই লোকাতীত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণকর্ণসংবাদ

কৃষ্ণ সর্বভূতে দয়াময়। এই মহাযুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিক্ষয় হইবে, তাহাতে আর কোন ক্ষত্রিয় ব্যথিত নহে, কেবল কৃষ্ণই ব্যথিত। যখন প্রথম বিরাট নগরে যুদ্ধের প্রস্তাব হয়, তখন কৃষ্ণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অর্জুন তাঁহাকে যুদ্ধে বরণ করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন না ও যুদ্ধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া ভরসাশূন্য হইয়াও, সন্ধি স্থাপনের জন্য ধৃতরাষ্ট্র-সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছু হইল না, প্রাণিহত্যা নিবারণ হয় না। তখন রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ জনসমূহের রক্ষার্থ উপায়ন্তর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কর্ণ মহাবীরপুরুষ। তিনি অর্জুনের সমকক্ষ রথী। তাঁহার বাহুবলেই দুর্যোধন আপনাকে বলবান্ মনে করেন। তাঁহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ তিনি পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। কর্ণের সাহায্য না পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কর্ণকে তাহার শত্রুপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলেই অবশ্যই তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা করিবার জন্য কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যক।

কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল।

কর্ণ অধিরথনামা সূতের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ তিনি অধিরথের পুত্র নহেন—পালিতপুত্র মাত্র। তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার নিজ জন্মবৃত্তান্ত তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি সূতপত্নী রাধার গর্ভজাত না হইয়া, কুন্তীর গর্ভজাত, সূর্যের ঔরসে তাঁহার জন্ম। তবে কুন্তীর কন্যাকালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কুন্তী, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহোদর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এ কথা কুন্তী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। আর কৃষ্ণ জানিতেন; তাঁহার অলৌকিক বুদ্ধির নিকটে সকল কথাই সহজে প্রতিভাত হইত। কুন্তী তাঁহার পিতৃষ্বসা; ভোজরাজগৃহে এ ঘটনা হয়, অতএব কৃষ্ণের মনুষ্যবুদ্ধিতেই ইহা জানিতে পারা অসম্ভব নহে।

কৃষ্ণ এই কথা এক্ষণে রথারূঢ় কর্ণকে শুনাইলেন। বলিলেন,

"শাস্ত্রজ্ঞেরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্যার সহোঢ় ও কানীনপুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকালাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ, তন্নিমিত্ত তুমি ধর্মতঃ পুত্র; অতএব চল, ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও*

তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।” তিনি কর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি জ্যেষ্ঠ, এ জন্য তিনিই রাজা হইবেন, অপর পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে।

* “বিরুদ্ধে”ও এই পদটি কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিন্তু ইহা এখানে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আমার কাছে মূল মহাভারত যাহা আছে, তাহাতে দেখিলাম, নিগ্রহার্ধমণাশাস্ত্রাণাম্ আছে। বোধ হয় নিগ্রহার্থমশাস্ত্রাণাম্ হইবে। তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত হয়।

এই অংশ ছাপা হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে, ইহার অন্যতর পাঠও আছে, যথা-“নিগ্রহাদ্ধর্মশাস্ত্রাণাম্।” এ স্থলে নিগ্রহ অর্থে মর্যাদা। যথা-

“নিগ্রহো ভর্ৎসনেহপি স্যাৎ মর্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে।”-ইতি মেদিনী।

“নিগ্রহো ভর্ৎসনে প্রোক্তো মর্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে।”-ইতি বিশ্ব।

“নিয়মেন বিধিনা গ্রহণং নিগ্রহঃ।”-ইতি চিন্তামণিঃ।

কৃষ্ণের এই পরামর্শ সর্বজনের ধর্মবুদ্ধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে হিতকর, কেন না, তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাঁহার পক্ষে ধর্মানুমত, কেন না, ভ্রাতৃগণের প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা দুর্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর, কেন না, যুদ্ধ হইলে তাঁহারা কেবল রাজ্যভ্রষ্ট নহে, সবংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। যুদ্ধ না হইলে তাঁহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, রাজ্যও বজায় থাকিবে, কেবল পাণ্ডবের ভাগ ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে পাণ্ডবদিগেরও হিত ও ধর্ম, কেন না যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি বধ না করিয়াও, স্বরাজ্য কর্ণের সহিত ভোগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম ধর্ম্যতা ও হিতকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা অসংখ্য মনুষ্যগণের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিবে।

কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধে দুর্যোধনাদির রক্ষা নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাঁহাকে কোন কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধা তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সূতবংশে বিবাহ করিয়াছেন, এবং সেই ভার্যা হইতে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর তিনি ত্রয়োদশ বৎসর দুর্যোধনের আশ্রয়ে

থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন; দুর্যোধন তাঁহারই ভরসা করেন; এখন দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবপক্ষে গেলে লোকে তাঁহাকে কৃতঘ্ন, পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্যলোলুপ বা তাহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ বলিবে। এই জন্য কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না।

কৃষ্ণ বলিলেন, "যখন আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহারদশা সমুপস্থিত হইয়াছে।"

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষণ্ণভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবার জন্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই; এজন্য আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।

নবম পরিচ্ছেদ—উপসংহার

কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে ফিরিয়া আসিলে যুধিষ্ঠিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে বল।

কৃষ্ণ, নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং অন্যে যাহা বলিয়াছিল, তাই বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সকল বক্তৃতার পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা দেখিয়াছি, এখানে তাহার সহিত মিল নাই। কিছুর সঙ্গে কিছু মিলে না। মিলিলে দীর্ঘ পুনরুক্তি ঘটিত। তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কোন মহাপুরুষ কিছু নূতন রকম বসাইয়া দিয়াছেন বোধ হয়।

এইখানে ভগবদ্‌যান-পর্বাধ্যায় সমাপ্ত। তারপর সৈন্যনির্যাণ-পর্বাধ্যায়। ইহাতে বিশেষ কথা কিছু নাই। কতকগুলা মৌলিক কথা আছে; কতকগুলা কথা অমৌলিক বলিয়া বোধ হয়; কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা বড় অল্প। কৃষ্ণের ও অর্জুনের পরামর্শানুসারে, পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়া আসিয়া, কৃষ্ণকে কিছু মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন, কেন না, তিনি কুরুপাণ্ডবকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরুসভায় যাহা ঘটিয়াছিল, সে কথাও কিছু হইল। ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই।

তাহার পর উলূকদূতাগমন-পর্বাধ্যায়। এটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে আর কিছুই নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগালাজ। দুর্যোধন, শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে উলূককে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল পাণ্ডবদিগকে ও কৃষ্ণকে খুব গালিগালাজ করা। উলূক আসিয়া ছয় জনকেই খুব গালিগালাজ করিল। পাণ্ডবেরা উত্তরে খুবই গালিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণ বড় কিছু বলিলেন না, তাঁহার ন্যায় রোষামর্ষশূন্য ব্যক্তি গালাগালাজ করে না, বরং একটা রাগারাগি বাড়াবাড়ি যাহাতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবেরা উত্তর করিবার আগেই তিনি উলূককে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, "তুমি শীঘ্র গমন করিয়া দুর্যোধনকে কহিবে—পাণ্ডবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হইবে।" অথচ গালিগালাজটা কৃষ্ণার্জুনের ভাগেই বেশী বেশী রকম হইয়াছিল।

কিন্তু উলূকের দুর্বুদ্ধি, উলূক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ আরম্ভ করিল। না হইবে কেন? ইনি দুর্যোধনের সহোদর। তখন পাণ্ডবেরা একে একে উলূকের উত্তর দিলেন। উলূককে সুদ সমেত আসল ফিরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথা

বলিলেন, “আমি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়া যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে স্থির করিয়া ভীত হইতেছ না; কিন্তু যেমন হুতাশনে তৃণ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমিও চরম কালে ক্রোধভরে সমস্ত পার্থিবগণকে সংহার করিব সন্দেহ নাই।”

উলূকদূতাগমন-পর্বাধ্যায়ে মহাভারতের কার্যের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহাতে রচনার নৈপুণ্য বা কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন স্থানে মহাভারতের অন্যান্যাংশের সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন; অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সঞ্জয় এবং কৃষ্ণের দৌত্যের কথা আছে, কিন্তু উলূকদূতের কথা নাই। এই সকল কারণে ইহাকে আদিমস্তরান্তর্গত বিবেচনা করি না।

ইহার পর রথাতিরথসংখ্যান্, এবং তৎপরে অম্বোপাখ্যান-পর্বাধ্যায়। এ সকলে কৃষ্ণবৃত্তান্ত কিছুই নাই। এইখানে উদ্যোপর্ব সমাপ্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড

কুরুক্ষেত্র

কৃষ্ণচরিত্র

কুরুক্ষেত্র

যো নিষণ্ণো ভবেদ্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ।
ইষ্টানিষ্টস্য চ দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ ||
শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ—ভীষ্মের যুদ্ধ

এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। মহাভারতে চারিটি পর্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। দুর্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পর্বের নাম হইয়াছে, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব ও শল্যপর্ব।

এই যুদ্ধপর্বগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুক্তি, অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসর্গিকতা, অত্যুক্তি এবং অসঙ্গতি দোষ এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমস্তরভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন্ অংশ মৌলিক, আর কোন্ অংশ অমৌলিক, স্থির করা বড় দুষ্কর। যেখানে সবই কাঁটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় দুঃসাধ্য। তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভীষ্মপর্বের প্রথম জম্বুখণ্ড-বিনির্মাণ পর্বাধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ নাই—মহাভারতেরও বড় অল্প। কৃষ্ণচরিত্রের কোন কথাই নাই। তারপর ভগবদ্গীতাপর্বাধ্যায়। ইহার প্রথম চব্বিশ অধ্যায়ের পর গীতারম্ভ। এই চব্বিশ অধ্যায় মধ্যে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্বে দুর্গাস্তব করিতে অর্জুনকে পরামর্শ দিলে, অর্জুন যুদ্ধারম্ভকালে দুর্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্য আরম্ভ করিবার সময়ে আপন আপন বিশ্বাসানুযায়ী দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল। যাহা বলিয়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই।

তারপর গীতা। ইহাই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতোক্ত অনুপম পবিত্র ধর্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের এক প্রধান পরিচয়।

কিন্তু এখানে আমি গীতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। তাহার কারণ এই যে, এই গীতোক্ত ধর্ম একখানি পৃথক গ্রন্থে[*] কিছু কিছু বুঝাইয়াছি, পরে আর একখানি[#] লিখিতে নিযুক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

ভগবদ্গীতা-পর্বাধ্যায়ের পর ভীষ্মবধ-পর্বাধ্যায়। এইখানেই যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি মাত্র। সারথিদিগের অদৃষ্ট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহা কতকগুলি দ্বৈরথ্যযুদ্ধ মাত্র। রথিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার কারণ, অশ্ব বা সারথি নষ্ট হইলে, আর রথ চলিবে না। রথ না চলিলে রথী বিপন্ন হয়েন।

সারথিরা যোদ্ধা নহে—বিনা দোষে বিনা যুদ্ধে নিহত হইত। কৃষ্ণকেও সে সুখের ভাগী হইতে হইয়াছিল। তিনি হত হয়েন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস মুহূর্তে বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেন। অন্যান্য সারথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা বৈশ্য, জাতিতে ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ্ণ, আত্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্তব্যানুরোধে বসিয়া মার খাইতেন।

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছি। কিন্তু একদিন তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু প্রয়োগ করেন নাই। সে ঘটনাটা এইরূপ:—

ভীষ্ম দুর্যোধনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে এরূপ নিপুণ যে, পাণ্ডবসেনার মধ্যে অর্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু অর্জুন তাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বশক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভীষ্ম সম্বন্ধে অর্জুনের পিতামহ, এবং বাল্যকালে পিতৃহীন পাণ্ডবগণকে ভীষ্মই পিতৃবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম এখন দুর্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধী পাণ্ডবদিগের শত্রু হইয়া তাহাদের অনিষ্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যদিও ভীষ্ম ধর্মতঃ অর্জুনের বধ্য, তথাপি অর্জুন পূর্বকথা স্মরণ করিয়া কোন মতেই ভীষ্মের বধ সাধনে সম্মত নহে। এজন্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মৃদুযুদ্ধ করেন, পাছে ভীষ্ম নিপতিত হন, এজন্য সর্বদা সঙ্কুচিত। তাহাতে ভীষ্ম, অপ্রতিহত বীর্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট করিতেন। ইহা দেখিয়া এক দিবস ভীষ্মকে বধ করিবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্রহস্তে অর্জুনের রথ হইতে অবরোহণপূর্বক ভীষ্মের প্রতি পদব্রজে ধাবমান হইলেন।

* ধর্মতত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাঙ্গালা টীকা।

দেখিয়া, কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম পরমাহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,

এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস! নমোহস্তু তে শার্ঙ্গগদাসিপাণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ! রথোত্তমাৎ ভূতশরণ্য সংখ্যে ||

"এসো এসো দেবেশ জগন্নিবাস! হে শার্ঙ্গগদাখড়্গধারিন্! তোমাকে নমস্কার। হে লোকনাথ ভূতশরণ্য! যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রথোত্তম হইতে পাতিত কর।"

অর্জুনও কৃষ্ণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, কৃষ্ণকে অনুনয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ফিরাইয়া আনিলেন।

এই ঘটনা দুই বার বর্ণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার নবম দিবসের যুদ্ধে। শ্লোকগুলি একই, সুতরাং এক দিবসেরই ঘটনা লিপিকারের ভ্রম প্রমাদ বা ইচ্ছাবশতঃ দুই বার লিখিত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে।

রচনা দেখিয়া বিচার করিলে, এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথমস্তরভুক্ত বিবেচনা করা যাইতে পারে। কবিত্ব প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা উদার এবং জটিলতাশূন্য। প্রথম স্তরের যতটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে।

এই ঘটনা লইয়া, কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে একটা তর্ক তুলিয়া থাকেন। কাশীদাস ও কথকেরা এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভীষ্ম যুদ্ধারম্ভকালে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে—তুমি যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে অস্ত্র ধারণ করাইব।

অতএব এক্ষণে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ, আপনার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত করিয়া, ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

এ সুবুদ্ধিরচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভীষ্মের এবম্বিধ প্রতিজ্ঞাও মূল মহাভারতে দেখা যায় না। কৃষ্ণেরও কোন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হয় না। তাঁহার প্রতিজ্ঞার মর্ম এই যে—যুদ্ধ করিব না। দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়ে তাঁহাকে এককালে বরণাভিলাষী হইলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবার জন্য বলিলেন, "আমার তুল্য বলশালী আমার নারায়ণী সেনা এক জন গ্রহণ কর; আর এক জন আমাকে লও।" "অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোহহমেকেতঃ" এই পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ যুদ্ধ করেন নাই। ভীষ্ম সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; কেবল সাধ্যানুসারে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অর্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। ইহা সারথিরা করিতেন। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।

যুদ্ধের নবম দিবসের রাত্রিতেও কৃষ্ণ ঐরূপ অভিপ্রায়ে কথা কহিয়াছিলেন। ভীষ্মকে অপরাজিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির নবম রাত্রে বন্ধুবান্ধবগণকে ডাকিয়া ভীষ্মবধের

পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, আমাকে অনুমতি দাও, আমি ভীষ্মকে বধ করিতেছি। অথবা অর্জ্জুনের উপরই এ ভার থাক; অর্জ্জুনও ইহাতে সক্ষম।

যুধিষ্ঠির এ কথায় সম্মত হইলেন না। কৃষ্ণ যে ভীষ্মবধ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিতেন, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন, "আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাহি না। তুমি অযুধ্যমান থাকিয়াই সাহায্য কর।" যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। পরে কৃষ্ণের সম্মতি লইয়া, এবং অন্য পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া ভীষ্মের কাছে তাঁহার বধোপায় জানিতে গেলেন।

ভীষ্ম নিজের বধোপায় বলিয়া দিলেন। দৃশ্যতঃ সেইরূপ কার্য হইল। কার্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল—অর্জ্জুনই ভীষ্মকে শরশয্যাশায়িত ও রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মূল মহাভারতের উপর দ্বিতীয় স্তরের কবি কলম চালাইয়া একটা সঙ্গতিশূন্য, নিষ্প্রয়োজনীয়, কিন্তু আপাতমনোহর শিখণ্ডীসম্বন্ধীয় গল্প খাড়া করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জয়দ্রথবধ

ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য সেনাপতি। দ্রোণপর্বে প্রথমে কৃষ্ণকে বিশেষ কোন কর্ম করিতে দেখা যায় না। তিনি নিপুণ সারথির ন্যায় কেবল সারথ্যই করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি যে কর্তা ও নেতা, এ কথাটা এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে সদুপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন নাই। দ্রোণাভিষেক-পর্বাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয়কৃত কৃষ্ণের বলবীর্য ও মহিমা কীর্তন জন্য এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাওয়া যায়। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়, এবং কৃষ্ণের বলবীর্য ও মহিমা কীর্তনের মহাভারতে বা অন্যত্র কিছুই অভাবও নাই। আমরা তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক; মানবচরিত্র কার্যে প্রকাশ; অতএব আমরা কেবল কৃষ্ণকৃত কার্যেরই অনুসন্ধান করিব।

দ্রোণপর্বে প্রথম ভগদত্তবধে কৃষ্ণের কোন কার্য দেখিতে পাই। ভগদত্ত মহাবীর, পাণ্ডবপক্ষীয় আর কেহ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল না; শেষ অর্জুন আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অশক্ত দেখিয়া, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অর্জুন বা অপর কেহই এই অস্ত্র নিবারণে সমর্থ নহেন; অতএব কৃষ্ণ অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনি বক্ষে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বক্ষে অস্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হইয়া বিলম্বিত হইল।

এই অস্ত্র একটা অনৈসর্গিক অবোধগম্য ব্যাপার। যাহা অনৈসর্গিক তাহাতে আমরা পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না এবং অনৈসর্গিকের উপর কোন সত্যও সংস্থাপিত হয় না। অতএব এ গল্পটা আমাদের পরিত্যাজ্য।

দ্রোণপর্বে, অভিমন্যুবধের পরে কৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। যে দিন সপ্ত রথী বেড়িয়া অন্যায়পূর্বক অভিমন্যুকে বধ করে, সে দিন কৃষ্ণার্জুন সে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন—ঐ সেনা কৃষ্ণ দুর্যোধনকে দিয়াছিলেন। এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে তাঁহার সেনা—এইরূপে তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিযাছিলেন।

যুদ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণার্জুন অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত শুনিলেন। অর্জুন অতিশয় শোককাতর হইলেন।* যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং শোকমোহের

অতীত। তাঁহার প্রথম কার্য অর্জুনকে সান্ত্বনা করা। তিনি যে সকল কথা বলিয়া অর্জুনকে প্রবোধ দিলেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। গীতায় তিনি যে ধর্ম প্রচারিত করিয়াছেন, সেই ধর্মানুমোদিত মহাবাক্যের দ্বারা অর্জুনের শোকাপনয়ন করিলেন। ঋষিরা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিতেছিলেন, এই বলিয়া যে, সকলেই মরিয়াছে ও সকলেই মরিয়া থাকে। তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি বুঝাইলেন।

"যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের এই পথ। যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম।"

কৃষ্ণ অভিমন্যুজননী সুভদ্রাকেও ঐ কথা বলিয়া প্রবোধ দিলেন। বলিলেন,

"সৎকুলজাত ধৈর্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপে প্রাণপরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব শোক করিবার আবশ্যিকতা নাই। মহারথ, ধীর, পিতৃতুল্যপরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ, তপস্যা ব্রহ্মচর্য শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিলাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীরজননী! বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে।"

* এমনও পাঠক থাকিতে পারেন যে, তাঁহাকে বলিয়া দিতে হয় যে, অভিমন্যু অর্জুনের পুত্র ও কৃষ্ণের ভাগিনেয়।

এ সকলে মাতার শোক নিবারণ হয় না জানি। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরূপ কথাগুলা শুনি ও শুনাই, ইহা ইচ্ছা করে।

এদিকে পুত্রশোকার্ত অর্জুন অতিশয় রোষপরবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞায় আপনাকে আবদ্ধ করিলেন। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে, অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ। তিনি অতি কঠিন শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করিবেন, না পারেন, আপনি, অগ্নিপ্রবেশপূর্বক প্রাণত্যাগ করিবেন।

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পাণ্ডবসৈন্য অতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল, এবং বাদিত্রবাদকগণ ভারি বাজনা বাজাইতে লাগিল। কৌরবেরা চমকিত হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া জয়দ্রথরক্ষার্থে মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণ দেখিলেন, একটা বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অর্জুন বিবেচনা না করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সুসাধ্য নহে। জয়দ্রথ নিজে মহারথী, সিন্ধুসৌবীর—দেশের অধিপতি, বহু সেনার নায়ক এবং দুর্যোধনের ভগিনীপতি। কৌরবপক্ষীয় অপরাজেয় যোদ্ধৃগণ তাঁহাকে সাধ্যানুসারে রক্ষা করিবেন। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমন্যুশোকে বিহ্বল-মন্ত্রণায় বিমুখ। অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরবশিবিরে গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়া সেখানকার বৃত্তান্ত সব বলিল। কৌরবেরা প্রতিজ্ঞার কথা সব জানিয়াছে। দ্রোণাচার্য ব্যূহরচনা করিবেন; তৎপশ্চাৎ কর্ণাদি সমস্ত কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একত্র হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। এই দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ করিয়া, সকল বীরগণকে একত্রিত পরাজিত করিয়া, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করা অর্জুনেরও অসাধ্য হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অর্জুনের আত্মহত্যা নিশ্চিত।

অতএব কৃষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা করিয়া, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আপনার সারথি দারুককে ডাকিয়া কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্বে যোজিত করিয়া, অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি অর্জুন এক দিনে ব্যূহ পার হইয়া সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না পারেন, তবে তিনি নিজেই যুদ্ধ করিয়া কৌরবনেতৃগণকে বধ করিয়া জয়দ্রথবধের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অর্জুন স্বীয় বাহুবলেই কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যদি কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে "অযুধ্যামানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোহহমেকতঃ" ইতি সত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিত না। কারণ যে যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধ এ নহে। কুরুপাণ্ডবের রাজ্য লইয়া যে যুদ্ধ, এ সে যুদ্ধ নহে। আজিকার এ অর্জুনপ্রতিজ্ঞাজনিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্যের ভিন্ন; এক দিকে জয়দ্রথের জীবন, অন্য দিকে অর্জুনের জীবন লইয়া যুদ্ধ। যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব হইলে, তাঁহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে। এ যুদ্ধ পূর্বে উপস্থিত হয় নাই—সুতরাং "অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে" ইতি প্রতিজ্ঞা ইহার পক্ষে বর্তে না। অর্জুন কৃষ্ণের সখা, শিষ্য এবং ভগিনীপতি; তাঁহার আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম।

ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নিদ্রা গেলেন। সেইখানে একটা আষাঢ়ে রকম স্বপ্নের গল্প আছে। স্বপ্নে আবার কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছে আসিলেন, উভয়ে সেই রাত্রে হিমালয় গেলেন, মহাদেবের উপাসনা করিলেন, পাশুপত অস্ত্র পূর্ব্বেই (বনবাসকালে) অর্জুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার চাহিলেন ও পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য।

পরদিন সূর্যাস্তের প্রাক্কালে অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কথিত হইয়াছে, কৃষ্ণ অপরাহ্ণে যোগামায়া দ্বারা সূর্যকে আচ্ছন্ন করিলেন; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে সূর্যকে পুনঃপ্রকাশিত করিলেন। কেন? সূর্যাস্ত হইয়াছে ভ্রমে, জয়দ্রথ অর্জুনের সম্মুখে আসিবেন, এইরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টির জন্য? এইরূপ ভ্রান্তিতে পড়িয়া জয়দ্রথ এবং তাঁহার রক্ষকগণ, উল্লসিত এবং অনবহিত হইবেন, ইহাই কি অভিপ্রেত? এইখানে কাব্যের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত হইয়াছে স্পষ্ট দেখা যায়। এক দিকে দেখা যায় যে, এরূপ ভ্রান্তিজননের কোন প্রয়োজন ছিল না। যোগমায়াবিকাশের পূর্বেও অর্জুন জয়দ্রথকে দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং তিনি জয়দ্রথকে প্রহার করিতেছিলেন, জয়দ্রথও তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল। সূর্যাবরণের পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। সূর্যাবরণের পূর্বেও অর্জুনকে যেরূপ করিতে হইতেছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল। সমস্ত কৌরবীগণকে পরাভূত না করিয়া অর্জুনকে জয়দ্রথকে নিহত করিতে পারিলেন না। আর এক দিকে এই সকল উক্তির বিরোধী, সূর্যাবরণকারিণী যোগমায়ার বিকাশ। এ ভ্রান্তিসৃষ্টির প্রয়োজন, পরপরিচ্ছেদে বুঝাইতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় স্তরের কবি

আমরা এত দূর পর্যন্ত সোজা পথে সুবিধামত চলিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু এখন হইতে ঘোরতর গোলযোগ। মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, কিন্তু এতক্ষণ আমরা, তাহার স্থির বারিরাশিমধ্যে মধুর মৃদুগম্ভীর শব্দ শুনিতে শুনিতে সুখে নৌযাত্রা করিতেছিলাম। এক্ষণে সহসা আমরা ঘোর ব্যাত্যায় পড়িয়া, তরঙ্গাভিঘাতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত হইব। কেন না, এখন আমরা বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে পড়িলাম। তাঁহার হস্তে কৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহা উদার ছিল, তাহা এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে; যাহা সরল, তাহা এক্ষণে কৌশলময়। যাহা সত্যময় ছিল, তাহা এক্ষণে অসত্য ও

প্রবঞ্চনার আকর; যাহা ন্যায় ও ধর্মের অনুমোদিত ছিল, তাহা এক্ষণে অন্যায় ও অধর্মে কলুষিত। দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিত্র এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু কেন ইহা হইল? দ্বিতীয়স স্তরের কবি নিতান্ত ক্ষুদ্র কবি নহেন; তাঁহার সৃষ্টিকৌশল জাজ্বল্যমান। তিনি ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য নহেন। তবে তিনি কৃষ্ণের এরূপ দশা ঘটাইয়াছেন কেন? তাহার অতি নিগূঢ় তাৎপর্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিস্ফুট নহেন। তিনি নিজে ত সে কথা মুখেও আনেন না; পুনঃ পুনঃ আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য করেন। কবিও প্রায় সেই ভাবেই তাঁহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম স্তরে এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তখন হয়ত ঈশ্বরাবতার বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত নহেন। তাঁহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে। স্থূল কথা, মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিম্বদন্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং কাব্যালঙ্কার কবিকর্তৃক রঞ্জিত; এক আখ্যায়িকার সূত্রে যথাযথ সন্নিবেশপ্রাপ্ত। কিন্তু যখন দ্বিতীয় স্তর মহাভারতে প্রবিষ্ট হইল, তখন বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সর্বত্র স্বীকৃত। অতএব দ্বিতীয় স্তরের কবি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতারস্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কৃষ্ণও অনেক বার আপনার ঈশ্বরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য নির্বাহ করেন। কিন্তু ঈশ্বর পুণ্যময়, কবি তাহাও জানেন। তবে একটা তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহাকে বড় ব্যস্ত দেখি। ইউরোপীয়েরাও সেই তত্ত্ব লইয়া বড় ব্যস্ত। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ দয়াময়, করুণাক্রমেই জীবসৃষ্টি করিয়াছেন; জীবের মঙ্গলই তাঁহার কামনা। তবে পৃথিবীতে দুঃখ কেন? তিনি পুণ্যময়, পুণ্যই তাঁহার অভিপ্রেত। তবে আবার পৃথিবীতে পাপ আসিল কোথা হইতে? খ্রীষ্টানের পক্ষে এ তত্ত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ। হিন্দুর মতে ঈশ্বরই জগৎ। তিনি নিজে সুখদুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে সুখদুঃখ বলি, তাহা তাঁহার কাছে সুখদুঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাপপুণ্য বলি, তাহা তাঁহার কাছে পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহার অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব সুখদুঃখ পাপপুণ্য তাঁহারই মায়াজনিত। তাঁহা হইতেই

সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য। দুঃখ যে পাই, তাঁহার মায়া; পাপ যে করি, তাঁহার মায়া। বিষ্ণুপুরাণে কবি কৃষ্ণপীড়িত কালিয় সর্পের মুখে এই কথা দিয়াছেন,—

যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর।
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং মম ||

অর্থাৎ "তুমি আমাকে সর্পজাতীয় করিয়াছ, তাই আমি হিংসা করি।" প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তব করিবার সময় বলিতেছেন,

বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে।*

* বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ, ১৯ অধ্যায়।

"তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত।" তিনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, অসত্য, ন্যায়, অন্যায়, বুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি সব তাঁহা হইতে।

তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন,

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি || ৭। ১২

"যাহা সাত্ত্বিক ভাব বা রাজস বা তামস, সকলই আমা হইতে জানিবে। আমি তাহার বশ নহি, সে সকল আমার অধীন।" শান্তিপর্বে ভীষ্ম যেখানে কৃষ্ণকে "সত্যাত্মনে নমঃ" "ধর্মাত্মনে নমঃ" বলিয়া স্তব করিতেছেন, সেইখানেই "কামাত্মনে নমঃ" "ঘোরাত্মনে নমঃ," "ক্রৌর্যাত্মনে নমঃ," "দৃপ্তাত্মনে নমঃ," ইত্যাদি শব্দে নমস্কার করিতেছেন; এবং উপসংহারে বলিতেছেন, "সর্বাত্মনে নমঃ।" প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে এরূপ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বহু শত পৃষ্ঠা পূরণ করা যাইতে পারে।

যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুঝাইতে পারি। দুঃখ জগদীশ্বরপ্রেরিত, তিনি ভিন্ন ইহার অন্য কারণ নাই। যে পাপিষ্ঠ এজন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনীয়, তাহার সম্বন্ধে লোককে বুঝাইতে পারি, ইহার পাপবুদ্ধি জগদীশ্বরপ্রবর্তিত, ইহার বিচারে তিনি কর্তা, তোমরা কে?

এই তত্ত্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত। শ্রেষ্ঠ কবিগণ, কখনই আধুনিক লেখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় সকল কথা বলিয়া দিয়া, কাব্যের অবতারণা করেন না। যত্নপূর্বক তাঁহাদিগের মর্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে হয়। সেক্ষপীয়রের এক একখানি নাটকের মর্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহস্র কৃতবিদ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লিখিলেন,

আমরা তাহা বুঝিবার জন্য কত মাথা ঘামাইলাম; কিন্তু আমাদের এই অপূর্ব মহাভারত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমরা কখনও এক দণ্ডের জন্য কোন চেষ্টা করিলাম না। যেমন হরিকীর্তনকালে এক দিকে বৈষ্ণবেরা খোলে ঘা পড়িতেই কাঁদিয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দেন, আর এক দিকে নব্য শিক্ষিতেরা "Nuisance!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন, তেমনই প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের নাম মাত্রে এক দল মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন— মকল কাবল ভুসি শুনিয়া ভক্তিরসে দেশ আপ্লুত করেন, আর এক দল সকলই মিথ্যা, উপধর্ম, অশ্রাব্য, পরিহার্য, উপহাসাস্পদ বিবেচনা করেন। বুঝিবার চেষ্টা কাহারও নাই। শব্দার্থবোধ হইলেই তাঁহারা যথেষ্ট বুঝিলেন মনে করেন। দুঃখের উপর দুঃখ এই, কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছা করেন না।

ঈশ্বরই সব— ঈশ্বর হইতেই সমস্ত। তাঁহা হইতে জ্ঞান, তাঁহা হইতে জ্ঞানের অভাব বা ভ্রান্তি, তাঁহা হইতে বুদ্ধি, তাঁহা হইতে দুর্বুদ্ধি। তাঁহা হইতে সত্য, আবার তাঁহা হইতে অসত্য। তাঁহা হইতে ন্যায়, এবং তাঁহা হইতেই অন্যায়। মনুষ্যজীবনের প্রধান উপাদান এই জ্ঞান ও বুদ্ধি, সত্য ও ন্যায় এবং তদভাবে ভ্রান্ত, দুর্বুদ্ধি অসত্য বা অন্যায় সবই ঈশ্বরপ্রেরিত। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য, এবং ন্যায় তাঁহা হইতে, ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই; হিন্দুর কাছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে ভ্রান্তি, দুর্বুদ্ধি প্রভৃতিও যে তাঁহা হইতে, তাহা মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবি, এমন বিবেচনা করেন। আধুনিক জ্যোতির্বিদরা বলিয়া থাকেন, আমরা চন্দ্রের এক পিঠই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ঠ কখন দেখিতে পাই না। এই কবি সেই অদৃষ্টপূর্ব জগৎরহস্যের অপর পৃষ্ঠ আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন। তিনি জয়দ্রথবধে দেখাইতেছেন, ভ্রান্তি ঈশ্বরপ্রেরিত ঘটোৎকচবধে দেখাইবেন, দুর্বুদ্ধিও তাঁহার প্রেরিত, দ্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, দুর্যোধন বধে দেখাইবেন, অন্যায়ও তাঁহা হইতে। আরও একটা কথা বাকি আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, ন্যায়বল, বাহুবলের কাছে কেহ নয়। বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য। মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারে রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাব্য; ইতিহাসের উপর নির্মিত কাব্য। অতএব এ কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান বুদ্ধ্যাদির উপরে। দ্বিতীয় স্তরের কবি দেখিতে পান যে, কেবল জ্ঞান ভ্রান্তি, বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি, সত্যাসত্য, এবং ন্যায়ান্যায় ঐশিক নিয়োগাধীন, ইহা বলিলেই রাজনৈতিক তত্ত্বটা সম্পূর্ণ হইল না, বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাই। তিনি ইহা

স্পষ্টীকৃত কবিরার জন্য মৌসলপর্ব প্রণীত করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বয়ং অর্জুন লগুড়ধারী কৃষকগণের নিকট পরাভূত হইলেন।

আমি যাহাকে ঐশিক নিয়োগ বলিতেছি, অথবা দ্বিতীয় স্তরের কবি যাহা ঈশ্বরপ্রেরণা বলিয়া বুঝেন, ইউরোপীয়েরা তাহার স্থানে "Law" সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে "Law" কোন স্থান পাইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি, যাহা "লর" উপরে, যাহা হইতে "Law" তাহা তাঁহারা ভালরূপে বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। কৃষ্ণকে কর্মক্ষেত্রে অবতারিত করিয়া, এই কবি সেই ঈশ্বরেচ্ছা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ঘটোৎকচবধ

জয়দ্রথবধে আর একটা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনৈসর্গিক কথা আছে। অর্জুন জয়দ্রথের শিরচ্ছেদে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, একটা উপদেশ দিই শুন। ইহার পিতা, পুত্রের জন্য তপস্যা করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফেলিবে, তাহারও মস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। অতএব তুমি উহার মাথা মাটিতে ফেলিও না। উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়া, যেখানে উহার পিতা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছে, সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অর্জুন তাহাই করিলেন। বুড়া সন্ধ্যা করিয়া উঠিবার সময় ছিন্ন মস্তক তাঁহার কোল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অমনি বুড়ার মাথা ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল।

অনৈসর্গিক বলিয়া কথাটা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচবধঘটিত বীভৎস কাণ্ড বর্ণিত করিতে আমি বাধ্য।

হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী তাহার ভগিনী। ভীম কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়া, রাক্ষসীটাকে বিবাহ করিলেন। বরকন্যা যে পরস্পরের অনুপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম ঘটোৎকচ। সেটাও রাক্ষস। সে বড় বলবান্। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহায্যার্থে দল বল লইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার কিছু বুদ্ধিবিপর্য্যয় দেখিতে পাই—সে প্রতিযোদ্ধৃগণকে ভোজন না করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে বাণাদির দ্বারা মানুষযুদ্ধ করিতেছিল। তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্যোধনের সেনার মধ্যে একটা রাক্ষসও ছিল। দুইটা রাক্ষসে খুব যুদ্ধ করে।

এখন, এই দিন, একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অন্য দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ হয়, আজ রাত্রেও আলো জ্বালিয়া যুদ্ধ। রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব ঘটোৎকচ দুর্নিবার্য হইল। কৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। কৌরবদিগের রাক্ষসটাও মারা গেল। কেবল কর্ণই একাকী ঘটোৎকচের সমকক্ষ হইয়া, রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ কর্ণও আর সামলাতেই পারেন না। তাঁহার নিকট ইন্দ্রদত্তা একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষাও অদ্ভুত এক গল্প আছে—পাঠককে তৎপঠনে পীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেই ব্যর্থ করিতে পারে না, এক জনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সে মরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরিবে না; তাই একপুরুষঘাতিনী। কর্ণ এই অমোঘ শক্তি অর্জুনবধার্থ

তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া তাহারই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত করিলেন। ঘটোৎকচ মরিল। মৃত্যুকালে বিন্ধ্যাচলের একপাদপরিমিত শরীর ধারণ করিল, এবং তাহার চাপে এক অক্ষৌহিণী সেনা মরিল!

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জনা করা যায়, কেন না, বালক ও অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর। কিন্তু তিনি তার পর যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কেবল তাঁহার নিজেই মনোহর। তিনি বলেন, ঘটোৎকচ মরিলে পাণ্ডবেরা শোককাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রথের উপর নাচিতে আরম্ভ করিলেন! তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ুরোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না। কিন্তু তবু রথের উপর নাচ! কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? এত নাচকাচ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, "কর্ণের নিকট যে অমোঘ শক্তি ছিল, যা তোমার বধের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ঘটোৎকচের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার আর ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে।" জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন। তখন সেই ঐন্দ্রী শক্তির কোন কথাই কাহারও মনে হয় নাই; কবিরও নহে। কিন্তু তখন মনে করিলে জয়দ্রথবধ হয় না; কর্ণ জয়দ্রথের রক্ষক। সুতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাক—এই শক্তিঘটিত বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য। যে কথাটা বলিবার জন্য, ঘটোৎকচবধের কথা তুলালাম, তাহা এই। কৃষ্ণ, অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিতেছেন,

"যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার হিতার্থ বিধি উদ্ভাবনপূর্বক ক্রমে ক্রমে মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, হিড়িম্ব, কির্মীর, বক, আলায়ুধ, উগ্রকর্মা, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি।"

কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্জুনের হিতার্থ নহে, শিশুপাল তাঁহাকে সভামধ্যে অপমানিত ও যুদ্ধ আহূত করিয়াছিল, এই জন্য বা যজ্ঞের রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্তা না হউন, প্রবর্তক কিন্তু সে অর্জুনহিতার্থ নহে, কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তিজন্য। কিন্তু বক, হিড়িম্ব, কির্মীর প্রভৃতি রাক্ষসদিগের বধের, এবং একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না, এবং ঘটনাকালে

উপস্থিতও ছিলেন না। মহাভারতে এক স্থানে পাই বটে, কৃষ্ণ একলব্যকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের কথা তাহার বিরোধী। ঘটনাগুলি, অর্থাৎ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ এবং রাক্ষসগণের বধ, প্রকৃত ঘটনাও নহে।

তবে, এ মিথ্যা বাক্য কৃষ্ণমুখে সাজাইবার উদ্দেশ্য কি?

এ সম্বন্ধে কেবল আর একটা কথা বলিব। ভক্তে বলিতে পারিবেন, কৃষ্ণ ইচ্ছার দ্বারা সকলই করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই হিড়িম্বাদি বধ, এবং ঘটোৎকচের প্রতি কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। এ কথা সঙ্গত নহে। কৃষ্ণই বলিতেছেন যে, তিনি বিবিধ "উপায় উদ্ভাবন" করিয়া ইহা করিয়াছেন। আর যদি ইচ্ছাময় সর্বকর্তা ইচ্ছাদ্বারা এ সকল কার্য সাধন করিবেন, তবে মনুষ্যশরীর লইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি ছিল? আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কোন কর্ম করেন না; পুরুষকার অবলম্বন করেন। তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন; সে কথা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। দেখা গিয়াছে যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াও যত্ন করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করিতে পারেন নাই বা কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আনিতে পারেন নাই। আর যদি ইচ্ছার দ্বারা কর্ম সম্পন্ন করিবেন, তবে ছাই ভস্ম জড়পদার্থ একটা শক্তি-অস্ত্রের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন?

ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহা পূর্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্বুদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত, কবি এই কথা বলিতে চাহেন। কর্ণ অর্জুনের জন্য ঐন্দ্রী শক্তি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘটোৎকচের উপর তাহা পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কর্ণের দুর্বুদ্ধি। কৃষ্ণ বলিতেছেন, সে আমি করাইয়াছি ; অর্থাৎ দুর্বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত। শিশুপাল দুর্বুদ্ধিক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহ্য অপমান করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ, সৈন্যসাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজেয়; পাণ্ডবের কথা দূরে থাক্; কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে ভীম তাঁহার অপেক্ষা বলবান্; একাকী ভীমের সঙ্গে মল্লের মত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাদৃশ রাজরাজেশ্বর সম্রাটের পক্ষে দুর্বুদ্ধি। কৃষ্ণোক্তির মর্ম এই যে, সে দুর্বুদ্ধিও আমার প্রেরিত। দ্রোণাচার্য অনার্য একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ চাহিয়াছিলেন। ঐ অঙ্গুষ্ঠ গেলে বহুকষ্টলব্ধ একলব্যের ধনুর্বিদ্যা নিষ্ফল হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। ইহা একলব্যের দারুণ দুর্বুদ্ধি। কৃষ্ণের কথার মর্ম এই যে, সে দুর্বুদ্ধি তাঁহার প্রেরিত—ঈশ্বরপ্রেরিত। রাক্ষসবধ সম্বন্ধেও ঐরূপ। এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—দ্রোণবধ

প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধ করিতেন, এমত নহে। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যোদ্ধার কথা মহাভারতেই আছে। দুর্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধান বীর ব্রাহ্মণ;— দ্রোণ, তাঁহার শ্যালক কৃপ, এবং তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায়, ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যারও আচার্য ছিলেন। দ্রোণ ও কৃপ, এইরূপ যুদ্ধাচার্য। এই জন্য ইঁহাদিগকে দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য বলিত।

এদিকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদ্‌ও বেশী। কেন না, রণেও ব্রাহ্মণকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক ঘটে। অন্ততঃ মহাভারতকার এই কারণ, ব্রাহ্মণ যোদ্ধৃগণকে লইয়া বড় বিপন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য কৃপ অশ্বত্থামা যুদ্ধে মরিল না। কৌরবপক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তাঁহারা দুই জনে মরিলেন না; তাঁহারা অমর বলিয়া গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্যকে না মারিলে চলে না; ভীষ্মের পর তিনি সর্বপ্রধান যোদ্ধা; তিনি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবেরা বিজয়লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধার্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইল। বিশেষতঃ দ্রোণাচার্যকে দ্বৈরথযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর অর্জুন ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্তু দ্রোণাচার্য অর্জুনের গুরু, এজন্য অর্জুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্থকার একটা কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পাণ্ডবভার্যা দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ রাজার সঙ্গে পূর্বকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল। দ্রুপদ, দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই—অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্ভূত হয়—নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি। তিনিই দ্রোণবধ করিবেন, পাণ্ডবদিগের এই ভরসা। যিনি ব্রহ্মবধার্থ দৈবকর্মজাত, ব্রহ্মবধ তাঁহার পক্ষে পাপ নয়।

কিন্তু মহাভারত এক হাতের নয়, নানা রচয়িতা নানা দিকে ঘটনাবলী যথেচ্ছা লইয়া গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইল, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন। অতএব দ্রোণ মরার ভরসা নাই—প্রত্যহ পাণ্ডবদিগের সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দ্রোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপাচারের পরামর্শ পাণ্ডব পক্ষে স্থির হইল। এই মহাপাপমন্ত্রণার কলঙ্কটা

কৃষ্ণের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। তিনিই ইহার প্রবর্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"হে পাণ্ডবগণ! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে দ্রোণাচার্যকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও তাঁহার বিনাশ করিতে পারে, অতএব তোমরা ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক উঁহারে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর।"

আর পাতা দশ বার পূর্বে যাঁহার মুখে কবি এই বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা, ধৈর্য অবস্থান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান করি।"*

* ঘটোৎকচবধ-পর্বাধ্যায়, ১৮২ অধ্যায়।

যিনি ভগবদ্গীতা-পর্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্মসংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই; যাঁহার চরিত্র, এ পর্যন্ত আদর্শ ধার্মিকের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, যাঁহার ধর্মে দার্ঢ্য শত্রুগণ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,# তিনি কি না ডাকিয়া বলিতেছেন, "তোমরা ধর্ম পরিত্যাগ কর! তাই বলিতেছিলাম, মহাভারত নানা হাতের রচনা; যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন।

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,

"আমার নিকট নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি উঁহার নিকট গমনপূর্বক বলুন যে অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।"

অর্জুন মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন, যুধিষ্ঠির কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। ভীম বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বত্থামা নামক একটা হস্তীকে মারিয়া আসিয়া দ্রোণাচার্যকে বলিলেন, অশ্বত্থামা মারিয়াছেন।?"! দ্রোণ জানিতেন, তাঁহার পুত্র "অমিতবলবিক্রমশালী, এবং শত্রুর অসহ্য"—অতএব ভীমের কথা বিশ্বাস করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিবার চেষ্টায় মনোযোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা সত্য কি না? যুধিষ্ঠির কখনও অধর্ম করেন না, এবং অসত্য বলেন না, এজন্য তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, অশ্বত্থামা কুঞ্জর মরিয়াছে—কিন্তু কুঞ্জর শব্দটা অব্যক্ত রহিল।!!

তাহাতেই বা কি হইল? দ্রোণ প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার আপনার সাধ্যের অতীত যুদ্ধ করিয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া দ্রোণহস্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্যের রথ ধারণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিলেন, তাহাই দ্রোণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ভীম বলিলেন,

"হে ব্রাহ্মণ! যদি স্বধর্মে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই ধর্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য; আপনিই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না?"

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ইহাতেও দুর্যোধনের ন্যায় দুরাত্মার মত ফিরিতে পারে না বটে, কিন্তু দ্রোণাচার্য ধর্মাত্মা; ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার পর অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চলিত। কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্রবাক্য দেখ।

! গোপালভাঁড় এইরূপ "কৃষ্ণ পাইয়াছিল।"

!! "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ"-এ কথাটা মহাভারতের নহে। বোধ হয় কথকেরা তৈয়ার করিয়া থাকিবেন। মূল মহাভারতে ইহা নাই। মহাভারতে আছে,

তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্যক্তমব্রবীদ্বাক্যং হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত || ১৯১ ||

এ কথার পর দ্রোণাচার্য অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার মাথা কাটিয়া আনিলেন।

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্যটা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যদি যথার্থ ঘটিয়া থাকে, তবে যিনি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তিনি মহাপাপে লিপ্ত। গ্রন্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের রথ ইতিপূর্বে পৃথিবীর উপর

চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই অপরাধে তাঁহার নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র নহে;—অনন্ত নরকই ইহার উপযুক্ত।

কৃষ্ণ এই মহাপাপের প্রবর্তক। এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী ধরিতে হয়। কিন্তু ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ পুণ্যের কর্তা ও বিধাতা, পাপপুণ্যই যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার আবার পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাঁহাকে স্পর্শিতে পারে না। এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি মনুষ্যদেহ-ধারণকালে পাপ তাঁহার আচরণীয়? তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ—পাপাচরণ দ্বারা কি ধর্মসংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য? তিনি স্বয়ং ত এরূপ বলেন না। তিনি গীতায় বলিয়াছেন,

"জনকাদি কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য (দৃষ্টান্তের দ্বারা) তুমি কর্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই করে; শ্রেষ্ঠ যাহা মানেন, লোক তাহারই অনুবর্তিত হয়। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই; আমার প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম করি। (কেন না) আমি যদি কদাচিৎ অতন্দ্রিত হইয়া কর্মানুবর্তন না করি, তবে মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথের অনুবর্তী হইবে।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩য় অঃ, ২০-২৩।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মানবাবতারে, স্বকার্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা ধর্মসংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্যের মধ্যে। অতএব স্বকর্মে মহাপাপের দৃষ্টান্ত তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে এ কাণ্ডটা কি? তাহার মীমাংসা স্থির না করিয়া আমি কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই নাই। কেন না, বৃন্দাবনের গোপী ও "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" ইহাই কৃষ্ণের প্রধান অপবাদ।

কাণ্ডটা কি? তাহার উত্তর, কাণ্ডটা সমস্তই অমৌলিক। যদি পাঠক মনোযোগপূর্বক আমার এই গ্রন্থখানি পড়িয়া থাকেন, তবে বুঝিয়া থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, অর্থাৎ এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহা এক হাতের নহে। তাহার কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত বা "প্রথম স্তর"। অপরাংশ অমৌলিক ও পরবর্তী কবিগণকর্তৃক মূলগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত। কোন্ অংশ মৌলিক, আর

কোন্ অংশ অমৌলিক ইহা নিরূপণ করা কঠিন। নিরূপণ জন্য আমি কয়েকটি সঙ্কেত পাঠককে বলিয়া দিয়াছি। সেইগুলি এখন পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে।

(১) তাহার মধ্যে একটি এই,—

"শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।"

উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, যদি কোথাও ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা দেখি, তবে জানিব, ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; এক মাত্রায় নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুনিপাত যাদৃশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর কোন দুই বস্তুই হইতে পারে না। তার পর মহাতেজস্বী, বলগর্বশালী, ভয়শূন্য ভীমের চরিত্রের সঙ্গেও ইহা তদ্রূপ অসঙ্গত। ভীম বাহুবল ভিন্ন আর কিছু মানেন না—শত্রুর বিরুদ্ধে আর কিছু প্রয়োগ করেন না; রাজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থেও নহে। স্থানান্তরেও কথিত আছে, অশ্বত্থমা নারায়ণাস্ত্র নামে অনিবার্য দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন–তাহাতে সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পারে। দিব্যাস্ত্রবিৎ অর্জুনও তাহার নিবারণে অক্ষম; সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি উপায় ছিল—এই দৈবাস্ত্র সমরবিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সমস্ত পাণ্ডবসেনা ও সেনাপতিগণ, রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক বিমুখ হইয়া বসিলেন; কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জুনকেও তাহা করিতে হইল। কেবল, ভীম কিছুতেই তাহা করিলেন না,—বলিলেন, "আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দিত করতঃ অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবতশুণ্ডসদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুতনাগতুল্য বলশালী; দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকে আমিও তদ্রূপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্রনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীর্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডবসমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদন্দ্বী হইব।" স্বীকার করি, বড়াই

বড় বেশী, গল্পটাও নিতান্ত আষাঢ়ে। তা হৌক—সত্য বলিয়া কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে না। কবিপ্রণীত চরিত্রচরিত্রের সুসঙ্গতি লইয়া কথা কহিতেছি। নারায়ণস্ত্রমোক্ষ মৌলিক না হইতে পারে, কিন্তু এই ছাঁচে মৌলিক মহাভারতে সর্বত্রই ভীমের চরিত্র ঢালা। ইহার সঙ্গে ভীমের সেই শৃগালোপম দ্রোণপ্রবঞ্চনা কতটা সুসঙ্গত? এই ভীম কি স্ত্রীলোকেরও ঘৃণাস্পদ যে শত্রুবধোপায়, তাহা অবলম্বন করিতে পারে? দ্রোণাচার্যের অপেক্ষা নারায়ণাস্ত্র সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর; সে নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখে সিংহের ন্যায় দৃপ্ত, যাহাকে বলপ্রয়োগ ব্যতীত** নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখ হইতে কেহ বিমুখ করিতে পারিল না, তাহাকে অর্জুনের প্রতিযোদ্ধা মাত্র দ্রোণের ভয়ে শৃগালধমের ন্যায় কার্যপ্রবৃত্ত বলিয়া যে কবি বর্ণনা করিয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায়? মহাভারত প্রণয়ন কি তাঁহার সাধ্য?

তবে নিহত অশ্বত্থামাগজের এই গল্প, ভীমের চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত; যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিয়াছি, কিন্তু ভীমের চরিত্রের সঙ্গে ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে ইহার যতটা অসঙ্গতি, তদপেক্ষা কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গতি আরও বেশী। যদি আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই অসঙ্গতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি; কৃষ্ণে শ্বেতে; তাপে শৈত্যে; মধুরে কর্কশে; রোগে স্বাস্থ্যে; ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গতি, ইহাও তত। যখন মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ গল্পের এত অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্যকবিপ্রণীত বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি।

** অর্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে বলপূর্বক রথ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্ অংশ মৌলিক, কোন্ অংশ অমৌলিক, ইহার নির্বাচন জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একটির দ্বারা পরীক্ষা করায় এই হতগজবৃত্তান্তটা অমৌলিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আরেকটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। আর একটি সূত্র এই যে, দুইটি বিবরণ পরস্পরবিরোধী হইলে, তাহার একটি প্রক্ষিপ্ত। এখন মহাভারতে, ঐ অশ্বত্থামাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রোণবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই। একটিই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু দুইটি একত্র জড়ান হইয়াছে। আমরা সেই স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক্ করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা বুঝাইবার জন্য, অগ্রে

আমার বলা উচিত যে, দ্রোণ অধর্মযুদ্ধ করিতেছিলেন। মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র একটি। আজি এ দেশের লোকে, যে উপায়ে যে কার্যসাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই কার্যের "ব্রহ্মাস্ত্র" বলে। এই ব্রহ্মাস্ত্র অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধর্ম, ইহাই ঋষিদিগের মত। দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছিলেন। এমন সময়ে,—

"বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, প্রশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্যকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহারে ব্রহ্মালোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্মযুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা এবং সত্যধর্মপরায়ণ; অতএব এরূপ কার্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগপূর্বক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্যলোকনিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রূরকার্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্তব্য নহে।"

ইহাতেই দ্রোণাচার্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট অশ্বত্থামার মৃত্যু শুনিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পূর্বে বলিয়াছি। তার পরেও তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিলে, যদুবংশীয় সাত্যকি আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা সম্পাদন করিলেন। সাত্যকির সঙ্গে কেহই যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। দ্রোণও নিবারিত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন,—

"হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্নসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রুপদনন্দনের কার্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।"

এই কথার পর, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাভারত হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত, ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সূর্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশপূর্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্যের অস্ত্র সকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন, এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্মযুদ্ধ অবলম্বনপূর্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন।"

পাঠক দেখিবেন যে, এখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণপরম্পরার মধ্যে অশ্বত্থামার মৃত্যুসম্বাদ পরিগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেষ্ট।

দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়িলেন না। মহাভারতকার দশ হাজার সৈন্যধ্বংসের কম কথা কন না, তিনি বলেন, তার পরেও দ্রোণাচার্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্বার পরাভূত করিলেন। এবার ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্যের রথ ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস, রথগুলা ধরিয়া আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন##) সেই পূর্বোদ্ধৃত তীব্র তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কারে দ্রোণ যথার্থ আয়ুধ ত্যাগ করিলেন,—

"এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্বক সমস্ত জীবকে অভয়প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশরশরাশন অবস্থানপূর্বক করবাল ধারণপূর্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বহির্ভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার-শব্দ সমুত্থিত হইল। এদিকে জ্যোতির্ময় মহাতপা দ্রোণাচার্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করতঃ সাধুজনেরও দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।"

তার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়া গেলেন।

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দুইটি সম্পূর্ণরূপে যে পরস্পরের বিরোধী, তাহা নহে; একত্রে গাঁথা যায়। একত্রে গাঁথাও আছে—ভাল জোড় লাগে নাই, মোটারকম রিপুকর্ম, স্থানে স্থানে ফাঁক পড়িয়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি বিবরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, দুইটির প্রয়োজন নাই। একজন কবির এইরূপ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ জোড়া দিবার চেষ্টা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দুই জন কবির প্রণীত বলিয়া কাজেই স্বীকার করিতে হয়। কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত? দ্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত হইতে উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অতএব অশ্বত্থামার মৃত্যুঘটিত বৃত্তান্তটি প্রকৃত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যে সকল সূত্রে পূর্বে সংস্থাপিত করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেই ইহার মীমাংসা হইবে।

আমরা বলিয়াছি যে, যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরোধী বিবরণের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির হইবে, তখন কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, তাহা মীমাংসার জন্য দেখিতে হইবে, কোন্‌টি অন্য লক্ষণের দ্বারা পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। যেটি অন্য লক্ষণেও ধরা পড়িবে, সেইটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব।* আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, অশ্বত্থামাবধসংবাদবৃত্তান্ত, কৃষ্ণ, ভীম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমরা পূর্বে এই একটি লক্ষণ স্থির করিয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।# অতএব এই অশ্বত্থামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) আরও একটি কথা আছে। দেখিয়াছি যে, অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদে দ্রোণ যুদ্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ একথা বলাইলেন কেন? দ্রোণের যুদ্ধে নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া? সম্ভাবনা কোথা? দ্রোণ জানেন, অশ্বত্থামা অমর। সে কথা অনৈসর্গিক বলিয়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম। সামান্য মানুষের, তোমার আমার অথবা একটা কুলি মজুরের যে বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধিও কৃষ্ণের ছিল, যদি এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, কৃষ্ণের এরূপ পরামর্শ দিবার সম্ভাবনা ছিল না। দ্রোণই হউক আর যেই হউক, এরূপ সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইবার আগে, একবার স্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা

করিবেন না যে, অশ্বত্থামা মরিয়াছে কি? অশ্বত্থামার অনুসন্ধানে পাঠাইবেন না? তাহাই নিতান্ত সম্ভব। তাহা ঘটিলে জুয়াচুরি তখনই সমস্ত ফাঁসিয়া যাইবে।
রথগুলা যদি "এক্কার মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহা পারে।
* ৩৪ পৃষ্ঠা (৬) সূত্র দেখ।
# ৩৩ পৃষ্ঠা (৪) সূত্র দেখ।

অতএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা। আমি এমত বলি না যে, ঋষিবাক্যে দ্রোণের অস্ত্র পরিত্যাগ করাই সত্য। ঋষিদের সেই রণক্ষেত্রে আগমন অনৈসর্গিক ব্যাপার, সুতরাং তাহাও অপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। ইহার মধ্যে প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য কথা এই হইতে পারে যে, দ্রোণ অধর্মাচরণ করিতেছিলেন—ভীমের তীব্র তিরস্কারে তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে—অপটুতা এবং দুর্যোধনকে বিপৎকালে পরিত্যাগ, এই উভয় দোষেই দূষিত হইতে হইবে। অতএব মৃত্যুই স্থির করিলেন। বোধ হয়, এতটুকু একটু কিংবদন্তী ছিল—তাহারই উপর মহাভারতের উপর স্তর নির্মিত হইয়াছিল। হয়ত, তাহাও যথার্থ ঘটনা নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটনা এই পর্যন্ত যে, দ্রোণ যুদ্ধে দ্রুপদপুত্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন; পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে তাই বুঝায়; তার পর প্রবলপ্রতাপ পাঞ্চালবংশকে ব্রহ্মহত্যাকলঙ্ক হইতে উদ্ধৃত করিবার জন্য নানাবিধ উপন্যাস প্রস্তুত হইয়াছে।

(৪) এখন দেখা যাউক অনুক্রমণিকাধ্যায়ে, এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে এই মাত্র আছে যে—

"যদাশ্রৌষং দ্রোণমাচার্যমেকং ধৃষ্টদ্যুম্নেনাভ্যতিক্রম্য ধর্মম্।
রথোপস্থে প্রায়গতং বিশস্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ||"

অর্থ। হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, এক আচার্য দ্রোণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্মাতিক্রমপূর্বক প্রায়োপবিষ্ট অবস্থায় রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই।

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কেহ অধর্মাচরণ করে নাই। ধৃষ্টদ্যুম্নেরও পাপ এই যে, প্রায়োপবিষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত করিয়াছিলেন। দ্রোণের প্রায়োপবেশনের কারণ এখানে কিছু কথিত হয় নাই। যুধিষ্ঠিরবাক্যে বা ঋষিগণের বাক্যে বা ভীমের তিরস্কারে, তাহা কিছু কথিত হয়

নাই। পশ্চাৎ দেখিব, তিনি পরে শ্রান্ত হইয়াই, নিহত হয়েন। আসন্নমৃত্যু ব্রাহ্মণের প্রায়োপবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ।

(৫) পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই—"দ্রোণে যুধি নিপাতিতে," এ ছাড়া আর কিছুই নাই। হত গজের কথাটা সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাকিত। অভিমন্যুর অধর্মযুদ্ধে মৃত্যুর কথা আছে—দ্রোণেরও অবশ্য থাকিত। গল্পটা তখনও তৈয়ার হয় নাই, এজন্য নাই।

(৬) তার পর, দ্রোণপর্বের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে দ্রোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তাহাতেও এই জুয়াচুরির কোন প্রসঙ্গ নাই। কেবল আছে যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিপাতিত করিলেন। এই অধ্যায়গুলি যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্পটা তৈয়ার হয় নাই।

(৭) আশ্বমেধিক পর্বে আছে যে, কৃষ্ণও দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে, বসুদেব কৃষ্ণের নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধবৃত্তান্ত সংক্ষেপে শুনাইলেন। দ্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণ ইহাই বলিলেন যে, দ্রোণাচার্যে ও ধৃষ্টদ্যুম্নে পাঁচ দিন যুদ্ধ হয়। পরিশেষে দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নহস্তে নিহত হইলেন। বোধ হয়, এইটুকুই সত্য; এবং যুবার সহিত যুদ্ধে বৃদ্ধের শ্রান্তিই দ্রোণের যুদ্ধবিরতির যথার্থ কারণ। আর সকলই কবিকল্পনা বা উপন্যাস। নিতান্তই যে উপন্যাস, তাহার সাত রকম প্রমাণ দিলাম।

কিন্তু সেই উপন্যাস মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রবর্তক বলিয়া স্থাপিত করিবার কারণ কি? কারণ পূর্বে বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে, যেমন জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, অজ্ঞান বা ভ্রান্তিও তাই। জয়দ্রথবধে কবি তাহা দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও ঈশ্বরপ্রেরিত। ঘটোৎকচবধে কবি দেখাইয়াছেন যে, যেমন বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্বুদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত। আরও বুঝাইয়াছি যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের। এই দ্রোণবধে কবি তাহাই দেখাইলেন।

ইহার পর, নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ-পর্বাধ্যায়। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বিস্তারিতের প্রয়োজন নাই, কেন না, নারায়ণাস্ত্র বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং পরিত্যাজ্য। তবে এই পর্বাধ্যায়ে একটা রহস্যের কথা আছে।

দ্রোণ নিহত হইলে অর্জুন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর। মিথ্যা কথা বলিয়া গুরুবধসাধনজন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের নিন্দা করিলেন। যুধিষ্ঠির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীম অর্জুনকে

কড়া রকম কিছু শুনাইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অর্জুনশিষ্য যদুবংশীয়, সাত্যকি, অর্জুনের পক্ষ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভারি রকম গালিগালাজ দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সুদ সমেত ফিরাইয়া দিলেন। তখন দুই জনে পরস্পরের বধে উদ্যত। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও সহদেব থামাইয়া দিলেন। বিবাদটা এই যে, মিথ্যা কথা বলিয়া দ্রোণের মৃত্যুসাধন করা কর্তব্য ও অকর্তব্য কি না, এই তত্ত্ব লইয়া দুই পক্ষে যত কথা আছে, সব বলিলেন, কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। কেহই বলিলেন না যে, কৃষ্ণের কথায় এরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন না। পাঁচ হাতের কাজ না হইলে এমন ঘটে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব

যিনি অশ্বত্থামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি অর্জুনকে বড় উচ্চ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষা তাঁহার ধার্মিকতা অনেক বেশী, এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যাহার প্রস্তাবকর্তা কৃষ্ণ, এবং যাহা পরিশেষে ভীম ও যুধিষ্ঠির সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্জুন তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না; বরং তজ্জন্য যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, তাহাতে অর্জুন অতি মূঢ় ও পাষণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং কৃষ্ণের নিকট ধর্মোপদেশ পাইয়াই সৎপথ অবলম্বন করিতেছেন। বৃত্তান্তটা এই :—

দ্রোণের পর কর্ণ দুর্যোধনের সেনাপতি। তাঁহার যুদ্ধে পাণ্ডবসেনা অস্থির। যুধিষ্ঠির নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাঁহাকে এরূপ সন্তাড়িত করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়া শিবিরে লুক্কায়িত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। এদিকে অর্জুন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অর্জুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই যে, আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে চটিয়া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অর্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন। শেষে বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর।

শুনিয়া অর্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তরবারি দিয়া কাহাকে বধ করিবে? অর্জুন বলিলেন, "তুমি অন্যকে গাণ্ডীব* শরাসন সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব, এই আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথা কহিয়াছেন, অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করতঃ নিশ্চিন্ত হইব।"

কথাটা মূঢ় ও পাষণ্ডের মত হইল—অর্জুনের মত নহে। একে ত, গাণ্ডীব অন্যকে দাও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মূঢ়তার কাজ। তার পর পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাজ। তবে ইহার ভিতর

গুরুতর কথা আছে; তাহার বিস্তারিত মীমাংসা কৃষ্ণ কর্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য।

কথাটা এই, সত্য পরম ধর্ম। যদি অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে তাঁহাকে সত্যচ্যুত হইতে হয়। অর্জুনের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা তাঁহার কর্তব্য কি না। অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্তব্য?"

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা বুঝাইবার পূর্বে, আমরা পাঠককে অনুরোধ করি যে, আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয় উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অর্জুনের কর্তব্য নহে। কৃষ্ণও সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নীতিপণ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন না। তিনি প্রাচ্যনীতির বশবর্তী হইয়াই এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না—বুঝাইতে হইবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলণ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে সুপণ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি তখন হয়ও নাই; এবং কৃষ্ণ তন্মার্গাবলম্বী হইলে অর্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না।

* পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না, গাণ্ডীব অর্জুনের ধনুকের নাম। উহা দেবদত্ত, অবিনশ্বর এবং শরাসন মধ্যে ভয়ঙ্কর।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্ত্বের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার স্থূলমর্ম বলিতেছি—অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

তাঁহার পরম কথা "অহিংসা পরম ধর্ম"। ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে, সকল স্থানে অহিংসা ধর্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাপর্বাধ্যায়ে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার বিপরীত।

যিনি অহিংসাতত্ত্বের যথার্থ মর্ম না বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। অহিংসা পরম ধর্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা করিলে অধর্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা ঐশিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র অণুবীক্ষণদৃশ্য জীব উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃক্ জীব নাসাপথে

প্রেরিত করি, প্রতি পদার্পণে সহস্র সহস্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে রাঁধিয়া খাই। যদি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই; আমি তাহার উত্তরে বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসা ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক, আমার গৃহে বা আমার শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাঘ্র আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য লম্ফনোদ্যত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহে-প্রবেশপূর্বক সর্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাতে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্মানুগত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারীকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্মতঃ বাধ্য। এবং সে রাজপুরুষের উপর বধার্হের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক্ বা নাপোলেয়ন্ পরস্ব ও পররাষ্ট্রপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পররাজ্যপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম।

পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, ভোজন জন্যই হউক বা খেলার জন্যই হউক, তাহার নিপাত অধর্ম। যে মাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ক্রীড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিল, তাহা অধর্ম। যে মৃগ বা যে কুক্কুট তোমার আমার ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরম্ভরী যে তাহাকে বধ করিয়া খায়, সে অধর্ম। আমরা বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব; মৎস্য, জলপ্রবাহের উপরিচর জীব; মৎস্য, জলপ্রবাহের উপিচর জীব; আমরা তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর্ম।

তবে অহিংসা পরম ধর্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ধর্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম নহে; বরং পরম ধর্ম। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলাকের ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণিগণের বিশেষবিনাশহেতু এক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র

তাহার উপর “আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অপ্সরোদিগের অতি মনোরম গীত-বাদ্য আরম্ভ হইল, এবং সেই ব্যধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।” ব্যাধের পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংসা করিয়াছিল।

অহিংসা পরম ধর্ম, এই অর্থে বুঝিতে হইবে। তবে, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিবে না, এ কথায় একটা ভারি গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম্য প্রয়োজন কি? ধর্ম কি? Inquisition কর্তৃক মনুষ্যবধে ধর্ম্ম্য প্রয়োজন আছে বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। ধর্মার্থই, St. Bartholomew হত্যাকাণ্ড। ধর্মাচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেডওয়ালাদিগের দ্বারা পৃথিবী নরশোণিত প্রবাহে পঙ্কিল হইয়াছিল। ধর্মবিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ মনুষ্যহত্যা করিয়াছিল। বোধ হয়, ধর্মপ্রয়োজন সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পড়িয়া মনুষ্য যত মনুষ্য নষ্ট করিয়াছে, তত মনুষ্য আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই।

অর্জুনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত। তিনি মনে করিয়াছেন যে, সত্যরক্ষাধর্মার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা কর্তব্য। অতএব কেবল অহিংসা পরম ধর্ম, এ কথা বলিলেও তাঁহার ভ্রান্তির দূরীকরণ হয় না। এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা।

সে দ্বিতীয় কথা এই যে, বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্তব্য নহে।* ইহার স্থূল তাৎপর্য এই যে, অহিংসা ও সত্য, এই দুইয়ের মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইহার অর্থ এই:— নানাবিধ পুণ্য কর্মকে ধর্ম বলিয়া গণনা করা যায়; যথা—দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নহে; ইতরবিশেষ হওয়াই সম্ভব। শৌচের মাহাত্ম্য বা দানের মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা না হয়, যদি তারতম্য থাকে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার নীচে।

আমরা পাশ্চাত্ত্যের শিষ্য! অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়া উঠিবেন। পাশ্চাত্ত্যেরা নাকি বলিয়া থাকেন, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। তা না হয় হইল; সে কথা এখন উঠিতেছে না। এমন কেহই বলিবেন না যে, পাশ্চাত্ত্যদিগের মতে একজন মিথ্যাবাদী একজন হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাপী। তাঁহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় দণ্ডবিধিশাস্ত্র তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের শিষ্যগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল

পাপের তারতম্যের কথা হইতেছে। কোন অধর্মই কোন সময়ে করিতে নাই। নরহত্যাও করিতে নাই, মিথ্যা কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যদি এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে বরং মিথ্যা কথা বলিবে, তথাপি নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ ধর্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যে, বলেন যে, বরং নরহত্যা করিবে, তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তাঁহার ধর্ম তাঁহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়।

কৃষ্ণের এই মত। যদি অর্জুন ইহার অনুবর্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাপ হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু অর্জুন বলিতে পারেন, "এ ত গেল তোমার মত। কিন্তু লৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যদি প্রচলিত ধর্মানুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাত্মা বলিয়া কলঙ্কিত হইব।" এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়া প্রচলিত ধর্ম যাহা, তাহা বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, "হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বলিয়া বলিলেন,

* যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণকথিত এই ধর্মতত্ত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করা কর্তব্য।

প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন ||

পাঠক দেখিবেন, অহিংসা পরমধর্ম, এটা কৃষ্ণবাক্যের ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক অনুবাদ—"আমার মতে প্রাণিগণের অহিংসা সর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।" অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়া "অহিংসা পরমধর্ম" ইতিপরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি।

"সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।* সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য।"

এই গেল স্থূলনীতি। তারপর বর্জিত তত্ত্ব বলিতেছেন,

"কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ, ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে।"

কিন্তু কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার যথাসাধ্য বিচার করিব। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"বিবাহ রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না।"

এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাক। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে উল্লিখিতরূপ আছে। উহা একটি শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে ঐ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে। দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি;

১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ
সর্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ||

২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ||

এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, এই প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনিই উদয় হইবে, একই অর্থবাচক দুইটি শ্লোকের প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তর এই যে, এই দুইটিই অন্যত্র হইতে উদ্ধৃত—Quotation—কৃষ্ণের নিজোক্তি নহে। সংস্কৃতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, অন্যত্র হইতে বচন ধৃত হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের। এই মহাভারতীয় গীতা-পর্বাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রন্থান্তরে দিয়াছি।

আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, এ বচন দুইটি অন্যত্র হইতে ধৃত। দ্বিতীয় শ্লোকটি, যথা—"বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে" ইত্যাদি—ইহা বশিষ্ঠের বচন। পাঠক বশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ শ্লোকে তাহা দেখিবেন; ইহা মহাভারতের আদিপর্বে, ৩৪১২ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি নস স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ||

চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই "পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি" আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়।

প্রথম শ্লোকটির পূর্বগামী শ্লোকের সহিতে লিখিতেছি;

(ক) ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

(খ) যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ ||

(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

(ঘ) সর্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ||

* "ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।" ইতিপূর্বে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্মতো মম।" এই দুইটি কথা পরস্পরবিরোধী। তাহার কারণ, একটি কৃষ্ণের মত, আর একটি ভীষ্মাদিকথিত প্রচলিত ধর্মনীতি।

এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্ব হইতে একটি (১৩৮৪৪) শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি–কৃষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই।

(চ) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

(ছ) অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ ||

পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ) (ছ) একই শব্দগুলিও প্রায় একই। অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন।

ইহা কৃষ্ণের মত নহে; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহা বলিতেছেন না; ভীষ্মাদি কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন, নিজের অনুমোদিত হউক বা না হউক, কেন তিনি ইহা অর্জুনকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্রে এ নীতির যাথার্থ্যাযা বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বাকি আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থাবিশেষে সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়; এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রযোক্তব্য। একথা তিনি পরে বলিতেছেন।

প্রথমে বিচার্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, সত্য মিথ্যা হয়? ইহার স্থূল উত্তর এই যে, যাহা ধর্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্মের অনুমোদিত, তাহাই মিথ্যা। ধর্মানুমোদিত মিথ্যা নাই; এবং অধর্মানুমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য মীমাংসা ধর্মাধর্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলাতে গীতার উদারনীতির গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতেছেন,

"ধর্ম ও অধর্ম তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্বোধ ধর্মের নির্ণয় করিতে হয়।"

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তার পর,

"অনেকে শ্রুতিরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমস্ত ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই; এই জন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।"

এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। যাঁহারা বলেন যে, যাহা দৈবোক্তি বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক,—তাহাতে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম—তাহার বাহিরে ধর্ম কিছুই নাই—তাঁহারা আজিও বড় বলবান। তাঁহাদের মতে ধর্ম দৈবোক্তিনির্দিষ্ট অনুমানের বিষয় নহে। এ কথা মনুষ্যজাতির উন্নতির পথে বড় দুরুত্তীর্য কণ্টক। আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত উন্নিতর পথ রোধ করিতেছে। আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। আজিও ভারতবর্ষের ধর্মজ্ঞান বেদ ও মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতির দ্বারা নিরুদ্ধ;—অনুমানের পথ নিষিদ্ধ। অতি দূরদর্শী মনুষ্যাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি—প্রাচীন কালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্দুসমাজের ধর্মজ্ঞান দেখিয়া বিষণ্ণমনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু অনুমানের একটা মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের উপর অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধূমবান্ পর্বত বহ্নিমান্ও বটে, তেমনি একটা লক্ষণ চাহি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই কর্মটা ধর্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার লক্ষণ নির্দিষ্ট করিতেছেন।

"ধর্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্মনামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম।"

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণনির্দেশ। কথাটায়, এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকার অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় Utilitarian রকমের ধর্ম। বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইতেছি যে, ধর্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা যায় না; জগদীশ্বরের সার্বভৌতিকত্ব এবং সর্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্মে বলে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ ধর্মলক্ষণ।

পূর্বে বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্মানুমোদিত, তাহাই সত্য; যাহা ধর্মানুমোদিত নহে, তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহা সর্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের

অহিতকর, তাহাই মিথ্যা। এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে; এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা ধর্মতঃ সত্য হইতে পারে। এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ এবং সত্যও মিথ্যাস্বরূপ হয়।

উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্তব্য। এইরূপ স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্বেই কৃষ্ণ কৌশিকের উপাখ্যান অর্জুনকে শুনাইয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান এই,

"কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি তাহা অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।"

এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দস্যু; পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য—নহিলে তাঁহার কোন পাপই নাই। যদি তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বারা পাপাচরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ। আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখন মিথ্যা হয় না, এবং কোন সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য নহে। সুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে পারে। যাঁহারা ইহার নিন্দা করিবেন (আমি ইহা সমর্থনও করিতেছি না), তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ

উত্তর মৌনাবলম্বন করা উচিত ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দস্যুরা মৌনী থাকিতে না দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌনরক্ষা করা উচিত ছিল। তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঈদৃশ ধর্ম পৃথিবীতে সাধারণতঃ চলিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের মনে পড়িল। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেহপ্যনুপদেশঃ।"* এরূপ ধর্মপ্রচার চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য।

* প্রথম অধ্যায়, ৯ সূত্র।

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়,

অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজতঃ।

তাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি এইরূপে ধর্মতত্ত্ব বুঝেন, তাহার ধর্মবাদ যথার্থই হউক, অযথার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে।

প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে, হত্যাকারীর জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম। যিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি এই সত্যতত্ত্ব কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নহিলে যে যাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম; এবং তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধর্ম করে।

কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ত্ব নির্দোষ এবং মনুষ্যসাধারণের অবলম্বনীয় কি না, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝাইবার জন্য উহা পরিস্ফুট করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্ত্যেরা যে কারণে বলেন যে, সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই অপরিহার্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধর্ম-সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারী, সেইখানেই ধর্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয়, সেখানে অধর্ম, ইহাই যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন এবং মনুষ্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে,—যে লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, সত্য অবলম্বনীয় বা মিথ্যা অবলম্বনীয়, এ কথার

মীমাংসা কে করিবে? যে সে মীমাংসা করিবে। যে সে মীমাংসা করিতে বসিলে, মীমাংসা কখন ধর্মানুমোদিত হইতে পারে না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই অতি সামান্য; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচারশক্তি অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইন্দ্রিয়ের বেগ, স্নেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, মোহ ইত্যাদির প্রকোপ। সত্য নিত্যপালনীয়, এরূপ ধর্মব্যবস্থা না থাকিলে, মনুষ্যজাতি সত্যশূন্য হইবার সম্ভাবনা।

প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে তাহা বুঝিতেন না, এমত নহে। বুঝিয়াই তাঁহারা বিশেষ করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম প্রভৃতি ঋষিদিগেরও মতও সেই প্রকার। তাঁহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহা ধর্মানুমত কি না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব পরিস্ফুট করাই আমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি ব্যতীত, এই সাধারণ বিধি কার্যে পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুরূহ। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা নির্দেশ করিলেই লোককে ধর্মানুমত সত্যাচরণ বুঝানা যায় না। তিনি তৎপরিবর্তে কি জন্য, এবং কিরূপ অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লঙ্ঘন কর উচিত, তাহাই বলিতেছেন। আমরা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছি।

দান, তপ, শৌচ, আর্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্যকে ধর্ম বলা যায়। ইহার সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবশেষে অধর্ম। অনুপযুক্ত প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্বক বলিতেছেন, "সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্মাচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।" সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি এই;

"যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়।"

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব এইরূপ। ইহার স্থূল তাৎপর্য এইরূপ বুঝা গেল যে,

১। যাহা ধর্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম।

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

৪। এইরূপ সত্য সর্বদা সর্বস্থানে প্রযোক্তব্য।

কৃষ্ণভক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতত্ত্ব কোথাও কথিত হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি তাহা না পার, তবে ইহাই আদর্শ মনুষ্যোচিত বাক্য বলিয়া স্বীকার কর।

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম, আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে, যে উপধর্মের ভস্মরাশিমধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা অনল্পকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্যব্যয় ও নিষ্ফল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সৎকর্ম ও সদনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজ প্রভান্বিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত—লোকহিত পরিত্যাগ করিযা তিথিতত্ত্ব মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন্ জাতি অধঃপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্রিত হইয়া, নমো ভগবতে বাসুদেবায় বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, তদুপদিষ্ট এ লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব।* তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।

* বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না?

সপ্তম পরিচ্ছেদ—কর্ণবধ

অর্জুন কৃষ্ণের কথা বুঝিলেন, কিন্তু অর্জুন ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল। অতএব যাহাতে দুই দিক্ রক্ষা হয়, কৃষ্ণকে তাহার উপায় অবধারণ করিতে বলিলেন।

কৃষ্ণ বলিলেন, অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ। তুমি যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক একটা কথা বল, তাহা হইলেই, তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক বাক্যে ভর্ৎসিত করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে আবার এক বিপদে ফেলিলেন। বলিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছি, অতএব আত্মহত্যা করিব। এই বলিয়া আবার অসি নিষ্কোষিত করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহারও মৃত্যু সোজা ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, আত্মশ্লাঘা সজ্জনের মৃত্যুস্বরূপ। কথাটা কিছুমাত্র অন্যায় নহে। অর্জুন তখন অনেক আত্মশ্লাঘা করিলেন। তখন সব গোল মিটিয়া গেল।

কৃষ্ণ, অর্জুনের সারথি, কিন্তু যেমন অর্জুনের অশ্বের যন্তা, তেমনি এখন স্বয়ং অর্জুনেরও নিয়ন্তা। কখনও অর্জুনে আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জুন চলেন। এখন কৃষ্ণ, অর্জুনকে কর্ণবধে নিযুক্ত করিলেন।

এই কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। বহুকাল হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়া আসিতেছে। কর্ণই অর্জুনের প্রতিযোদ্ধা। ভীমার্জুন নকুল সহদেব চারি জনে যুধিষ্ঠিরের জন্য দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, কর্ণ একাই দুর্যোধনের জন্য দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। অর্জুন দ্রোণের শিষ্য, কর্ণদ্রোণগুরু পরশুরামের শিষ্য। অর্জুনের যেমন গাণ্ডীব ধনু ছিল, কর্ণের তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিজয় ধনু ছিল। অর্জুনের কৃষ্ণ সারথি, মহাবীর শল্য কর্ণের সারথি, উভয়ে অনেক দিব্যাস্ত্রে শিক্ষিত। উভয়েই পরস্পরের বধের জন্য বহুদিন হইতে প্রতিজ্ঞাত। অর্জুন ভীষ্মদ্রোণবধে কিছুমাত্র যত্নশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাঁহার দৃঢ় যত্ন। কুন্তী যখন কর্ণকে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত অবগত করিয়া, তাঁহার নিকট আর পাঁচটি পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, তখন কর্ণ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা মাতাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জুনের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন না। তাঁহাকে বধ করিবেন, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইবেন, ইহা নিশ্চিত জানাইলেন।

সেই মহাযুদ্ধে অদ্য অর্জুনকে কৃষ্ণ লইয়া যাইলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে লইয়া আসিয়াছিলেন। ভীম অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের

সন্ধানে যাইতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রণ শেষ না করিয়া অর্জুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণ জিদ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত যে, কর্ণ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হউন, অর্জুন ততক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনস্তেজস্বী হউন। এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া যাইবার সময়ে আরও অর্জুনের তেজোবৃদ্ধি জন্য অর্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহার পূর্বকৃত অতিদুর্ধর্ষ কার্য সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। দ্রৌপদীর অপমান, অভিমন্যুর অন্যায়যুদ্ধে হত্যা প্রভৃতি কর্ণকৃত পাণ্ডবপীড়ন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, "পূর্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন," "পূর্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইলে" ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচয় দেন না। দেবত্বে কোন অধিকার প্রকাশ করেন না, ইহা প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে, অন্য ভাব।

পরে কর্ণার্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্জুন উহার নিবারণ করিতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অর্জুনের রথ ভূমিতে কিঞ্চিৎ বসাইয়া দিলেন, অশ্বগণ জানু পাতিয়া পড়িয়া গেল। অর্জুনের মস্তক বাঁচিয়া গেল; কেবল কিরীট কাটা পড়িল। অর্জুন নিজে মস্তক অবনত করিলেও সেই ফল হইত। কথাটা সমালোচনার যোগ্য নহে। তবে কৃষ্ণের সারথ্যের প্রশংসা মহাভারতে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়।

যুদ্ধের শেষ ভাগে কর্ণের রথচক্র মাটিতে বসিয়া গেল। কর্ণ তাহা তুলিবার জন্য মাটিতে নামিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্য অর্জুনের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অর্জুনও ক্ষমা করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে, কেন না, কর্ণ তাহার পর আবার রথে উঠিয়া পূর্ববৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে, ক্ষমা প্রার্থনাকালে তিনি অর্জুনকে এমন কথা বলিয়াছিলেন যে, ধর্মতঃ তিনি ঐ সময়ের জন্য কর্ণকে ক্ষমা করিতে বাধ্য; কৃষ্ণ অধর্মের শাস্তা। তিনি কর্ণকে তখন বলিলেন,

"হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগকে দুষ্কর্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে

একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি-পরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীরে, হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিরে বরণ কর, এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য ব্যক্তিরা তাঁহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয়পূর্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণসমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুরে পরিবেষ্টন পূর্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর সময় ধর্ম ধর্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে? তুমি যে এখন ধর্মপরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্বে নিষধদেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সোমদিগের সহিত শত্রুগণকে বিনাশ করতঃ রাজ্যলাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ভুজবলে অবশ্যই ধর্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।”

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। তার পর পূর্বমত যুদ্ধ করিয়া, অর্জুনবাণে নিহত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—দুর্যোধনবধ

কর্ণ মরিলে, দুর্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। পূর্বদিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া কাপুরুষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত করা নিতান্ত আবশ্যক। সর্বদর্শী কৃষ্ণ আজিকার প্রধান যুদ্ধে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও সাহস করিয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন।

সেই দিন সমস্ত কৌরবসৈন্য পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হইল। দুই জন ব্রাহ্মণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা, যদুবংশীয় কৃতবর্মা এবং স্বয়ং দুর্যোধন, এই চারি জন মাত্র জীবিত রহিলেন। দুর্যোধন পলাইয়া গিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ খুঁজিয়া যেখানে তাহাকে ধরিল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মারিল না।

যুধিষ্ঠিরের চিরকাল স্থূলবুদ্ধি, সেই স্থূলবুদ্ধির জন্যই পাণ্ডবদিগের এত কষ্ট। তিনি এই সময়ে সেই অপূর্ব বুদ্ধির বিকাশ করিলেন। তিনি দুর্যোধনকে বলিলেন, “তুমি অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণপূর্বক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্বক যুদ্ধ—ব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, তুমি আমদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে।” দুর্যোধন বলিলেন, আমি গদাযুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কোন পাণ্ডবই দুর্যোধনের সমকক্ষ নহে। দুর্যোধন অন্য কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধে আহত করিলে, পাণ্ডবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই বলদৃপ্ত; যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন। সেই কার্য তিনি বিশিষ্ট প্রকারে নির্বাহ করিলেন।

দুর্যোধনও অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। দুর্যোধন বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সকলকেই বধ করিব। তখন ভীমই গদা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল। আঠার দিন যুদ্ধ হইয়াছে, ভীম দুর্যোধনেই সর্বদাই যুদ্ধ হইয়াছে, গদাযুদ্ধও অনেক বার হইয়াছে, এবং বরাবরই দুর্যোধনই গদাযুদ্ধে ভীমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ সুর উঠিল যে, ভীম গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের তুল্য নহে। আজ ভীম পরাভূতপ্রায়। আসল কথাটা ভীমের সেই দারুণ প্রতিজ্ঞা। সভাপর্বে যখন দ্যূতক্রীড়ার পর, দুর্যোধন দ্রৌপদীকে জিতিয়া লইল, যখন দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া

সভামধ্যে আনিয়া বিবস্ত্রা করিতেছিলেন, তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি দুঃশাসনকে বধ করিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব। ভীম মহাশ্মশানতুল্য বিকট রণস্থলে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া রাক্ষসের মত তাহার তপ্ত শোণিত পান করিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি অমৃত পান করিলাম। দুর্যোধন সেই সভামধ্যে "হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ বসন উত্তোলনপূর্বক সর্বলক্ষণসম্পন্ন বজ্রতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিশুণ্ডের ন্যায় স্বীয় মধ্য ঊরু তাঁহাকে দেখাইলেন।" তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ঐ ঊরু যদি ভগ্ন না করি, তবে আমি যেন নরকে যাই।

আজি সেই ঊরু গদাঘাতে ভাঙ্গিতে হইবে। কিন্তু একটা তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক-গদাযুদ্ধের নিয়ম এই যে, নাভির অধঃ গদাঘাত করিতে নাই—তাহা হইলে অন্যায় যুদ্ধ করা হয়। ন্যায়যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে মারিতে পারিলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না।

যে জ্যেষ্ঠতাতপুত্রের হৃদয়রুধির পান করিয়া নৃত্য করিয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে মাথায় গদাঘাত ও ঊরুতে গদাঘাতে তফাৎ কি? যে বৃকোদর দ্রোণভয়ে মিথ্যাপ্রবঞ্চনার সময়ে প্রধান উদ্যোগী বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি ঊরুতে গদাঘাতের জন্য অন্যের উপদেশসাপেক্ষ হইতে পারেন না। কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না। ভীম ঊরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। বলিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরের কবি (এখানে তাঁহারই হাত দেখা যায়) চরিত্রের সুসঙ্গতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। তিনি এখানে ভীমের চরিত্রের কিছুমাত্র সুসঙ্গতি রাখিলেন না; অর্জুনেরও নহে। ভীম ভুলিয়া গেলেন যে, ঊরুভঙ্গ করিতে হইবে; আর যে পরমধার্মিক অর্জুন, দ্রোণবধের সময়, তাঁহার অস্ত্রগুরু, ধর্মের আচার্য, সখা, এবং পরমশ্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতেও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে অন্যায়যুদ্ধে ভীমকে প্রবর্তিত করিলেন। কিন্তু কথাটা কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন না হইলে, কবির উদ্দেশ্য সফল হয় না। অতএব কথাটা এই প্রকারে উঠিল—

অর্জুন ভীম-দুর্যোধনের যুদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে গদাযুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্তু দুর্যোধনের গদাযুদ্ধে যত্ন ও নৈপুণ্য অধিক। বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায় সমরে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে জীবিতনিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। জীবিতাশানিরপেক্ষ হইয়া সাহস

সহকারে যুদ্ধ করিলে, সংগ্রামে সে বীরকে কেহই পরাভব করিতে পারে না। অতএব যদি ভীম দুর্যোধনকে অন্যায়যুদ্ধে সংহার না করেন, তবে দুর্যোধন জয়ী হইয়া যুধিষ্ঠিরের কথামত পুনর্বার রাজ্যলাভ করিবে।

কৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া অর্জুন "স্বীয় বাম জানু আঘাত করতঃ ভীমকে সঙ্কেত করিলেন।" তার পর ভীম দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন।

যেমন ন্যায় ঈশ্বরপ্রেরিত, অন্যায়ও তেমনি ঈশ্বরপ্রেরিত। ইহাই এখানে দ্বিতীয় স্তরের কবির উদ্দেশ্য।

যুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও দুর্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে তাহার শিষ্য। কিন্তু দুর্যোধনই প্রিয়তর। রেবতীবল্লভ সর্বদাই দুর্যোধনের পক্ষপাতী। এক্ষণে দুর্যোধন, ভীম কর্তৃক অন্যায়যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, লাঙ্গল উঠাইয়া তিনি ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলা বাহুল্য যে, বলরামের স্কন্ধে সর্বদাই লাঙ্গল, এই জন্য তাঁহার নাম হলধর। কেন তাঁহার এ বিড়ম্বনা, যদি কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অনুনয় বিনয় করিয়া কোনরূপে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলরাম কৃষ্ণের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। রাগ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তার পর একটা বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত হইল। ভীম, নিপাতিত দুর্যোধনের মাথায় পদাঘাত করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা শুনেন নাই। কৃষ্ণ তাঁহাকে এই কদর্য আচরণে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ না করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিলেন। এদিকে, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দুর্যোধনের নিপাত জন্য ভীমের বিস্তর প্রশংসা ও দুর্যোধনের প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।"

কৃষ্ণের এই সকল কথা কৃষ্ণের ন্যায় আদর্শ পুরুষের উচিত। কিন্তু ইহার পর যাহা গ্রন্থমধ্যে পাই, তাহা অতিশয় আশ্চর্য ব্যাপার।

প্রথম আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যকে বলিলেন, "মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।" কিন্তু ইহা বলিয়াই নিজে দুর্যোধনকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন।

দুর্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চর্য ব্যাপার। দুর্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্নোরু হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কটূক্তি শুনিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,

"হে কংসদাসতনয়! ধনঞ্জয় তোমার বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার উরু ভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে ভীমসেন অধর্ম্মযুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন।[*] তুমি শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ।[#] অশ্বত্থামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্য্যকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদুম্ন সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে নিষেধ কর নাই।[**] কর্ণ অর্জ্জুনের বিনাশার্থ বহুদিন অতি যত্নসহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া, ব্যর্থ করাইয়াছ।[##] সাত্যকি তোমারই প্রবর্তনাপরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছিলেন।[!] মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনবধে সমুদ্যত হইলে, তুমি কৌশলক্রমে তাহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ।[!!] এবং পরিশেষে সূতপুত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্তসমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জ্জুন দ্বারা তাঁহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্য হইয়াছ।[***] অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ, তোমরা যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য উপায় প্রভাবেই আমরা স্বধর্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।"

এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটি ফুটনোট দিলাম, পাঠকের তৎপ্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। বাক্যগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা তিরস্কার মহাভারতে আর কোথাও নাই। তাহাই বলিতেছিলাম যে, দুর্যোধনের উত্তর আশ্চর্য।

তৃতীয় আশ্চর্য ব্যাপার এই যে কৃষ্ণ ইহার উত্তর করিলেন। পূর্বে দেখিয়াছি, তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহার কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন না। সভামধ্যে শিশুপালকৃত অসহ্য নিন্দাবাদ বিনাবাক্যব্যয়ে সহ্য করিয়াছিলেন। বিশেষ, দুর্যোধন এখন মুমূর্ষু তাহার কথার উত্তরের কোন প্রয়োজন নাই; তাহাকে কোন প্রকারে কটূক্তি করা কৃষ্ণ নিজেই নিন্দনীয় বিবেচনা করেন। তথাপি কৃষ্ণ দুর্যোধনকৃত

তিরস্কারের উত্তরও করিলেন, এবং কটূক্তিও করিলেন। উত্তরে দুর্যোধনকৃত পাপাচার সকল বিবৃত করিয়া উপসংহারে বলিলেন, "বিস্তর অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর।"

* এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ মহাভারতে কোথাও নাই। কোন স্তরেই না।

কৃষ্ণ ইহার বিন্দুবিসর্গেও ছিলেন না। মহাভারতে কোথাও এমন কথা নাই।

** শত্রুকে বধ করিতে কেন নিষেধ করিবেন?

কৃষ্ণ তজ্জন্য কোন যত্ন বা কৌশল করেন নাই। মহাভারতে ইহাই আছে যে, কৌরবগণের অনুরোধানুসারেই কর্ণ ঘটোৎকচের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করিলেন।

! কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন কথা মহাভারতে কোথাও নাই। সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছিলেন বটে। কৃষ্ণ বরং ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবাকে নিহত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

!! সে কৌশল, নিজপদবলে রথচক্র ভূপ্রোথিত করা। এ উপায় অতি ন্যায্য এবং সারথির ধর্ম, রথীর রক্ষা।

*** কি কৌশল? মহাভারতে এ সম্বন্ধে কৃষ্ণকৃত কোন কৌশলের কথা নাই। যুদ্ধে অর্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহাই আছে।

উত্তরে দুর্যোধন বলিলেন, আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্বক দান, সসাগরা বসুন্ধরার শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের দুর্লভ দেবভোগ্য সুখসম্ভোগ, ও অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছি, পরিশেষে ধর্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিতচিত্ত মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।"

এই উত্তর আশ্চর্য নহে। যে সর্বস্ব পণ করিয়া হারিয়াছে, সে যদি দুর্যোধনের মত দাম্ভিক হয়, তবে সে যে জয়ী শত্রুকে বলিবে, আমিই জিতিয়াছি, তোমরা হারিয়াছ, ইহা আশ্চর্য নহে। দুর্যোধন এইরূপ কথা হ্রদে থাকিয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মরিলে যে স্বর্গলাভ হয়, সকল ক্ষত্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্চর্য নহে, কিন্তু উত্তরের ফল সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য। এই কথা বলিবা মাত্র "আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্বগণ সুমধুর বাদিত্রবাদন ও অপ্সরা সকল রাজা দুর্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধসম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙ্‌মণ্ডল ও

নভোমণ্ডল সুনির্মল হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ সেই দুর্যোধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। এবং তাঁহারা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভূরিশ্রবারে অধর্মযুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।”

যিনি মহাভারতের সর্ব পাপাত্মার অধম-পাপাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহার এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর যাঁহারা সকল ধর্মাত্মার শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অধর্মাচরণ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্চর্য। সিদ্ধগণ, অপ্সরাগণ, দেবগণ মিলিয়া প্রকটিত করিতেছেন, দুরাত্মা দুর্যোধন ধর্মাত্মা, আর কৃষ্ণপাণ্ডব মহাপাপিষ্ঠ। ইহা মহাভারতে আশ্চর্য, কেন না, ইহা সমস্ত মহাভারতের বিরোধী। সিদ্ধগণাদি দূরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বারা এরূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য বলিয়া বিবেচ্য, কেন না, মহাভারতের উদ্দেশ্যই দুর্যোধনের অধর্ম ও কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের ধর্ম কীর্তন। রসের উপর রসের কথা, তাঁহারা দুর্যোধন—মুখে শুনিলেন যে, তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অধর্মযুদ্ধে বধ করিয়াছেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এত কাল তাঁহারা কিছুই জানিতেন না, এখন পরম শত্রুর মুখে জানিয়া, ভদ্রলোকের মত, শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ভীষ্ম বা কর্ণকে তাঁহারা কোন প্রকার অধর্ম করিয়া মারেন নাই, কিন্তু পরম শত্রু দুর্যোধন বলিতেছে, তোমরা অধর্ম করিয়া মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশ্বাস করিলেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ভূরিশ্রবাকে তাঁহারা কেহই বধ করেন নাই—সাত্যকি করিয়াছিলেন, সাত্যকিকে বরং কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি যখন পরমশত্রু দুর্যোধন বলিতেছে, তোমরাই মারিয়াছ, আর তোমরাই অধর্মাচরণ করিয়াছ, তখন গোবেচারা পাণ্ডবেরা অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, তাঁহারাই মারিয়াছেন, এবং তাঁহারাই অধর্ম করিয়াছেন; কাজেই তাঁহারা ভদ্রলোকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এ ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু পুঁথির ভিতর পাওয়া যায়, তাহাই ঋষিবাক্য, অভ্রান্ত, শিরোধার্য। কাজেই এ বিড়ম্বনা স্বেচ্ছাপূর্বক আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আশ্চর্য কথাগুলো এখনও শেষ হয় নাই, কৃষ্ণ ত স্বকৃত অধর্মাচরণ জন্য লজ্জিত হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে পাণ্ডবদিগের কাছে সেই পাপাচরণ জন্য আত্মশ্লাঘা করিতে লাগিলেন।*

বলা বাহুল্য যে, দুর্যোধনকৃত তিরস্কারাদি বৃত্তান্ত সমস্তই অমৌলিক। দ্রোণবধাদি যে অমৌলিক, তাহা আমি পূর্বে প্রমাণীকৃত করিয়াছি। যাহা অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গ যে অংশে আছে, তাহাও অবশ্য অমৌলিক। কেবল এতটুকু বলা আবশ্যক যে, এখানে দ্বিতীয় স্তরের কবিরও লেখনীচিহ্ন দেখা যায় না। এ তৃতীয় স্তরের বলিয়া বোধ করা যায়। দ্বিতীয় স্তরের কবি কৃষ্ণভক্ত, এই লেখক কৃষ্ণদ্বেষক। শৈবাদি অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবদ্বেষিগণও স্থানে স্থানে মহাভারতের কলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহারা কেহ এখানে গ্রন্থকার ইহাই সম্ভব। আবার এ কাজ কৃষ্ণভক্তের, ইহাও অসম্ভব নহে। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা ভারতবর্ষীয় কবিদের একটা বিদ্যার মধ্যে।# এ তাও হইতে পারে।

সে যাই হউক, ইহার পরেই আবার দেখিতে পাই যে, দুর্যোধন অশ্বত্থামার নিকট বলিতেছেন, "আমি অমিততেজা বাসুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি আমারে ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার প্রয়োজন কি?"

এমন বারোইয়ারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা নয়?

* যথা, "ভীষ্মপ্রমুখ মহারথগণ ও রাজা দুর্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ছিলেন, তোমরা কদাচ তাঁহাদিগকে ধর্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশপূর্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। আমি যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না। দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও তাঁহাদিগকে ধর্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রান্ত গদাধরী এই দুর্যোধনকে দণ্ডধারী কৃত্তান্তও ধর্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহারে অসৎ উপায় অবলম্বনপূর্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে কূট যুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুরগণ কূট যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরগণকে নিহত

করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্তব্য।” এমন নির্লজ্জ অধর্ম আর কোথাও শুনা যায় না।

একটা উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না; স্মর ভস্মীভূত হওয়ার পর বিলাপকালে রতির মুখে ভারতচন্দ্র বলিতেছেন,

“একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন।”

ইহা আগুনকে গালি বটে, কিন্তু একটু ভাষান্তর করিলেই স্তুতি, যথা—

“হে অগ্নে! তুমি শম্ভুললাটবিহারী লোকধ্বংসকারী, তোমার শিখা জ্বালাবিশিষ্ট হউক।” পাঠক, ভারতচন্দ্রপ্রণীত অন্নদামঙ্গলে দক্ষকৃত শিবনিন্দা দেখিবেন। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

নবম পরিচ্ছেদ—যুদ্ধশেষ

অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধন হত হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইল যে, তপঃপ্রভাবশালিনী গান্ধারী শুনিয়া পাণ্ডবদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। এ জন্য তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি হস্তিনায় গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শান্ত করিয়া আসুন।

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না, এখানে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন, "তুমি অব্যয়, এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা" ইহার কিছু পূর্বেই অর্জুনের রথ হইতে কৃষ্ণ অবতরণ করায় সে রথ জ্বলিয়া গিয়াছিল। অর্জুনের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণ বলিলেন, "ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে পূর্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল। কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পর্যন্ত দগ্ধ হয় নাই" অর্থাৎ আমি দেবতা বা বিষ্ণু। ইহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তর।

কৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কিছু বুঝাইলেন। উদ্ধৃত করা বা সমালোচনার যোগ্য কোন কথা নাই।

তার পর, দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু তখন সেনার মধ্যে সেই অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। এইখানে শল্যপর্ব শেষ।

তাহার পর, সৌপ্তিক পর্ব। সৌপ্তিকপর্ব, অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ। প্রথমাংশে অশ্বত্থামা চোরের মত নিশীথ কালে পাণ্ডবশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাভিভূত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এবং সমস্ত পাঞ্চালগণকে, সেনা ও সেনাপতিগণকে বধ করিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষে আর কেহ রহিল না।

বস্তুতঃ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ। পাঞ্চালেরা নির্বংশ হইলে যুদ্ধ শেষ হইল।

তাহার পরে, সৌপ্তিক পর্বে একটা ঐষীক পর্বাধ্যায় আছে। অশ্বত্থামা এই চোরোচিত কার্য করিয়া পাণ্ডবদিগের ভয়ে বনে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। পাণ্ডবেরা পরদিন তাঁহার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। অশ্বত্থামা ধরা পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ অতি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশিরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অর্জুনও তন্নিবারণার্থ ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের প্রতিপ্রয়োগ করিলেন। দুই অস্ত্রের তেজে ব্রহ্মাণ্ডধ্বংসের সম্ভাবনা দেখিয়া ঋষিরা মিটমাট করিয়া দিলেন। অশ্বত্থামার শিরস্থিত সহজমণি কাটিয়া দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এদিকে ব্রহ্মশিরা অস্ত্র পাণ্ডববধূ উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিল।

এই সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। আমাদের সমালোচনার যোগ্য কৃষ্ণচরিত্র-ঘটিত কোন কথাই সৌপ্তিক পর্বে নাই।

তার পর স্ত্রীপর্ব। স্ত্রীপর্ব আরও ভীষণ। নিহত বীরবর্গের স্ত্রীগণের ইহাতে আর্তনাদ। এমন ভীষণ আর্তনাদ আর কখনো শুনা যায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধীয় দুইটি কথা মাত্র আছে।

১। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনকালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার জন্য লৌহভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্ধ রাজা তাহাই চূর্ণ করিলেন। অনৈসর্গিক বৃত্তান্ত আমাদের পরিহার্য। এজন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই।

২। গান্ধারী কৃষ্ণের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া, শেষে কৃষ্ণকেই অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন :—

"জনার্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্যশালী, তথাপি, তুমি ইচ্ছাপূর্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভতপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমাকর্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ* বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন ও বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া বিলাপ ও পরিত্যাগ করিবেন।"

কৃষ্ণ, হাসিয়া উত্তর করিলেন, "দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগের বিনাশ করে, এমন আর কেহ নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা অনেক দিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য অবশ্যকর্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেবদানবগণেরও বাধ্য নহে। সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন।"

এইরূপে দ্বিতীয় স্তরের কবি মৌসল পর্বের পূর্ব সূচনা করিয়া রাখিলেন। মৌসল পর্ব যে দ্বিতীয় স্তরের, তাহারও পূর্বসূচনা আমরাও করিয়া রাখিয়াছি।

* ষট্‌ত্রিংশৎ বলেন কেন?

দশম পরিচ্ছেদ—বিধি সংস্থাপন

এক্ষণে আমরা অতি দুস্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। কৃষ্ণচরিত্র পুনর্বার সুবিমল প্রভাসিত হইতে চলিল। কিন্তু শান্তি ও অনুশাসন পর্বে কৃষ্ণ ঈশ্বর বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকৃত।

যুদ্ধাদির অবশেষে, অগাধবুদ্ধি যুধিষ্ঠির, আবার এক অগাধবুদ্ধির খেলা খেলিলেন। তিনি অর্জুনকে বলিলেন, এত জ্ঞাতি প্রভৃতি বধ করিয়া আমার মনে কোন সুখ নাই—আমি বনে যাইব, ভিক্ষা করিয়া খাইব। অর্জুন বড় রাগ করিলেন—যুধিষ্ঠিরকে অনেক বুঝাইলেন। তখন অর্জুন যুধিষ্ঠিরে বড় ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। শেষ, ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও স্বয়ং কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন। দুর্বলচিত্ত যুধিষ্ঠির কিছুতেই বুঝেন না। ব্যাস, নারদ প্রভৃতি বুঝাইলেন। কিছুতেই না। শেষ কৃষ্ণের কথায় মহাসমারোহের সহিত হস্তিনা প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিলেন। সে স্তব জগদীশ্বরের। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিয়া নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণ বয়ঃকণিষ্ঠ; যুধিষ্ঠির আর কখনও তাঁহাকে স্তব বা নমস্কার করেন নাই।

এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, শরশয্যায় শয়ান, তীব্র যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় শরীর রক্ষা করিতেছেন। তিনি ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া, সর্বময় সর্বাধার, পরমপুরুষ কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তুতিবাক্যে চঞ্চলচিত্ত হইয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকে দর্শন দিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠির উপযাচক হইয়া পরশুরামের উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীষ্মের নিকট জ্ঞানলাভ কর। ভীষ্ম সর্বধর্মবেত্তা; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্ঞান তাঁহার সঙ্গে যাইবে; তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। এই জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভাদিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীষ্মকেও যুধিষ্ঠিরাদিকে ধর্মোপদেশ দিয়া অনুগৃহীত করিতে আদেশ করিলেন।

ভীষ্ম স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, ধর্ম কর্ম সবই তোমা হইতে; তুমিই সব জান; তুমিই যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান কর। আমি আপনি শরখচিত হইয়া মুমূর্ষু ও অত্যন্ত ক্লিষ্ট, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে; আমি পারিয়া উঠিব না। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, আমার বরে তোমার শরাঘাতনিবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইবে,

তোমার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে, বুদ্ধি অব্যতিক্রান্ত থাকিবে; তোমার মন কেবল সত্ত্বগুণাশ্রয় করিবে। তুমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত দেখিবে।

কৃষ্ণের কৃপায় সেইরূপই হইল। কিন্তু তথাপি ভীষ্ম আপত্তি করিলেন। কৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি স্বয়ং কেন যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না?"

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, সমস্ত হিতাহিত কর্ম আমা হইতে সম্ভূত। চন্দ্রের শীতাংশু ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরূপ। আমার এখন ইচ্ছা, আপনাকে সমধিক যশস্বী করি। আমার সমুদায় বুদ্ধি সেই জন্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছি। ইত্যাদি।

তখন ভীষ্ম প্রফুল্লচিত্তে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মতত্ত্ব শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম এবং মোক্ষধর্ম অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধর্মের পর শান্তিপর্ব সমাপ্ত।

এই শান্তিপর্বে তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল ও তার পর যিনি যেমন ধর্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই তাহা শান্তিপর্বভুক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমাদের সমালোচনার যোগ্য একটা গুরুতর কথা আছে। কেবল ধার্মিককে রাজা করিলেই ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধার্মিক যুধিষ্ঠির রাজা ধর্মাত্মা; কাল তাঁহার উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হইতে পারেন। এইজন্য ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার জন্য ধর্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাও চাই। রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্য মাত্র; তাহার শাসন জন্য বিধিব্যবস্থাই (Legislation) প্রধান কার্য। কৃষ্ণ সেই কার্যে ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল; আদর্শ নীতিজ্ঞই তাহা লক্ষিত করিতে পারেন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই ভীষ্মকে বুঝাইতেছেন।

"আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান এবং শুদ্ধাচারসম্পন্ন। রাজধর্ম ও অপরাপর ধর্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোনও দোষই লক্ষিত হয় নাই, নরপতিগণ আপনারে সর্বধর্মবেত্তা বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্মবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্মকীর্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান ব্যক্তিরই কর্তব্য।"

তার পর অনুশাসন পর্ব। এখানেও হিতোপদেশ; যুধিষ্ঠির শ্রোতা, ভীষ্ম বক্তা। কতকগুলা বাজে কথা লইয়া, এই অনুশাসন পর্ব গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোধ হয় তৃতীয় স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই।

পরিশেষে ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের।

একাদশ পরিচ্ছেদ—কামগীতা

ভীষ্মের স্বর্গারোহণের পর, যুধিষ্ঠির আবার কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বাহানা লইলেন বনে যাইব। অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এবার রোগের প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। সেরূপ রোগ নির্ণয় করা আর কাহারও সাধ্য নহে। যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার। ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখায় pride শব্দ অহঙ্কার শব্দের প্রতিশব্দ। বস্তুতঃ তাহা নহে। অহঙ্কার ও মাৎসর্য পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। "আমি এই সকল করিতেছি," "ইহা আমার," "এই আমার সুখ" "ইহা আমার দুঃখ," এইরূপ জ্ঞানই অহঙ্কার। এই যুধিষ্ঠিরের দুঃখের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি—আমার এই শোক উপস্থিত; আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই যুধিষ্ঠিরের এই কাঁদাকাটির মূলে আছে। সেই মূলে কুঠারাঘাতপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে উদ্ধৃত করা, এই ধর্মবেত্তৃশ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি পরুষবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুর্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না?" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একটি রূপক যুধিষ্ঠিরকে শুনাইলেন। তার পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি। যে নিষ্কাম ধর্ম আমরা গীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আছে। এইরূপ অতি মহৎ ধর্মোপদেশেই কৃষ্ণচরিত্র বিশেষ স্ফূর্তি পায়।

"হে ধর্মরাজ! ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। ঐ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার

দুঃখানুভব হয়? যাহা হউক, এক্ষণে সুখদুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্তব্য নহে। সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিধেয়।

* * * পূর্বে ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য সমুদায় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন।

"হে ধর্মরাজ!" কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম ও সুখ তোমার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধধর্মাবলম্বী মমতা ও নির্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাপে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনারে অধর্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা

সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

অতঃপর পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমারে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হই। যে ব্যক্তি বেদান্ত সমালোচনা দ্বারা আমারে শাসন করিতে যত্নবান্ হয়, আমি তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমারে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমারে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমারে সর্বভূতের অবধ্য, ও সনাতন বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

হে ধর্মরাজ! এই আমি আপনার কামগীতা সবিস্তারে কীর্তন করিলাম। অতএব কামনারে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনারে ধর্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগেক পুনদর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণপ্রয়াণ

ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল; ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের জন্য এ গ্রন্থের সম্বন্ধ; মহাভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহা সব ফুরাইল। এইখানে কৃষ্ণের মহাভারত হইতে অন্তর্হিত হওয়া উচিত। কিন্তু রচনাকণ্ডূতিপীড়িতেরা তত সহজে কৃষ্ণকে ছাড়িবার পাত্র নহেন। ইহার পরে অর্জুনের মুখে তাঁহারা একটা অপ্রাসঙ্গিক, অদ্ভুত কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্ধকালে আমাকে যে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলে, সব ভুলিয়া গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কথা বড় মন্দ। আমার আর সে সব কথা মনে হইবে না। আমি তখন যোগমুক্ত হইয়াই সে সব উপদেশ দিয়াছিলাম। আর তুমিও বড় নির্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য; তোমায় আর কিছুই বলিতে চাহি না। তথাপি এক পুরাতন ইতিহাস শুনাইতেছি।

কৃষ্ণ ঐ ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অর্জুনকে আবার কিছু তত্ত্বজ্ঞান শুনাইলেন। পূর্বে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহা গীতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখন যাহা শুনাইলেন, গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন, "অনুগীতা"। ইহার এক ভাগের নাম "ব্রাহ্মণগীতা"।

ভগবদ্গীতা, প্রজাগর, সনৎসুজাতীয়, মার্কণ্ডেয়সমস্যা, এই অনুগীতা প্রভৃতি অনেকগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া, এক্ষণে মহাভারতের অংশ বলিয়া প্রচলিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতা, কিন্তু অন্যগুলিতেও অনেক সারগর্ভ কথা পাওয়া যায়। অনুগীতাও উত্তম গ্রন্থ। "ভট্ট মোক্ষমূলর," ইহাকে তাঁহার "Sacred Books of the East" নামক গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্, এক্ষণে যিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তিনি ইহা ইংরাজিতে অনুবাদিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহা কৃষ্ণোক্তি নহে। গ্রন্থকার বা অপর কেহ, যেরূপ অবতারণা করিয়া, ইহাকে কৃষ্ণের মুখে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহা কৃষ্ণোক্ত নহে; জোড়া দাগ বড় স্পষ্ট, কষ্টেও জোড় লাগে নাই। গীতোক্ত ধর্মের সঙ্গে অনুগীতোক্ত ধর্মে এরূপ কোন সাদৃশ্য নাই যে, ইহাকে গীতাবেত্তার উক্তি বিবেচনা করা যায়। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, অনুগীতা, গীতার অনেক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল।

সে প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনার আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশই অনুগীতার উপর নির্ভর করে না। তবে, অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা (বা ব্রহ্মগীতা) যে প্রকৃত পক্ষে প্রক্ষিপ্ত, তাহার প্রমাণার্থ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই।

অর্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া, কৃষ্ণ অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক দ্বারকা যাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানবপ্রকৃতিসুলভ স্নেহাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণের মানবিকতার পূর্বে পূর্বে আমরা অনেক উদাহরণ দিয়াছি। অতএব ইহার সবিস্তার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

পথিমধ্যে উতঙ্ক মুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ করেন নাই, বলিয়া উতঙ্ক তাঁহাকে শাপ দিতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ বলিলেন, শাপ দিও না, দিলে তোমার তপঃক্ষয় হইবে, আমি সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর আমি জগদীশ্বর। তখন উতঙ্ক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলেন; কৃষ্ণও বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর করিয়া উতঙ্ককে অভিলষিত বরদান করিলেন। তাহার পর চণ্ডাল আসিল, কুকুর আসিল, চণ্ডাল উতঙ্ককে কুকুরের প্রস্রাব খাইতে বলিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ বীভৎস ব্যাপার আছে। এই উতঙ্কসমাগম বৃত্তান্ত মহাভারতের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই; সুতরাং ইহা মহাভারতের অংশ নহে। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। স্পষ্টতঃ এখানে তৃতীয় স্তর দেখা যায়।

দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হইলে বসুদেব তাঁহার নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধবৃত্তান্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত, অত্যুক্তি শূন্য, এবং কোন প্রকার অনৈসর্গিক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরহিত। অথচ সমস্ত স্থূল ঘটনা প্রকাশিত করিলেন। কেবল অভিমন্যুবধ গোপন করিলেন। কিন্তু সুভদ্রা তাঁহার সঙ্গে দ্বারকায় গিয়াছিলেন, সুভদ্রা অভিমন্যুবধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন করিলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃত্তান্তও সবিস্তারে বলিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞকালে পুনর্বার আসিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপস্থিত। অতএব তিনি যাদবগণ পরিবৃত হইয়া পুনর্বার হস্তিনায় গমন করিলেন।

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, অভিমন্যুপত্নী উত্তরা একটি মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, কৃষ্ণ ঐশী শক্তির প্রয়োগদ্বারা এই কার্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে করিতে পারেন, তাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহা তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।

তার পর নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। কৃষ্ণও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন। তার পর আর পাণ্ডবগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

সপ্তম খণ্ড

প্রভাস

কৃষ্ণচরিত্র

প্রভাস

যোহসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তার্চ্চির্বিভাসুঃ।
সংভক্ষয়তি ভূতানি তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ ||

শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ—যদুবংশধ্বংস

তার পর, আশ্রমবাসিক পর্ব। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর অতি ভয়াবহ মৌসল পর্ব। ইহাতে সমস্ত যদুবংশের নিঃশেষ ধ্বংস ও কৃষ্ণ বলরামের দেহত্যাগ কথিত হইয়াছে। যদুবংশীয়েরা পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে এই মহাভয়ানক ব্যাপার নিবারণের কোন উপায় করেন নাই—বরং অনেক যাদব তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

সে বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গান্ধারীকথিত ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইয়াছে। যাদবেরা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। একদা বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ, এই লোকবিশ্রুত ঋষিত্রয় দ্বারকায় উপস্থিত। দুর্বিনীত যাদবেরা কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে মেয়ে সাজাইয়া ঋষিদিগের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, ইনি গর্ভবতী, ইঁহার কি পুত্র হইবে? পুরাণেতিহাসে ঋষিগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশ স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকেন। কথায় কথায় তাঁহাদের অভিসম্পাতের ঘটা দেখিলে তাঁহাদিগকে জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বরপরায়ণ ঋষি না বলিয়া, অতি নৃশংস নরপিশাচ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এখনকার দিনে যে কেহ ভদ্রলোক এমন একটা তামাসা হাসিয়া উড়াইয়া দিত; অন্ততঃ একটু তিরস্কারবাক্যই যথেষ্ট হয়। কিন্তু এই জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ একেবারে সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন, লৌহময় মুসল প্রসব করিবে, আর সেই মুসল হইতে কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এ কথা অবগত হইলেন। তিনি বলিলেন, মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য হইবে। শাপ নিবারণের কোন উপায় করিলেন না।

অগত্যা শাম্ব, পুরুষই হউক আর যাই হউক, এক লোহার মুসল প্রসব করিল। যাদবগণের রাজা (কৃষ্ণ রাজা নহেন, উগ্রসেন রাজা বা প্রধান) ঐ মুসল চূর্ণ

করিতে আজ্ঞা দিলেন। মুসল চূর্ণ হইল—চূর্ণসকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। এদিকে যাদবগণ সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগের “বিনাশ বাসনায়” যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে বলিলেন।

প্রভাসে আসিয়া, যাদবগণ সুরাপান করিয়া নানাবিধ উৎসব করিতে লাগিল। শেষে পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যকি প্রথম বিবাদ আরম্ভ করিলেন। তিনি কৃতবর্মার সঙ্গে বিবাদ করিলে প্রদ্যুম্ন সাত্যকির পক্ষাবলম্বন

করিলেন। সাত্যকি কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কৃতবর্মার জ্ঞাতি গোষ্ঠী (যাদবেরা, বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক, কুকুর ইতি ভিন্ন বংশীয়) সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নকে নিহত করিল। তখন কৃষ্ণ এক মুষ্টি এরকা (শরগাছ) ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিলেন। এবং তদ্দ্বারা অনেক যাদব নিপাতিত করিলেন। গ্রন্থান্তরে আছে যে, এই শরগাছ মুসলচূর্ণ, যাহা রাজাজ্ঞানুসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারতে সে কথাটা পাইলাম না, কিন্তু লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ এরকামুষ্টি গ্রহণ করাতে তাহা মুসলরূপে পরিণত হইল, এবং ইহাও আছে যে, ঐ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রাহ্মণ-শাপে মুসলীভূত হইয়াছিল। যাদবগণ তখন ঐ সকল এরকা গ্রহণপূর্বক পরস্পর নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যাদবগণ পরস্পরকে নিহত করিলেন। তখন দারুক (কৃষ্ণির সারথি) ও বভ্রু (যাদব) কৃষ্ণকে বলিলেন, "জনার্দন! আপনি এক্ষণে অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্মা বলভদ্রের নিকট যাই।"

কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় অর্জুনের নিকট পাঠাইলেন। অর্জুন আসিয়া যাদবদিগের কুলকামিনীগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। বলরামকে কৃষ্ণ যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটি সহস্রমস্তক সর্প নির্গত হইয়া সাগর, নদী, বরুণ, এবং বাসুকি প্রভৃতি অন্য সর্পগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল। বলরামের দেহ জীবনশূন্য হইল। তখন কৃষ্ণ স্বয়ং মর্ত্যলোক ত্যাগ বাসনায় মহাযোগ অবলম্বনপূর্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। জরা নামে ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহার পাদপদ্ম শরদ্বারা বিদ্ধ করিল। পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্কিতমনে কৃষ্ণের চরণে নিপতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

এদিকে অর্জুন দ্বারকায় আসিয়া রামকৃষ্ণাদির ঔর্ধ্বদৈহিক কর্ম সম্পাদন করিয়া যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় চলিলেন। পথিমধ্যে দস্যুগণ লাঠি হাতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীষ্ম কর্ণের নিহন্তা, তিনি লগুড়ধারী চাষাদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। রুক্মিণী, সত্যভামা, হৈমবতী, জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রধানা মহিষীগণ ভিন্ন আর সকলকেই দস্যুগণ হরণ করিয়া লইয়া গেল।

এই সকল কথা কি মৌলিক? মুসল এরকার অনৈসর্গিক উপন্যাস আমরা পূর্বনিয়মানুসারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহা ত্যাগ করিলে যে, প্রাকৃতিক

স্থূল কথা কিছু বাকী থাকে, তাহা তত শীঘ্র ত্যাগ করা যায় না। যাদবেরা পানাসক্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছিল; ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। তাহারা সকলে একবংশীয় নহে; ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়, এবং অনেক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধাচারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বার্ষ্ণেয় সাত্যকি ও কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে, কিন্তু অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবর্মা, দুর্যোধনের পক্ষে। তার পর, যাদবদিগের কেহ রাজা ছিল না, উগ্রসেনকে কখন রাজা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু যাদবদিগের মধ্যে কেহই রাজা নহেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাধিক্য হেতু, তিনি যাদবগণের নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বলরামের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ দেখা যায়, এবং শান্তিপর্বে দেখিতে পাই, ভীষ্ম একটি কৃষ্ণনারদসংবাদ বলিতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে দুঃখ করিতেছেন যে, তিনি জ্ঞাতিগণের মনোরঞ্জনার্থ বহুতর যত্ন করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এ সকল কথা পূর্বে বলিয়াছি। অতএব, যখন যাদবেরা, পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট, স্ব স্ব প্রধান, অত্যন্ত বলদৃপ্ত, দুর্নীতিপরায়ণ, এবং সুরাপাননিরত,* তখন তাঁহারা যে পরস্পর বিবাদ করিয়া যদুকুলক্ষয় করিবেন এবং তন্নিবন্ধন কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন বা অনিচ্ছাধীন দেহান্ত হইবে, ইহা অনৈসর্গিক বা অসম্ভব নহে। বোধ হয়, এরূপ একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাহার উপর পুরাণকারগণ যদুবংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন। অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে কেবল দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। লিখিত হইয়াছে যে, যদুবংশধ্বংস নিবারণ জন্য কৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আনুকূল্যই করিয়াছিলেন। ইহাও যদি সত্য হয়, তাহাতে কৃষ্ণচরিত্রের অসঙ্গতি বা অগৌরব কিছুই দেখি না। আদর্শ মনুষ্য আদর্শ মনুষ্যের উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই—আদর্শ পুরুষের ধর্মই আত্মীয়। যদুবংশীয়েরা যখন অধার্মিক হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনীয় স্থলে বিনাশসাধনই তাঁহার কর্তব্য। যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধর্মাত্মা বলিয়াই বিনষ্ট করিলেন, তিনি যাদবগণকে অধর্মাত্মা দেখিয়া তাহাদের যদি বিনষ্ট না করেন, তবে তিনি ধর্মের বন্ধু নহেন, আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু, ধর্মের পক্ষপাতী নহেন, আপনার পক্ষপাতী, বংশের পক্ষপাতী। আদর্শ ধর্মাত্মা, তাহা হইতে পারেন না—কৃষ্ণও তাহা হয়েন নাই।

* যাদবেরা এমন মদ্যাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দ্বারকায় যে সুরা প্রস্তুত করিবে, তাহাকে শূলে দিব। আমি পাশ্চাত্য রাজপুরুষগণকে এই নীতির অনুবর্তী হইতে বলিতে ইচ্ছা করি।

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণটা কতক অনিশ্চিত রহিল। চারি প্রকার কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম, টাল্‌বয়স-হুইলরি সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ, জুলিয়স্ কাইসরের মত, দ্বেষবিশিষ্ট বন্ধুগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এরূপ কথা কোন গ্রন্থেই নাই।

দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যগণ যোগাবল্বনে দেহত্যাগের কথাটার বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে অবিশ্বাসের কারণ দেখি না। যাঁহারা যোগাভ্যাসকালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ করা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, এমন কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এরূপ ঘটনা বিশ্বস্তসূত্রে শুনাও গিয়া থাকে। অন্যে বলিতে পারেন, ইহা আত্মহত্যা, সুতরাং পাপ; সুতরাং আদর্শ মনুষ্যের অনাচরণীয়, আমি ঠিক তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীন বয়সে, জীবনের কার্য সমস্ত সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য, মনোমধ্যে তন্ময় হইয়া, শ্বাসরোধকে আত্মহত্যা বলিব না, "ঈশ্বরপ্রাপ্তি" বলিব? সেটা বিচারস্থল। আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি, জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই?

তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঘাত।

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল, বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছিল। এই জরাব্যাধ, জরাব্যাধি নয় ত?

যাঁহারা কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা এই চারিটি মতের যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার মতে ইহা বটে যে, জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা পূরণজন্য তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা সকল কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাহা বলিলেও ঈশ্বরাবতারের জন্মমৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের একমাত্র কারণ।

মৌসলপর্ব মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি না, তাহার আমি বিচার করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, বলিয়া সমালোচনা করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই কেন, তাহাও বলিয়াছি। স্থূল ঘটনাটা কতক সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে তাহা হইলেও, ইহা মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা পুরাণ ও হরিবংশে আছে, কৃষ্ণজীবনঘটিত এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই। একটিই কেবল পুরাণাদিতেও আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু কৃষ্ণ করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন আর কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত মহাভারতে নাই ও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইটিই কেবল সে নিয়মবহির্ভূত। কৃষ্ণ এখানে ঈশ্বরাবতার, এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিহ্ন পূর্বে বলিয়াছি। এরূপ বিবেচনা করিবার অন্যান্য হেতুও নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। তবে, ইহা বলা কর্তব্য যে, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে মৌসলপর্বের কোন প্রসঙ্গই নাই। পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্তের পরবর্তী কোন কথাই অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। আমার বিবেচনায় পরীক্ষিতের জন্মই আদিম মহাভারতের শেষ। তার পরবর্তী যে সকল কথা, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের।

কৃষ্ণচরিত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—উপসংহার

সমালোচকের কার্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ;—এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস; অপর সত্যের সংগঠন। কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্যই প্রধান; এজন্য আমাদিগের সময় ও চেষ্টা সেই দিকেই বেশী গিয়াছে। কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা অতি দুরূহ ব্যাপার, কেন না, মিথ্যা ও অতিপ্রকৃত উপন্যাসের ভস্মে অগ্নি এখানে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়া প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র পুনঃ সংস্থাপিত করিব, তাহা মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। আমার যত দূর সাধ্য, তত দূর আমি গড়িলাম।

উপসংহারে দেখা কর্তব্য যে, যতটুকু সত্য পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায়, ততটুকুতে কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ প্রতিপন্ন হইল।

দেখিয়াছি, বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ বলবান্। তাঁহার অশিক্ষিত বলপ্রভাবে বৃন্দাবন হিংস্রজন্তু প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাঁহার অশিক্ষিত বলেও কংসের মল্ল প্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। গোচারণকালে গোপালগণের সঙ্গে সর্বদা ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের স্ফূর্তি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, দ্রুতগমনে কালযবনও তাঁহাকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার রথসঞ্চালনবিদ্যার বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়।

এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্বপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারেন নাই। তিনি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে সময়ের সর্বপ্রধান যোদ্ধৃগণের সঙ্গে, এবং অন্যান্য বহুতর রাজগণের সঙ্গে,—কাশী, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্রক, গান্ধার প্রভৃতি রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন, কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারেন নাই। তাঁহার যুদ্ধশিষ্যেরা, যথা—সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় হইয়াছিলেন। স্বয়ং অর্জুনও তাঁহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাণেতিহাসে তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুতা একজন সামান্য সৈনিকেরও থাকিতে পারে। সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধৃগণ পটু ছিলেন না। মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না, ভীষ্মের বা অর্জুনেরও নহে। কৃষ্ণের সৈনাপত্যের

বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, জরাসন্ধযুদ্ধে। তাঁহার সৈনাপত্য গুণে ক্ষুদ্রা যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখ্যাতীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করিয়াছিল। সেই অগণনীয়া সেনার ক্ষয়, যাদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানিয়া মথুরা পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নির্মাণার্থ সাগরদ্বীপ দ্বারকার নির্বাচন, এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক পর্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণীনির্মাণ যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার ঋষিদিগের ইহা অবোধগম্য—অতএব ইহাও এক অন্যতর প্রমাণ যে, কৃষ্ণেতিহাস তাঁহাদের কল্পনামাত্রপ্রসূত নহে।

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলও চরমস্ফূর্তিপ্রাপ্ত, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ, ইহাই ভীষ্ম তাঁহার অর্ঘপ্রাপ্তির অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শিশুপাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পূজা কেন?

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মই ইহার তীব্রোজ্জ্বল প্রমাণ। এই ধর্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে, মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়াছি। কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্বলোকহিতকর, সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, ইহা গ্রন্থান্তরে বলিয়াছি। এই ধর্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা সকল কার্য সিদ্ধ করেন, ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও প্রমাণীকৃত করিতেছি। কেবল এই গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন।

সর্বজনীন ধর্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধর্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল চরমস্ফূর্তিপ্রাপ্ত। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্ভ্রান্ত রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াই যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজসূয় যজ্ঞে হস্তার্পণ করিলেন না। অবাধ্য যাদবেরা এবং বাধ্য পাণ্ডবেরা তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করা, উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ— সাম্রাজ্য স্থাপনের অল্পায়াসসাধ্য অথচ পরম ধর্ম্য উপায়। ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পর, ধর্মরাজ্য শাসনের জন্য রাজধর্মনিয়োগ ভীষ্মের দ্বারা রাজব্যবস্থা সংস্থাপন করান,

রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় অতিপ্রশংসীয় উদাহরণ। আরও অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন।

কৃষ্ণের বুদ্ধি, চরম স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা সর্বব্যাপিনী, সর্বদর্শিনী, সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি। মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যত দূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ তত দূর সর্বজ্ঞ। অপূর্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব, যাহার উপরে আজিও মনুষ্যবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহা হইতে চিকিৎসাবিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা এমন কি, অশ্বপরিচর্যা পর্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনর্জীবন একের উদাহরণ; বিখ্যাত বংশীবিদ্যা দ্বিতীয়ের, এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অশ্বের শল্যোদ্ধার তৃতীয়ের উদাহরণ।

কৃষ্ণের কার্যকারিণী বৃত্তি সকলও চরমস্ফূর্তিপ্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, এবং সর্বকর্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধর্ম এবং সত্য যে অবিচলিত, এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্বজনে দয়া ও প্রীতিই এই ইতিহাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। বলদৃপ্তগণের অপেক্ষা বলবান্ হইয়াও লেকাহিতার্থ তিনি শান্তির জন্য দৃঢ়যত্ন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সর্বলোকহিতৈষী, কেবল মনুষ্যের নহে—গোবৎসাদি তির্যক্ যোনির প্রতিও তাঁহার দয়া। গিরিযজ্ঞে তাহা পরিস্ফুট। ভাগবতকারকথিত বাল্যকালে বানরদিগের জন্য নবনীত চুরির এবং ফলবিক্রেত্রীর কথা কতদূর কিম্বদন্তীমূলক, বলা যায় না। কিন্তু যিনি গোবৎসের উত্তম ভোজন জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাঁহার চরিত্রানুমোদিত। তিনি আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কিরূপ হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি, আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি তাহার শত্রু। তাঁহার অপরিসীম ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত দেখিলে তিনি অযোনির্মিত হৃদয়ে অকুণ্ঠিতভাবে দণ্ডবিধান করেন। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লেকাহিতার্থে স্বজনের বিনাশেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কংস মাতুল; পাণ্ডবেরা যাহা, শিশুপালও তাহা;—পিতৃষ্বসার পুত্র; উভয়কেই দণ্ডিত করিলেন; তারপর, পরিশেষে স্বয়ং যাদবেরা সুরাপায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইলেও, তাহাদিগকেও রক্ষা করিলেন না।

এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরম স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি অপরাঙ্মুখ ছিলেন না, কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য। যে জন্য বৃন্দাবন ব্রজলীলা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহার, যমুনাবিহার, রৈবতক-বিহার। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।

কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে। ধর্মতত্ত্বে বলিয়াছি, ভক্তিই মনুষ্যের প্রধানা বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ—তাঁহার ভক্তির স্ফূর্তি দেখিলাম কই। কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাঁহার এই ভক্তির পাত্র কে? তিনি নিজে।* নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উহা এইরূপ কথিত হইয়াছে—"য এবং পশ্যন্বেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতীতি।"

"যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট্।"

ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগন্ময়; তিনি সেই জগতে প্রীতি-বিশিষ্ট। পরমাত্মার আত্মরতি আর কোন প্রকার বুঝিতে পারি না। অন্ততঃ আমি বুঝাইতে পারি না।

উপসংহারের বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঙ্মুখ-ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ। এই প্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন, তিনি অন্ততঃ Rhys Davids শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন; "The Wisest and Greatest of the Hindus." আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে, বিনীতভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরম্।।

* মহাভারতের যে সকল অংশে তাঁহাকে শিবোপাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্তের লক্ষণবিশিষ্ট।